বর্তিকা

CALCUTTA
UNIVERSITY

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

২১শে ফেব্রুয়ারী,

বর্ষ—২৫ সংখ্যা—১

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১। মায়ের বাণী	
২। দেবীসূক্ত (মূল ও অনুবাদ)	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
৩। সত্যকাম কাহিনী	
৪। যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ	অনির্বাণ
৫। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
৬। প্রশ্নোত্তর	শ্রীমা
৭। কঠিন ভাষায় ওড়া	নীরবাহ

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Edited by: NOLINI KANTA GUPTA

Printed by: AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

২৫-১২-৬৪

পৃথিবীর উপর শান্তি যদি চাও, তবে সর্ব্বপ্রথম শান্তি স্থাপন কর তোমার হৃদয়ে।

জগতে যদি ঐক্য চাও, তবে সর্ব্বপ্রথম তোমার আধারের বিভিন্ন অঙ্গসকল ঐক্যবদ্ধ কর।

—শ্রীমা

মায়ের বাণী

("বুলেটিন" থেকে গৃহীত)

সাধারণ চেতনার কণ্ঠ হল নৈতিক কণ্ঠ—তা ভাল ও মন্দের পার্থক্য দেখে, ভালর দিকে আমাদের উৎসাহিত করে, মন্দকে নিষিদ্ধ করে। সাধারণ জীবনে এ জিনিষটি খুবই উপকারী—যতদিন না অন্তঃপুরুষের চেতনা দেখা দেয়, সম্পূর্ণভাবে তারই নির্দ্দেশে চলা যায় অর্থাৎ সাধারণ মানবতার উর্দ্ধে উঠে না যাওয়া যায়, সকল অহং হতে মুক্ত হয়ে ভাগবত ইচ্ছাশক্তির সচেতন যন্ত্র না হওয়া যায়। অন্তঃপুরুষ হল ভগবানের অংশ ; তাই সকল নীতি-বোধের উর্দ্ধে সে, সে পরিস্নাত ভাগবত জ্যোতির মধ্যে, তাকেই সে প্রকাশ করে তবে আধারকে সত্য সত্যই সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করতে সে পারে না যতদিন অহংএর বিলোপ না ঘটেছে।

ভগবানের সঙ্গে ঐক্যের ক্রমপর্য্যায় :

যা-কিছু আছে তা দেওয়া হল আরম্ভ।
যা-কিছু করা হয় তা দেওয়া হল পথ।
যা-কিছু হয়েছে তা দেওয়া হ'ল পরিণতি।

প্রত্যেকেই যদি এই স্থির প্রতিজ্ঞা করে যে আপন আপন প্রবেগকে দমনে রাখবে, শাসনে রাখবে, তবে অবস্থা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

চেতনাকে দুর্যোগের মধ্যে রেখে দিলে সারা জীবনই হয়ে ওঠে দুর্যোগ।

আমরা যাদের লক্ষ্য এক—নিজেকে অতিক্রম করা—এস আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। তাহ'লে এই ঐক্যের মধ্যে, এই ঐক্যের সহায়ে আমরা অজ্ঞানের, বিনাশের, সকল বিরোধী-শক্তিদের আক্রমণেরই সম্মুখীন হতে পারব, জয় করতে পারব। ঐক্যেই বল, ঐক্যেই শক্তি, ঐক্যেই সুনিশ্চিত বিজয়।

আশ্রমের ছোটদের প্রার্থনা :

ভগবান, তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা :—

আমরা যেন আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারি কেন আমরা এখানে।

আমরা যেন আরও ভালভাবে করতে পারি যা আমাদের করতে হবে এখানে।

আমরা যেন হতে উঠি যা আমাদের হতে হবে এখানে—যাতে তোমার ইচ্ছাই পরিপূর্ণ হয় সুসমঞ্জসভাবে।

স্থির বিশ্বাস নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব,
স্থির নিশ্চয় হয়ে আমরা অপেক্ষা করব।

বলবে না কখনও, "ভগবানকে দেবার আমার আর কিছু নেই"। কিছু না কিছু সর্বদাই আছে দেওয়ার—তুমি দিতে পার আরো ভাল করে এবং আরো পূর্ণভাবে।

নভেম্বর ১৯৬৩

প্রেম যৌন সম্বন্ধ নয়।

প্রেম প্রাণের আসক্তি ও বিনিময় নয়।

প্রেম হৃদয়ের স্নেহাকাঙ্ক্ষা নয়।

প্রেম হ'ল এমন সর্বজয়ী স্পন্দন যার উৎস এক-অদ্বিতীয়—তাকে গ্রহণ করতে পারে, প্রকাশ করতে পারে কেবল তারাই যারা পূর্ণশুদ্ধ, পূর্ণশক্তিবান।

শুদ্ধ হওয়া অর্থ কেবল ভগবানের প্রভাবে উন্মুক্ত থাকা, আর কোন প্রভাবে নয়।

ভগবান একটা সর্বকর্মকৃৎ যন্ত্র নয় যে মানুষে তাদের যদৃচ্ছা কলটা টিপে দিলেই তা চলতে শুরু করবে।

কিন্তু তবুও অধিকাংশ মানুষেরাই যারা ভগবানের কাছে প্রণতি জানিয়েছে, তারা ভগবানের কাছে থেকে এই জিনিষটি প্রত্যাশা করে।

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪

জীবনের সত্যকার হেতু—

জীবন ধারণ করা ভগবানের জন্য অথবা সত্যের জন্য, অন্ততঃ আপনার অন্তরাত্মার জন্য।

সত্যকার আন্তরিকতা

জীবন ধারণ করা ভগবানের জন্য, বিনিময়ে তাঁর কাছে থেকে কোন লাভের অপেক্ষা না করে।

আগষ্ট ১৯৬৪

মানুষী প্রকৃতির দুঃখতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি সেই জ্ঞান যা সত্যসত্যই জানে, সেই শক্তি যা সত্যসত্যই ক্ষমতা রাখে, সেই প্রেম যা সত্যসত্যই ভালবাসে।

সত্যকার জ্ঞানের তোরণ যে পার হয়ে গিয়েছে তার বলবার কিছু নেই, শিক্ষা দেওয়ার কিছু নেই।

মৃত্যু, যা তুমি মনে কর তা সে নয়। মৃত্যুর কাছে তুমি প্রত্যাশা কর চেতনাশূন্য বিশ্রামের চিরশান্তি। কিন্তু এই বিশ্রাম যদি তুমি চাও, তবে তার জন্য নিজেকে তোমার প্রস্তুত করে নিতে হবে।

যখন তোমার মৃত্যু হয় তখন তুমি হারাও কেবল তোমার দেহ, আর হারাও জগতের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ এবং তার মধ্যে তোমার কাজ করবার সুযোগ। কিন্তু প্রাণজগতের যা কিছু তারা লোপ পায় না, জড়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে। তোমার কামনা, তোমার আসক্তি, তোমার আবেগ সবই থেকে যায়, আর সেই সঙ্গে ব্যর্থতার বিফলতার অনুভূতি—এ সকলই তোমার প্রত্যাশিত শান্তিলাভের অন্তরায়। শান্তিময় চাঞ্চল্যশূন্য মৃত্যু লাভ করতে হলে নিজেকে তোমার তৈরী করতে হবে। আর এই প্রস্তুতির একমাত্র ফলপ্রদ উপায় হ'ল বাসনার নিবৃত্তি।

যতদিন শরীর ততদিন কাজ করতে হবে, শ্রম করতে হবে, কিছু না কিছু করতেই হবে—কিন্তু যদি তা করতে পারি ফলের কোন আকাঙ্ক্ষা না করে, এ-রকমটি হবে কি ও-রকমটি হবে এ ধরনের কোন ইচ্ছা না রেখে, তবেই ধীরে ধীরে আসক্তিশূন্য হয়ে, শান্তিময় মৃত্যুর জন্যে তৈরী হয়ে উঠি। *

---

* অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

দেবীসূক্ত

১০-১২৫

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১ ॥

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥ ৩ ॥

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৫ ॥

অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ ॥

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব ॥ ৮ ॥

পদপাঠ

(১)

অহম্—আমি।
রুদ্রেভিঃ—রুদ্রদের সঙ্গে
বসুভিঃ—বসুদের সঙ্গে
চরামি—বিচরণ করি
অহম্—আমি
আদিত্যৈঃ—আদিত্যদের সঙ্গে
উতঃ—আর, এবং
বিশ্বদেবৈঃ—বিশ্বদেবতাদের সঙ্গে
অহম্—আমি
মিত্রাবরুণা—মিত্র ও বরুণ
উভা—উভয়কে
বিভর্মি—ধারণ করি
অহম্—আমি
ইন্দ্রাগ্নী—ইন্দ্র ও অগ্নিকে
অহম্—আমি
অশ্বিনা—অশ্বিদের
উভা—উভয়কে

(২)

অহম্—আমি
সোমম্—সোমকে
আহনসম্—পেষণীয়, অনাহত
বিভর্মি—ধারণ করি
অহম্—আমি
ত্বষ্টারম্ ত্বষ্টাকে
উতঃ—আর
পূষণম্—পূষণকে
ভগম্—ভগকে
অহম্—আমি
দধামি—দান করি
দ্রবিণম্—সারসম্পদ
হবিষ্মতে—যিনি হবি বহন করেন
সু-প্রাব্যে—যিনি সুষ্ঠুভাবে অর্পণ করেন, পৌঁছে দেন।
যজমানায়—যজমানকে
সুন্বতে—যিনি সম্যক (সোম রস প্রস্তুত করেন)

(৩)

অহম্—আমি
রাষ্ট্রী—রাজেশ্বরী, সম্রাজ্ঞী
সঙ্গমনী—একত্রিত, সম্মিলিত করি
বসূনাম—সম্পদসকল
চিকিতুষী—জ্ঞানবতী, চিন্ময়ী
তাম্—সেই
মা—আমাকে
দেবত্রাঃ—দেবতারা
ব্যদধুঃ (বি+অদধুঃ)—স্থাপন করলেন চারিদিকে (বিস্তৃতভাবে)

প্রথমা—সর্ব্বপ্রথম
যজ্ঞিয়ানাম—যজ্ঞার্হ, যজ্ঞসাধন উপাদান বা করণদের মধ্যে।
পুরুত্র—বহুলভাবে
ভরি+ষ্টাত্রাম্—বহুলভাবে প্রতিষ্ঠিত
ভূরি+আবেশয়ন্তিম্—বহুলের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট (যে আমি)

(৪)

নয়া—আমাকে দিয়ে, আমার সহায়ে
সঃ—সে
অন্নম্—অন্ন
অত্তি—আহার করে
যঃ—যে
বিপশ্যতি—চোখে দেখে, দর্শন করে
যঃ—যে
প্রাণিতি—প্রাণধারণ করে
যঃ—যে
ইম্— একে,
শৃণোতি—শ্রবণ করে,
অবস্থবঃ—যারা জানে না, মন দিয়ে ধারণ করে না।
মান্—আমাকে
তে—তারা
উপক্ষিয়ন্তি—ক্ষয় পায়
শ্রুধি—শোন
শ্রুতঃ—শ্রুতিবান
শ্রদ্ধিবম্—শ্রদ্ধাবান
তে—তোমাকে
বদামি—বলছি
উক্তম্—যা মুখে বলা হয়েছে।

(৫)

অহম্—আমি
এব—তাই
স্বয়ম্—নিজে
ইদম্—এই (কথা)
বদামি—বলছি
জুষ্টম্—পূজিত, সেবিত
উত—আর, এবং
মানুষেভিঃ—মানুষের দ্বারা
ঋষিম্—ঋষি
যম্—যাকে
কাময়ে—কামনা করি, ইচ্ছা করি
তম্ তম্—তাকে তাকেই
উগ্রম্—বীর্য্যবান, রুদ্র
করোমি—করি
তম্—তাকেই
ব্রহ্মাণম্—ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মময়
তম্—তাকে
তম্—তাকেই
সুমেধাম্—সুপ্রজ্ঞ

(৬)

অহম্—আমি
রুদ্রায়—রুদ্রের জন্য
ধনুঃ—ধনুকে
আতনোমি—জ্যা আরোপ করি
ব্রহ্মদ্বিষে—ব্রহ্মবিদ্বেষীকে
শরবে—(শরাঘাতে), হিংসককে
হন্তবা—নিহত করবার জন্য
অহম্—আমি
জনায়—জনগণের জন্য
সমদম্—সংগ্রাম
কৃণোমি—করি
দ্যাবা-পৃথিবী—দ্যুলোক-ভূলোক
আবিবেশ—প্রবেশ করেছি।
উ—(নিশ্চয়ার্থে)

(৭)

অহম্—আমি
সুবে—জন্ম দিয়েছি
পিতরম্—পিতাকে
অস্য—এর
মূর্দ্ধন্—মূর্দ্ধায়, শিরোভাগে
মম—আমার
যোনি—জন্ম
অপ্সু—জলের মধ্যে
অন্তঃসমুদ্রে—সমুদ্রের মধ্যে, আন্তর সমুদ্রে
ততঃ—সেখান হতে
বি-তিষ্ঠে—ঘিরে রয়েছি
ভুবনা—ভুবনসব
অনু—অভ্যন্তরে
বিশ্বা—সকল, যাবতীয়
উত—এবং
অমুম্—ওই
দ্যাম্—দ্যুলোক
বর্ম্মনা—স্থূল দেহ দিয়ে
উপ-স্পৃশামি—স্পর্শ করে আছি

(৮)

অহম্ এব—আমিই
বাত ইব—বায়ুর মত
প্রবামি—প্রবহমান
আরভমানা—যখন চালিত করি
ভুবনানি—ভুবন
বিশ্বা—সকল
মহিনা—মহিমা
পরঃ—পার হয়ে
দিবা—স্বর্গ
পরঃ—পার হয়ে
এনা—এই
পৃথিব্যা— পৃথিবীর
এতাবতী—এতখানি, এই পরিমাণ
সম্-বভুব—আবির্ভূত, প্রকটিত।

অনুবাদ

(১)

আমি রুদ্রদের সঙ্গে, বসুদের সঙ্গে বিচরণ করি—আমি বিচরণ করি আদিত্যদের আর বিশ্বদেবতাদের সঙ্গে।

মিত্র ও বরুণ উভয়কেই ধারণ করে রয়েছি আমি ; ধারণ করে রয়েছি ইন্দ্র আর অগ্নিকেও, অশ্বিদের উভয়কে।

(২)

আমি ধারণ করে রয়েছি অনাহত সোমদেবকে, আর ত্বষ্টাকে, পূষণকে এবং ভগদেবকেও।

শ্রবসস্পদ আমি দান করি যজমানকে, যে হবি বহন করে, সুষ্ঠুভাবে অর্পণ করে এবং সম্যক সোমশোধন করে।

(৩)

আমি সাম্রাজ্ঞী, সকল সম্পদ সংগ্রহ করে ধরি, আমি চৈতন্যময়ী, যজ্ঞীয় করণের আমি সর্বপ্রথম।

আমাকেই দেবতারা বহুলস্থানে বিপুলভাবে সর্বাত্মস্বর্যাণী করে স্থাপন করেছেন।

(৪)

যে আহার করে সে আমার মধ্য দিয়ে আহার করে, যে দর্শন করে, শ্রবণ করে, জীবন-ধারণ করে, তাও আমার মধ্য দিয়ে।

আমাকে যারা মনে ধারণ করে না, তারা ক্ষয়লাভ করে। শ্রুতিমান তুমি, শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ কর যা বলি আমি তোমাকে।

(৫)

আমি স্বয়ং বলছি একথা—দেবতারা অসুরেরা আমারই করে সেবা।

আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকেই করে তুলি বীর্য্যবান, তাকে করি ব্রহ্মবিৎ, তাকেই করি ঋষি, তাকেই করি সুপ্রজ্ঞ।

(৬)

রুদ্রের জন্য ধনুকে জ্যা আমিই আরোপ করি, ব্রহ্মদ্বেষীদের শরাঘাতে হনন করবার জন্য।

জীবের জন্য আমি সংগ্রাম করি, স্বর্গে পৃথিবীতে আমি প্রবেশ করে আছি।

(৭)

পিতা দৌকে আমিই জন্মদান করি—তারও শিরোভাগে আমার জন্মস্থান, জলের মধ্যে সাগরের অন্তরে।

সেখান থেকে সকল ভুবন সর্বতোভাবে ঘিরে আমি রয়েছি—ঐ যে দ্যুলোক তাকেও আমার বাহাতনু দিয়ে স্পর্শ করেছি।

(৮)

বায়ুর মত আমি বয়ে চলেছি সম্মুখে নিরন্তর, বিশ্বভুবনকে প্রচালিত করে।

স্বর্গকে অতিক্রম করে গিয়েছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করে গিয়েছে এতখানি মহিমা আমার সাক্ষাৎ প্রকাশ পেয়েছে।

সত্যকাম কাহিনী

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

সত্যকাম এখন ঋষি, ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ। তিনি নিজে এখন গুরু—তাঁর নিজের আশ্রম হয়েছে এবং সাধকেরা, জিজ্ঞাসুরা তাঁর কাছে দীক্ষা ও শিক্ষার জন্য আসেন। সত্যকামের শিক্ষা দীক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে এবার কিছু বলব।

কামলায়ন অর্থাৎ কমলের পুত্র, উপকোশল সত্যকামের নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে দ্বাদশ বর্ষ বাস করলেন অগ্নির পরিচর্য্যা করে। অগ্নি পরিচর্য্যা অর্থ কি আমরা পরে বুঝব। উপকোশলের সঙ্গে আরো শিষ্য ব্রহ্মচারী ছিলেন। সত্যকাম সকলকেই দ্বাদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হলে শেষ শিক্ষা ও আশীর্ব্বাদ দিয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দিলেন (এর নাম সমাবর্ত্তন)। কিন্তু উপকোশলকে ছুটি দিলেন না সত্যকাম।

গুরুপত্নী (সত্যকামের স্ত্রী—সত্যকামের স্ত্রী কবে কি রকমে হল, তাঁর নামই বা কি আবিষ্কার করতে পারি নি) শিষ্যের হয়ে গুরুর কাছে অনুরোধ জানালেন "ভগবন্, ব্রহ্মচারী কষ্ট করে তপস্যা করেছে, অগ্নির পরিচর্য্যা নিপুণভাবে করেছে—অগ্নিরা যেন তোমাকে দোষ না দেন—তুমি ওকে সমাবর্ত্তন করাও অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ দিয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দাও"। গুরু কিন্তু কোন কিছু জবাব না দিয়ে চলে গেলেন প্রবাসে।

মনের দুঃখে উপকোশল অনশন ব্রত অবলম্বন করলেন (সে যুগেও মানুষেরা—সাধকেরা পর্যন্ত ধরনা ধরে উপবাস করত—**fast unto death**)। করুণাময়ী গুরুপত্নী এসে তাকে অনেক বুঝালেন—বৎস, তুমি আহার কর না কেন? আহার কর, এত আমি অনুরোধ করি (অর্থাৎ আমার মাথা খাও)। উপকোশল উত্তরে বলল—অনশন সে করছে গুরুর উপর রাগ করে নয়—নিজের উপর রাগ করে, নিজের ত্রুটির উপর রাগ করে—আধুনিকে আর প্রাচীনে পার্থক্য এইখানে। উপকোশল তবে উত্তর দিল, "ভগবতি, এই আধারকে নানামুখী ব্যাধি পূর্ণ করে রেখেছে—আমি আহার করব না।"

তখন অগ্নিরা (তিনটি অগ্নি) পরস্পরে বলাবলি করল "দেখ ব্রহ্মচারীটি নিপুণভাবে আমাদের পরিচর্য্যা করেছে, এস আমরাই একে উপদেশ দেই"।

আমরা স্মরণ করতে পারি সত্যকাম নিজেই এই ভাবে জ্ঞান লাভ করেছিলেন—গুরু

তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে—জ্ঞান তাঁর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। সত্যকামও এই পন্থাই অবলম্বন করলেন। বাহির থেকে আহরিত, অন্য কারো মুখ থেকে সংগৃহীত যে বাক্য, তা পূর্ণ জ্ঞান দেয় না। ভিতর যার তৈরি হয়নি, পরিষ্কার হয়নি, বাহির থেকে আরোপিত জ্ঞান তার মধ্যে প্রবেশ করে না—জ্ঞান ভিতর থেকে ফুটে ওঠে—গুরু অলক্ষিতে তার সহায় তবে গুরুর প্রভাব গ্রহণ করবার সামর্থ্য প্রয়োজন আছে। তাই উপকোশল শুনলে তার উদ্বুদ্ধ অন্তর-চেতনায় অগ্নিদের কথোপকথন—তারা বললে:

প্রাণই ব্রহ্ম—ক হল ব্রহ্ম, খ হল ব্রহ্ম। উপকোশল জিজ্ঞাসা করল—প্রাণ যে ব্রহ্ম প্রমাণ আছে কিন্তু ক কি, খ কি?

অগ্নিরা বললে যা ক, তাই খ—যা খ, তাই ক। ক ও খ হল প্রাণাকাশ। ক অন্তরের আকাশ, খ বাহিরের আকাশ—আকাশ প্রাণের প্রসার।

অগ্নি হল শক্তি—তপঃশক্তি, আর প্রাণ হল তপঃশক্তির প্রকাশ ক্রিয়াশক্তিরূপে—অগ্নিরা তাই জোর দেয় প্রাণের উপর।

(২)

অগ্নিরা তিন জন—কঠ-উপনিষদেও বলা হয়েছে নচিকেতা অগ্নিত্রয়ের পূজা বিধি শিক্ষা করেছিলেন এবং মৃত্যুকে জয় করেছিলেন, ত্রিলোক অধিকার করেছিলেন—ত্রিলোকমাপ্তিম্।

এখানেও তাই বলা হয়েছে। প্রথম অগ্নি হল গার্হপত্য—যে-অগ্নি গৃহপতি। তিনি প্রকট হয়ে বললেন উপকোশলকে—এই দেখ পৃথিবী, এই অগ্নি, এই অন্ন আর এই আদিত্য—আদিত্যে দেখ পুরুষবর, সে পুরুষ আমিই।

এইভাবে তৎ-কে—ব্রহ্মবস্তুকে যে জানে, পূজা করে, তার সকল পাপকৃতি বিনষ্ট হয়, সকল লোকে তার স্থিতি হয়, পরিপূর্ণ আয়ু সে লাভ করে, লাভ করে নিত্য জীবন; তার অধস্তন পুরুষেরা ক্ষয় পায় না, আমরা তাকে উপভোগ করি (তার মধ্যে আমাদের আনন্দ লাভ করি) এ লোকে ঐ লোকে—তাকে অর্থাৎ যে এই বস্তুকে এভাবে জানে ও পূজা করে।

তারপর দেখা দিল দ্বিতীয় অগ্নি—দক্ষিণাগ্নি। দক্ষিণাগ্নি উপকোশলকে বলল, এই দেখ জল, দিক, নক্ষত্র আর চন্দ্রমা। এদের যে জানে ও পূজা করে তাদের সকল পাপকৃতি বিনষ্ট হয়, তারা হয় সর্বলোকী, সর্বায়ু, নিত্যজীবী। তাদের বংশীয়েরা ক্ষয় পায় না। আমরা তাকে উপভোগ করি এ লোকে আর ঐ লোকে—তাকে, যারা একে এই ভাবে জানে ও পূজা করে।

এরপর শেষে এল আহবনীয় অগ্নি। সে এসে বললে, এই দেখ আমার দেহ—প্রাণ,

আকাশ, দৌ আর বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের মধ্যে যে পুরুষকে দেখা যায় তা আমিই, আমিই—আর ব্রহ্মের নিকট যে এইভাব নিয়ে আসীন তার অপকৃতি সব দূর হয়, তারা সর্ব্বলোকবাসী, সর্ব্বায়ু, নিত্যজীবী।

প্রত্যেক অগ্নির যে চারিটি প্রতিষ্ঠান বলা হল তার বোধ হয় একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তবে এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেওয়া হয়েছে রূপক আশ্রয়ে এবং রূপক জিনিষটা হেঁয়ালী কিছু থেকেই যায়।

গৃহপতি যে অগ্নি তার অধিষ্ঠান পৃথিবী অর্থাৎ সে জলে এই দেহে এবং তার গুণ স্থিরতা আর তার শিখা উঠে চলে ঊর্দ্ধে লক্ষ্য আদিত্য—স্থূলের আলো তা সূর্য্যই; এর বাহ্য রূপ হল অনন্ত শিখা আর ক্ষেত্র হল জড়। তেমনি দক্ষিণাগ্নির অধিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা হল মন, তার অর্থ গতি, তার রূপ চতুর্দ্দিক, তার ক্ষেত্র নক্ষত্রলোক (অন্তরিক্ষ) আর লক্ষ্য চন্দ্রমা (সোম)—আনন্দ। সেই রকম আহবনীয় অগ্নির অধিষ্ঠান প্রাণ অর্থাৎ সে হল কর্ম্মশক্তি, তার রূপ হল প্রসারতা, তার ক্ষেত্র দ্যুলোক (মনোময় লোক) ; তার লক্ষ্য যে আলো তা হল বিদ্যুৎ, স্বয়ম্প্রভ জ্যোতি।

অগ্নিরা এই ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে উপকোশলকে বলল, উপকোশল, আমরা যা জানি, সে আত্মবিদ্যা তোমাকে বলেছি; আচার্য্য এসে তোমাকে এ বিদ্যার লক্ষ্য কি গন্তব্য কি, তাই বলবেন।

ইতিমধ্যে আচার্য্য সত্যকাম ফিরে এলেন ; এসে দেখলেন উপকোশলকে। তিনি নিজে যেমন একদিন ফিরে এসেছিলেন গুরুগৃহে, গোচারণ ব্রত শেষ করে এবং তাঁর নিজের গুরু যে কথায় তাঁকে স্বাগত করেছিলেন, তিনিও এখন ঠিক তেমনি তাঁর শিষ্যকে দেখে বলে উঠলেন, "ব্রহ্মবিদের মত তোমার মুখমণ্ডল দীপ্ত, কে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে?" উপকোশল একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল প্রশ্নটি শুনে। কথাটা গোপন রেখে বলল, কে আবার শিক্ষা দেবে? হয়ত সে মনে করেছিল, অন্যের কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে শুনলে গুরু হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন। উপকোশল তবুও বলল ইঙ্গিতে এইটুকু, এই যে অগ্নি দেখছেন এদের স্বরূপ কিন্তু ভিন্ন। আচার্য্য তখন তাঁকে বললেন, অগ্নিরাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছে —কি শিক্ষা? তখন উপকোশল সব বিবৃত করে বলল।

উত্তরে সত্যকাম বললেন, অগ্নিরা তোমাকে বলেছে লোকসকলের কথা, আমি তোমাকে বলব লোকোত্তর সত্য। পৃথিবী অন্তরিক্ষ দৌ নিয়ে যে ব্রহ্ম, তা হল বিশ্বব্রহ্ম, সাম্বিক (সর্ব্বময়) ব্রহ্ম। লোকাতীত তুরীয় ব্রহ্মকে জানা চাই, তাকে জানলে তুমি এই সকল লোকে বিচরণ করতে পারবে—পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।

অগ্নি তিনটি—প্রথম, প্রতিষ্ঠা, এই স্থূল দেহালয়ে ঊর্দ্ধশীর্ষী যে তপঃশক্তি। এ যেন বলা যেতে পারে কুণ্ডলিনী শক্তি। কুণ্ডলিনী এই অগ্নি শক্তি যখন আপনাকে খুলে ঘুরে ঘুরে ঊর্দ্ধে উঠেছে, তাকে উন্মুক্ত প্রসারিত করে চলেছে দক্ষিণাবর্ত্ত হয়ে—সেই হল দক্ষিণাগ্নি

অন্তরিক্ষ বা অন্তশ্চেতনাগত আপূহাদি। দক্ষিণাবর্ত্ত, কারণ এর গতি হল দক্ষিণা বা দক্ষ—সত্য-মিথ্যা-বিবেক, সম্পূর্ণ জ্ঞানময়—শুদ্ধ হয়ে শুদ্ধাচি হয়ে উর্দ্ধে নিয়েছে গিয়ে আহবনীয় অগ্নির সঙ্গে—উর্দ্ধস্থ যে-তপঃশক্তিকে আহ্বান ক'রে, আবাহন ক'রে নামিয়ে আনতে হয় বিশুদ্ধ মনোময় লোকে—দ্যৌর্লোকে নিহিত যে তপঃশিখা।

অগ্নির বললে ব্রহ্মের রূপ বা প্রসারের—অন্তঃপ্রসারের (দেশে ও কালে) কথা। সত্যকাম বললেন শেষে ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁর প্রসার নয় তাঁর স্বগুণ। তাঁর সে স্বগুণ হল দুটি—'বামনী' 'ভামনী'—তিনি আনন্দময়, তিনি জ্যোতির্ম্ময়।

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[চতুর্থ পাদ—পূর্বযোগ]

অতিমানস সংজ্ঞান

মনের যত বৃত্তি সব অতিমানসেও আছে, কিন্তু সেখানে তাদের রূপ আর ক্রম আলাদা। অতিমানস মননের মত অতিমানস ইন্দ্রিয়সংবিৎও (sense) আছে। তবে তাকে ইন্দ্রিয়সংবিৎ না বলে একটি বৈদিক পরিভাষা অনুসারে বলব 'সংজ্ঞান'।

এই সংজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে হলে যেতে হবে মনের উজানে—অন্তরাবৃত্ত চেতনার পরম গঙ্গোত্রীতে। চেতনার এমন-একটা ভূমি আছে, যেখানে সে গুহাহিত, আত্মনিবিষ্ট, আত্মারাম এবং নিমেষিত শক্তির উপগূহনে নিস্পন্দ। এই আত্মসমাহিতির একদেশে একটা দিব্যক্ষোভ আছে, তাহতেই অতিমানসের পরাঙ্মুখী (objectivised) বৃত্তির সৃষ্টি হয়। এই বৃত্তির চারটি পর্যায়—তাদাত্ম্যজ্ঞান বিজ্ঞান প্রজ্ঞান এবং সবার শেষে সংজ্ঞান।

আত্মসমাহিতিতে বিষয়-বিষয়ীর ভেদ থাকে না, ভেদ দেখা দেয় বৃত্তিতে। তাদাত্ম্য-জ্ঞান হতে সংজ্ঞান পর্যন্ত বৃত্তির যেন অবরোহক্রম। সেই অনুসারে তাদের মধ্যে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদের তারতম্য আছে। অতিমানস চেতনা যতই সংজ্ঞানের দিকে নেমে যায়, ততই বিষয়ের স্বরূপ তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মানস জ্ঞানের মত বিষয় বিষয়ী হতে বিবিক্ত হয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজেকে স্পষ্ট করে না, বিষয়ীর আত্মপ্রত্যয়ের তীব্রতাকে বজায় রেখেই সে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়সংবিতের সঙ্গে সংজ্ঞানের এইখানে তফাত।

তাদাত্ম্যজ্ঞানে বিষয় আর বিষয়ীর ভেদ যেন থেকেও নাই। বিষয় সেখানে বিষয়ীর আত্মবিভূতি। আমি যা জানি, তা 'হয়ে' জানি। সে-জানা 'আত্মনি আত্মানম্ আত্মনা'—আত্মাতে আত্মাকে আত্মা দিয়ে জানা। ভালোবাসার পরম রসায়নে দুয়ের এক হয়ে যাওয়ার মধ্যে এমনিতর জানার বিলাস আছে। এই জ্ঞানই আদিম জ্ঞান, আত্মমন্থনের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞানকে নিজের মধ্য থেকে উৎসারিত করা—বাইরে থেকে তাকে আহরণ করা নয়।

তার পরের ধাপ হল বিজ্ঞান, অতিমানসের যা একটি বিশিষ্ট বৃত্তি। বিজ্ঞান বিষয়কে

বিষয়ীর সামনে এনে ধরে, কিন্তু বিষয়ীর সঙ্গে তার তাদাত্ম্যবোধকে মোটেই লুপ্ত করে না। বিষয় বিষয়ীর সামনে উপস্থাপিত হয় বলে এখানে স্বরূপের সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হয় তার বৈভবেরও। বৈভবে ধর্মের বৈচিত্র্য থাকলেও তারা এমনই অনোন্যাসংহত যে সব মিলিয়ে সেখানে দেখা দেয় জ্ঞানের একটি অখণ্ড সমাহরণ (integration)। অতিমানসের এই বৃত্তিকে অন্যত্র বলেছি সম্ভূতি-সংবিৎ (comprehensive knowledge)। সম্ভূতি হল বিভূতির সমাহার—যেমন শতদলের সবগুলি দলকে যুগপৎ বুদ্ধিস্থ ক'রে একটি অখণ্ড কমলের প্রত্যয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান এই অবস্থাতেও আত্মসমাহিতি ও তাদাত্ম্যজ্ঞান হতে স্খলিত হয়নি।

অতিমানস বিজ্ঞান থেকে আরেক ধাপ নেমে এলে অতিমানস প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞানে পরাক্ (objective) দৃষ্টি আরও স্পষ্ট। সম্ভূতি-সংবিৎ এখানে রূপান্তরিত হয় বিভূতি-সংবিৎএ (apprehensive knowledge) শতদলের প্রত্যেকটি দলকে তখন খুঁটিয়ে জানি, চাইকি তার কোনও-একটি দলের প্রতি বিশেষ নজর দিই। এতক্ষণ জ্ঞান ছিল যেন অব্যবহার্য, এইবার তা দর্শনে মননে বচনে স্ফুরিত হয়ে ব্যবহার্য হল। তবুও এ-প্রজ্ঞান অতিমানস চেতনারই একটি বৃত্তি, সুতরাং তার মধ্যে তার প্রাক্তন এবং ঊর্ধ্বতন বৃহত্তর সমাবেশ অক্ষুণ্ণই থাকে। সুতরাং অতিমানস প্রজ্ঞানে বিষয়ের আস্বাদনের কোনও ন্যূনতা ঘটে না, বরং ফোটে একটা সমৃদ্ধিমান্ চিদ্‌বিলাসের চমৎকারিতা।

তারপর আরেক ধাপ নেমে এলে বিষয়ের স্পষ্টতা যখন আত্মচৈতন্যের তীক্ষ্ণতা নিয়ে বিষয়ীর সামনে আবির্ভূত হয়, তখনই আমরা পাই অতিমানস বৃত্তির চতুর্থ পর্যায় বা সংজ্ঞান। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সংবিতের (sensation) মত সংজ্ঞানেও বিষয়ী আর বিষয়ের মধ্যে সন্নিকর্ষের (contact) একটা সেতু থাকে; তাতে প্রত্যয়টি বিষয়ী করণ (instrument) আর বিষয়ের ত্রিপুটীতে ভাগ হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনটির মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে থাকে তাদাত্ম্যবোধের এক অখণ্ডতা, তিনটিই এক সুদীপ্ত আত্মচৈতন্যের বিচ্ছুরণ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকে (sense-contact) আশ্রয় করেও এই সংজ্ঞান প্রবর্তিত হতে পারে এবং সিদ্ধদশায় তা হয়ও। তখন এই সাধারণ ইন্দ্রিয় নিয়েও বস্তুর মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার অতিমানস সত্তা এবং শক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তার ফলে উপনিষদ্‌বর্ণিত 'গূঢ়োত্মাকে' কেবল সূক্ষ্মদর্শীর অগ্র্যাবুদ্ধি দিয়েই নয়, এই স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়েও দেখা যায়।

প্রাকৃত বুদ্ধির কাছে সংজ্ঞানের স্বরূপকে স্পষ্ট করে তোলা একটু কঠিন, কেননা আত্মচৈতন্যের যে-সন্দীপনায় এই বৃত্তির স্ফুরণ হয় তা প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর। প্রাকৃত অনুভবে বিষয় আর ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষই প্রধান, মনকে তারা যা দেখায় মন নিরুপায় হয়ে তা-ই

দেখে। কিন্তু মনের এই ইন্দ্রিয়বশ্যতা তার স্বরূপ নয়। এই প্রাকৃত মনের মধ্যেও এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, যা নিজের ভিতর থেকে ইন্দ্রিয়ের অগোচর এমন-কি অভাবিত বিষয়েরও রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। সাধারণত আমরা একে বলি 'কল্পনা' এবং বাস্তবের তুলনায় তাকে খাটো করে দেখি। কিন্তু বস্তুত এই কল্পনাতেই মনের মুক্তি এবং তার স্ব-তন্ত্র সামর্থ্যের পরিচয়। অবিদ্যা-বাসনার সংস্কার থেকে মুক্ত হলে কল্পনা পরিশুদ্ধ হয়, তখন সে যোগিচিত্তের একটি বৃত্তি, যার পারিভাষিক নাম হল 'প্রতিভান' বা 'প্রাতিভ-সংবিৎ'। প্রতিভান ইন্দ্রিয়সংবিতেরই মত এক অলৌকিক প্রত্যক্ষের হেতু। তার স্থিতি মনের ওপারে—বোধির এলাকায়। সে সংজ্ঞানেরই একটি বৃত্তি এবং তাকে আশ্রয় করে অতিমানস ভূমিতে সংজ্ঞান বোধিকে বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানে ব্যাপারিত করে। তাহলে, ইন্দ্রিয়ের উজানে যেমন মন (অথচ সাধারণত যে ইন্দ্রিয়নির্ভর), তেমনি মনের উজানে বোধির এলাকায় সংজ্ঞান এবং তার অলৌকিক প্রত্যক্ষের বৃত্তি। এই প্রত্যক্ষ চিন্ময়।

প্রাকৃত ভূমিতে যেমন দেখি, ভাব বস্তুতে রূপ ধরে, মানসপ্রত্যক্ষ ঘনীভূত হয় ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে, তেমনি অতিমানসভূমিতে তাদাত্ম্যজ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রজ্ঞান ঘনীভূত ও সাকার হয় এই সংজ্ঞানে। ওই তিনটিতে যা চিৎস্বরূপ চিন্ময় বা চিদ্‌ঘন, সংজ্ঞানে তা চিদ্‌ঘনবিগ্রহ। উপনিষদে আছে ব্রহ্মগন্ধ ব্রহ্মরস ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মস্পর্শের কথা। এগুলি রূপক নয়, সংজ্ঞানের চিন্ময় বৃত্তির দ্বারা চিন্ময় প্রত্যক্ষ। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বাধ্যনেও এ-প্রত্যক্ষ সম্ভব—ইন্দ্রিয় দিয়েই ব্রহ্মকে দেখা শোনা ছোঁয়া চাখা যায়। সে-অনুভবে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পরম উল্লাস, প্রাণের নিঃসীম আরাম, মনের অনুত্তম রসায়ন। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ব্রহ্মঘোষ তখনই সত্য হয়—যেমন অন্তরে, তেমনি বাইরে।

অতিমানস সংজ্ঞান সব-কিছুকে অনুভব করে ব্রহ্মরূপে, অনুভব করে ব্রহ্মের মধ্যে। সে দেখে, এক ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা সব-কিছু আবিষ্ট অনুবিদ্ধ এবং ধারিত। কিন্তু এই একের অনুভবে বহুর জ্ঞান আড়াল হয়ে যায় না, একের মধ্যেই বহুর চিদ্‌ঘন বিশ্বু হীরকদ্যুতিতে ঝিকিয়ে ওঠে। তখন দুইই অনন্ত—যেমন একও অনন্ত, তেমনি বহুও অনন্ত। সীমার বেষ্টনীতে থেকেও বহুর আনন্ত্য স্ফুরিত হয় তার অর্থের আর শক্তির সীমাহীন ব্যঞ্জনায়। এ যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর উল্লাস, আত্মচৈতন্যের প্রজ্ঞানঘন নিবিড়তায় ব্রহ্মচৈতন্যের বিস্ফারণ। ইন্দ্রিয় দেখে রূপের খণ্ডতা ; কিন্তু তাকে স্বীকার করে নিয়েই সংজ্ঞান দেখে তার অন্তর্পূর্ণ শক্তি ও বৈভবের অনন্তে উধাও হয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি খণ্ড অনুভব তখন অখণ্ডের প্রত্যক্ষ দ্যোতনায় উদ্ভাস্বর। উপনিষদ যাকে বলেছেন 'আকাশ আনন্দ', সেই আনন্ত্য-চেতনার মহাসমুদ্রে ইন্দ্রিয়ের অনুভব চিন্ময় বীচিভঙ্গের বিদ্যুৎ-বিসর্প। সামান্য চোখের দেখাও তখন সীমার গভীরে উন্মোচিত করে অসীমের আলেখ্য, রূপের আড়ালে ভাবের অকূলন্ত প্রচ্ছটা, সান্নিকর্ষকে উপলক্ষ্য করে সাযুজ্যের সাম্রতা। আর তাইতে অসাড়ের গভীরেও সাড়া জাগে, পাষাণী প্রকৃতির অদম্য প্রতিবাও আনন্দকৈশোরের চিন্ময় স্পর্শে

চিন্ময়ী হয়ে ওঠে, এই দৃষ্টিই অবন্ধ্য ক্রতুতে হয় নবসৃষ্টির প্রবর্তক। আর সে-সৃষ্টির আদ্যন্ত এক চিদ্‌বিলসিত আনন্দের মূর্ছনা।

এই অতিমানস সংজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় মহাবিদেহ-ধারণায়। দেহের মধ্যে তার প্রকাশ সম্ভব হলেও স্বরূপত সে দেহ-মনের ব্যাপার হতে স্ব-তন্ত্র, অন্তর্বনেরও নাগালের বাইরে। এই সংজ্ঞান সর্ববিৎ: সমাধির গাঢ়তায় নিবিষ্ট থেকেও যেমন অন্তঃপ্রজ্ঞ, তেমনি ঠিক সেইসময়েই বহিঃপ্রজ্ঞও, অর্থাৎ প্রজ্ঞানঘন সুষুপ্তির গভীর হতে সে অবাধে বিচ্ছুরিত হয় বিজ্ঞানময় স্বপ্ন ও জাগ্রতের ভূমিতেও। আবার তেমনি জাগ্রৎভূমি থেকেও বিলোমক্রমে অবগাহন করতে পারে স্বপ্ন- ও সুষুপ্তি-সংবিতের গভীরে—লোক হতে লোকান্তরে, ভূত-ভব্যের যবনিকার অন্তরালে, বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয়ের অগম-রহস্যে। প্রাকৃত প্রত্যক্ষের নৈশ্চিত্য আছে, কিন্তু বিষয়ের মর্মে অবাধে অনুপ্রবেশের সামর্থ্য নাই। অতিমানস সংজ্ঞানের তাও আছে—যেন বৈজ্ঞানিকের রঞ্জনরশ্মির মত।

*

মনের অতিমানস রূপান্তর সিদ্ধ হয় তার মধ্যে অতিমানসেরই সক্রিয় আবেশে, যার অবন্ধ্য বীর্য তার সমস্ত করণকে এক সন্দীপন প্রতিভায় নতুন করে সঞ্জীবিত করে তোলে। ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃত শক্তি তখন ব্যাহত বা নিরুদ্ধ হয় না। বরং তার মধ্যে এযাবৎ অপ্রকটিত এক দিব্য অনুভবের ঢল নামে, যাতে প্রমেয়ের (the thing to be known) আত্মা বিবৃত হয় প্রমাতার আত্মার কাছে, দৃক্ আর দৃশ্যের মধ্যে আত্মা-অনাত্মার ভেদ ঘুচে গিয়ে সমস্ত দর্শনটাই হয়ে ওঠে আত্মা দিয়ে আত্মার দর্শন—শুধু বিজ্ঞানে বা প্রজ্ঞানেই নয়, সংজ্ঞানেও। আর তাইতে দ্রষ্টা পুরুষের কাছে দৃশ্যা প্রকৃতির সমস্ত বিভূতি এবং ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

চোখ বিচিত্রকে দেখে। কিন্তু সে শুধু ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখার মত একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। মন সেই দৃশ্যের মধ্যে একটা অর্থের আরোপ করে, তখন দৃশ্যের অর্থের আবিষ্কারে দেখাটি সম্পূর্ণ হয়। সাধারণত এই অর্থের আরোপ হয় ব্যবহারের প্রয়োজনে, তাতে দৃশ্যের সমগ্র অর্থটি দ্রষ্টার কাছে প্রতিভাত হয় না। একজন কাঠুরের কাছে একটা গাছের যে-অর্থ, একজন বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী বা কবির কাছে তার অর্থ তার চাইতে অনেক বেশী। এবং প্রাকৃত জীবনের সীমিত প্রয়োজনের নিরপেক্ষ বলে তত্ত্ব ও রসের বিচারে সে-অর্থের মূল্যও বেশী।

এই সূত্র ধরে অতিমানস সংজ্ঞানের স্বরূপ আমরা বুঝতে পারি। সে-সংজ্ঞানের দেখা এই সাদা চোখেই দেখা, কিন্তু অনন্তের মধ্যে রেখে সান্তকে দেখা। আনন্ত্যের অবিকল্প (devoid of mental construction) প্রত্যয়ের দ্বারা আবিষ্ট দ্রষ্টার চৈতন্য প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই বিচ্ছুরিত হয়ে সংজ্ঞানকে এক ক্রান্তদর্শী দিব্য সামর্থ্যে ভাস্বর করে তোলে। তাতে সান্তের মনচর অনন্তের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় তত্ত্বের ঐশ্বর্যে এবং রসের

মাধুর্যে অনির্বচনীয় হয়ে এবং তার প্রয়োজন নিরূপিত হয় বিশ্বের ধৃতচ্ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। একটি ঘাসফুলের মধ্যেও সংজ্ঞানী দেখেন ব্রহ্মের অপ্রমেয় সত্য আনন্দ আর শক্তির স্বচ্ছন্দ ধৃতায়ন।

একটি ঘাসফুলের মধ্যে অনন্তের বিচিত্র সত্তা আনন্দ ও ধৃতচ্ছন্দই যে শুধু সংহত হয়ে আছে তা নয়, ওটি যেন বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের চিদ্‌ঘন বিন্দু, ওর নৈক্তিকচ্ছটায় অসীমের অনন্ত বিভাবনার কলাপী উচ্ছ্বাস যেন। ও সবার সঙ্গে এক, ওর অর্থে সবার অর্থ। যেমনি ও, তেমনি এই একটি, ওই একটি, আরও একটি—অসীমের ফুলঝুরি অবিরাম ঝরছেই ঝরছেই। রূপে-রূপে একই অখণ্ড আনন্দকে পালটে-পালটে দেখা। যেন একটি ওপালের (opal) বর্ণবিভঙ্গের লাস্যের লীলায়। সংজ্ঞানের এই লোকাত্মক অথচ লোকোত্তর তুরীয় দর্শন।

যেমন দেখা, তেমনি শোনা আর ছোঁওয়া—সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে মাত্রাস্পর্শের গহন হতে ব্রহ্মসংস্পর্শের অমৃত আনন্দের আহরণ এবং আস্বাদন। অনুভবের বিদ্যুৎসূচীতে আনন্দোত্থ আত্মাম্বর চেতনায় এক অনির্বচনীয় ইন্দ্রধনুচ্ছটার বিচ্ছুরণ ও প্রবিলয় শূন্যতার অগম সান্দ্রতায়—যেখানে 'কিছুই-নাই'এর মধ্যেই 'সব-আছে'র অশব্দ অস্পর্শ অরূপ মূর্ছনা।

অতিমানস রূপান্তরের ফলে, প্রাকৃত দেহচেতনার সঙ্কোচের যে-আড়াল রয়েছে তা ভেঙে যায়, এই শরীরের অনুভব রূপান্তরিত হয় 'আকাশশরীরং ব্রহ্মে'র অনুভবে। ব্রহ্মাণ্ড তখন গুটিয়ে আসে পিণ্ডে, পিণ্ড বিকীর্ণ হয় ব্রহ্মাণ্ডে। শক্তির কেন্দ্রাভিগ (centripetal) এবং কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) দুটি গতির দোলনে এই হৃদয়েরই ছন্দ স্পন্দিত হতে থাকে আদিত্যহৃদয়ের ছন্দে। আমার 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ' দৈহ্য আত্মা আলোকবর্তিকার মত কেন্দ্রে সংহত হয়ে যুগপৎ পরিধিতে পরিকীর্ণ। তার প্রভাস্বর পরিমণ্ডলের মধ্যেই বিশ্বের সমস্ত সত্তের (beings) ও শক্তির অবাধ সঞ্চরণ। শুধু সঞ্চরণ নয়, অন্যোন্যসঙ্গমন—আলোকের যা স্বভাবধর্ম। এই ধর্মের অনুসরণেই প্রাকৃত চেতনার ভূমিতে দেখা দেয় সংবেদন (sympathy), অতিমানস চেতনায় যা অসীমণ্ডণিত হয়ে রূপান্তরিত হয় সর্বাত্মভাবে। তখন এই রূপই বিশ্বরূপ, 'অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং সর্বতোঽনন্তরূপ' এই দেহেই 'দেবাঃ সর্বে তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘাঃ'। যেমন এই প্রাকৃত দেহের প্রত্যেকটি কোষের স্বাতন্ত্র্যকে তন্ত্রিত করে এক দেহীর পরম স্বাতন্ত্র্য, তেমনি এক বিরাট মহাভূতের স্বাতন্ত্র্যে বিধৃত এই ভূতবিশেষসংঘের স্বাতন্ত্র্য। প্রতি জীব এক জীবঘনেরই কোষভূত, সব 'আমি' এক পরম আমিরই স্ফুলিঙ্গ—আর এই প্রত্যয় এই আমিতে, যে-আমি যুগপৎ বিশ্বোত্তীর্ণ বিশ্বাত্মক এবং ব্যক্তি। সব হয়ে সবার মধ্যে আবিষ্ট হওয়ার আনন্দ তখন উল্লসিত হয় এই সন্ততনুরই অণুতে-অণুতে—এমন-কি ব্যক্তির দুঃখের বিষাদী সুরও সঙ্গতি পায় বৃহৎ সামের সর্বসমঞ্জস নিটোল আভোগে। এই দেহের তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত ইন্দ্রিয়সংবিৎমাত্রেই হয় পরমানন্দের সংবিৎ।

দেহাশ্রিত প্রাকৃত মন ইন্দ্রিয় দিয়ে জানে বাইরের জগৎকে, আর সাক্ষাৎভাবে জানে তার অন্তর্জগৎকে। কিন্তু সাধারণত সে মনে করে তার এই আন্তর অনুভবের উৎস রয়েছে বাইরে, বহির্জগৎই প্রতিনিয়ত তার অন্তর্জগতে তরঙ্গ তুলছে। উপনিষদে একেই বলা হয়েছে প্রাকৃত জীবের পরাক্ দৃষ্টি। কিন্তু এই বহির্মুখ দৃষ্টিতে বাইরেরও সব-কিছু জানা যায় না, দৃষ্টি প্রায়শ বস্তুর বাইরের রূপে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে, তার অন্তরের তত্ত্বের সন্ধান পায় না।

কিন্তু এই পরাক্ দৃষ্টি ছাড়াও আছে 'আবৃত্তচক্ষু ধীরে'র প্রত্যক্‌দৃষ্টি, যোগীর অন্তর্দৃষ্টি বা অন্তরাত্মাকে দেখে। এই আত্মবোধ একেবারেই বহির্জগতের বোধের নিরপেক্ষ, কেননা প্রথমটায় বাইরের জ্ঞান লুপ্ত হলে তবেই এই আন্তরজ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। অবশ্য তখনও আত্মবোধ দেহেরই আশ্রিত, কিন্তু তবুও দেহবোধ যে তখন এক চিদ্‌ঘন অথচ পরিব্যাপ্ত দেহবোধে রূপান্তরিত হতে থাকে, তার আভাস আগেই দিয়েছি।

এই আন্তর বোধের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এ যোগীর দৃষ্টির সামনে বহির্জগতেরও অন্তঃপুরের দুয়ার খুলে দেয়। এখন ইন্দ্রিয়ের কাছে দেহ শুধু প্রত্যক্ষ, প্রাণ মন ইত্যাদি একটা আবছা অনুমানের বিষয়। কিন্তু যোগীর অন্তর্দৃষ্টি তখন প্রাণ দিয়ে প্রাণকে মন দিয়ে মনকে চেতনা দিয়ে চেতনাকে অপরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। এই দৃশ্য জগতের অন্তরালে তখন আপাত-অদৃশ্য আরেকটা জগতের পরম্পরা উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

জড়ের গভীরে রয়েছে প্রাণ, জড়জগতের অন্তরালে প্রাণের জগৎ। এখানে প্রাণকে মনে হয় একান্তই জড়াশ্রিত, যেন সে জড়েরই একটা প্রতিভাসমাত্র। কিন্তু বস্তুত এ তার সংবৃত্ত (involved) দশা, এছাড়াও তার একটা স্বাধীন স্ব-তন্ত্র ভূমি আছে, যেখানে থেকে এই অবরভূমিকে সে প্রভাবিত করছে। চেতনার অপ্রাকৃত অবস্থায় সে-প্রভাবের কিছু-কিছু আভাস আমরা পাইও। স্বধামে থেকে ক্রিয়াপর হবার জন্য প্রাণ যে-বাহনকে আশ্রয় করে তা আর এই স্থূলভূত নয়—'ভূতসূক্ষ্ম' বা ভূতেরই ভাব বা শক্তিরূপ। প্রাণক্রিয়ার প্রত্যক্ষে যোগী এই ভূতসূক্ষ্মই প্রত্যক্ষ করেন এবং সে-প্রত্যক্ষ হয় তাঁর আত্মপ্রাণের প্রত্যক্ষের সমবেত (inherent)। এক্ষেত্রে প্রাকৃত মন অনুমান আর কল্পনার তোড়াতাড়া দিয়ে কোনরকমে কাজ চালিয়ে যায় মাত্র—যেমন ধরা যাক ভৈষজ্যের দ্বারা প্রাণকে নিরাময় করবার প্রচেষ্টায়। প্রাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ কারবারে প্রথমটায় যোগীও খানিকটা মানস-সংস্কারের বশে হাতড়ে-হাতড়ে চলেন। কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মপ্রবোধন এবং অতিমানস শক্তিপাতের ফলে মানস সংস্কার নির্মূল হয়ে গেলে দিব্যপ্রাণের প্রজ্ঞান শক্তি ও প্রবর্তনা যোগীর মধ্যে স্বরূপেই আবির্ভূত হয়।

এই আবির্ভাব স্থূল অন্নময় কোশেই ঘটে এবং তার ফলে তার অন্তরে এবং তাকে ঘিরে রয়েছে যে প্রাণময় কোশ তার চেতনা যোগীর মধ্যে প্রজ্বল হয়ে ওঠে। যোগী তখন স্থূল অন্নময় শরীরেই বাস করেন না, বাস করেন সূক্ষ্ম প্রাণময় শরীরেও। এ যেন অনন্ত

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে এক টুকরা কয়লার আগুন হয়ে ওঠার মত। কয়লার মধ্যকার তাপ তখন বাইরের তাপের সঙ্গে একাকার। জড়ের জগৎ বস্তুত বিশ্বপ্রাণের মধ্যে নিমজ্জিত এবং তার দ্বারা অনুবিদ্ধ। এই প্রাণ সম্পর্কে সচেতন হলে পর যোগী সাক্ষাৎভাবে তার শক্তিকে আহরণ নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালন করতে পারেন। নিজের দেহের মত করে প্রাণকে পরের দেহেও প্রত্যাহৃত করা কিংবা তার ক্রিয়াকে পরিচালিত করা তখন অসম্ভব হয় না। প্রাণ সম্পর্কে এই অপরোক্ষ সচেতনতা এবং তার স্বচ্ছন্দ বশীকার অতিমানস শক্তিপাতের ফলেই অনায়াস হতে পারে।

তখন দেহকে আশ্রয় করে জীবে-জীবে যে ভেদের প্রাচীর তা ভেঙে পড়ে, এক বিশ্ব-ব্যাপ্ত চিন্ময় প্রাণসমুদ্রের বিদ্যুৎপ্রবাহ যে সব-কিছুকে পরিপ্লুত করে রয়েছে এ-অনুভব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যোগীর দেহ তখন হয় প্রাণবিচ্ছুরণের একটা শক্তিকূট, দেহের বাধা দূর হয়ে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ হয় সাবলীল। জাগে এক অনির্বচনীয় প্রাণসংবিৎ (vital sense) যার তন্ত্রে-তন্ত্রে বিশ্বপ্রাণের আনন্দমূর্ছনা বিচিত্র সুরলীলায় ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। অতিমানসের আবেশ এবং প্রশাসনে এই প্রবুদ্ধ প্রাণচেতনা তখন হয় জীবনের মর্মমূলে দিব্যসঙ্কল্পের অবাধ্য স্ফুরণের স্বচ্ছন্দ বাহন।

প্রাণচেতনা ও প্রাণসংবিতের উদ্‌বোধনে সাধকের মধ্যে যেসব অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্ফুরণ হয়, সাধারণত তাদের ফেলা হয় চৈত্য (psychical) বিভূতির এলাকায়। প্রাকৃত ভূমিতে চৈত্যসত্তা ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী বহির্মনের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে : চিত্তের অন্তরা-বৃত্তিতে তার শক্তি ও প্রভাব স্ফুরিত হয়ে এইসব অতীন্দ্রিয় এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষের পথ খুলে যায়, একথা সত্য। কিন্তু এসব অনুভবেরও দুটি জাত আছে—একটি ব্যামিশ্র, আরেকটি শুদ্ধ। সাধকের চিত্ত যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বাসনা এবং সংস্কারের আবিলতা হতে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ ফোটে সত্য-মিথ্যার মেশানো ব্যামিশ্র বিভূতি। এগুলি কতকটা যেন প্রাকৃতভূমির স্বপ্নের মত। বিপদ হচ্ছে এই, এদের মধ্যে যেটুকু সত্যের প্রকাশ ঘটে, তা-ই নিয়ে সাধকের অহঙ্কার শক্তিমত্তায় কেঁপে উঠে তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। মহাজনেরা সিদ্ধাইএর পিছনে ছুটতে বারণ করেন এইজন্য। সমাধিতে বিভূতির স্ফুরণ হওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সমাধি চিত্তের সব ভূমিতেই হতে পারে, অথচ সব ভূমিই কিছু বিদ্যার ভূমি নয়। তাই প্রথমটায় বিভূতির স্ফুরণকে উপেক্ষা করে সাধকের কর্তব্য চিত্তকে অবিদ্যার সংস্কার থেকে মুক্ত করা। সমাধি যখন প্রজ্ঞার ভূমিতে প্রবর্তিত হয়, তখন দেখা দেয় বিদ্যার শুদ্ধ বিভূতি। তার অনুভবে যেমন নির্ভেজাল সত্যের প্রকাশ, ব্যবহারেও তেমনি বিশ্বভাবন ঋতের লীলায়ন।

চৈত্যবিভূতির বস্তুত কোনও অন্ত নাই। এখানে তাদের রূপ আর রীতি নিয়ে একটা মোটামুটি আলোচনাই সম্ভব। স্থূল ইন্দ্রিয়সংবিতের অনুরূপ সূক্ষ্ম সংবিৎও আছে। যোগের ভাষায় তাদের বলা হয় 'প্রাতিভ-সংবিৎ'—যেমন দিব্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের সংবিৎ। এদের মধ্যে সাধারণত রূপসংবিৎ ফোটে সবার আগে। ভূতাকাশে যে ভৌতিক রূপ ফোটে তাকে গ্রহণ করে ভৌতিক চক্ষু; তেমনি চিত্তাকাশে চৈত্যরূপকে গ্রহণ করে দিব্য চক্ষু। এগুলি ভৌতিক জগতের ভূত বা ভব্য অর্থের ছবি হতে পারে। দৃষ্টি খুলে গেলে নানাভাবে এদের দেখা যায়—সমাধিতে বা ব্যুত্থানে, চোখ বুজে বা চোখ মেলে, বাইরে বা ভিতরে, দেশ বা কালের সমস্ত ব্যবধান ছাপিয়ে। কিন্তু সর্বত্রই বিষয়ী আর বিষয়ের সন্নিকর্ষ এত নিবিড় হয় যাতে অনুভব হয়, এ যেন বিষয়চৈতন্যেরই বিভূতি, গাছে ফুল ফোটার মত করে ফুটছে। অন্তরাবৃত্ত চেতনায় বোধের গতি তখন ভিতর থেকে বাইরের দিকে।

প্রাতিভসংবিতের মত চিত্তাকাশে ভাবের রূপকল্পও ফোটে। এগুলি কখনও জাগে সাধকেরই চেতনার গভীর হতে, কখনও-বা সংক্রামিত হয় পরচিত্তের পরিমণ্ডল হতে। প্রকৃতিতে এরা ব্যামিশ্র, সত্য-মিথ্যার ভেজালে তৈরী, বুদ্বুদের মত কিছুক্ষণ থেকে আবার মিলিয়ে যায়, সাধকের দেহ-প্রাণ-মনের উপর রেখে যায় ভাল-মন্দের ছাপ। কখনও তারা আসে পার্থিব স্তর থেকে, কখনও-বা অপার্থিব অন্য-কোনও স্তর থেকে।

চৈত্যবিভূতির আরেকটি প্রকার হচ্ছে প্রাতিভসংবিতের সহায়ে পার্থিব বা অপার্থিব সত্ত্বের (beings) সঙ্গে সংযোগ ঘটানো। এমনি করে জড়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাদের চৈত্যসত্তাকে সক্রিয় করে তোলা যায়—জড়ভূত তখন হয় যোগীর অধ্যাত্মশক্তির বাহন। আবার জাগ্রৎ বা স্বপ্ন-সমাধিতে আত্মচৈতন্যের সংহনন (consolidation) ও পুরঃক্ষেপের (projection) সহায়ে লোক-লোকান্তরের সত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন—এও চৈত্যবিভূতির আরেকটি প্রকার।

অন্যত্র বলেছি, পৃথিবীর উপরে-নীচে প্রাণ ও চেতনার আরও লোক বা ভুবনের পরম্পরা রয়েছে: উপরের দিকে রয়েছে দেবলোক এবং সত্তার অন্যান্য মহাভূমি। এই ভুবনগুলি ওতপ্রোত, তাই অজ্ঞানতে আমাদের পার্থিব জীবনকেও তারা প্রভাবিত করে চলেছে। চৈত্যসত্তার জাগরণে এইসমস্ত প্রভাব আমাদের সুস্পষ্ট অনুভবের এলাকায় আসে। প্রথমত তারা চেতনায় ভেসে ওঠে প্রতিচ্ছবি বা প্রতীকের আকারে। চিত্ত সংস্কারমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এদের অর্থ ঠিক-ঠিক বোঝা যায় না বা এদের ঠিকমত কাজে লাগানো যায় না। তাই প্রথমটায় তটস্থ থেকে এদের শুধু দেখে যেতে হয়—নিজের বাসনার অনুকূলে এদের ব্যাখ্যা বা ব্যবহার করবার চেষ্টা না করে। নিঃস্পৃহ দ্রষ্টৃত্বের ফলে ক্রমে এদের সঙ্গে পরিচয় যখন প্রগাঢ় হয়, তখন পার্থিব ভূত আর শক্তির মতই এদের বিবিক্ত ব্যবহার সম্ভব হয়। জড় আর জড়োত্তরে তখন কোনও ভেদ থাকে না—জড়ের ভিতর হতে শক্তির মুক্তিতে এবং

P3025

ভড়োত্তর শক্তির সংহননে ধাপিকে অনুভব হয় একই চিৎসত্তের (Spiritual Existent) এপিঠ আর ওপিঠ।

গীতায় মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃত মনে বিষয়সম্পর্কে ইন্দ্রিয়-সংবিতের তীক্ষ্ণতা নাই। একটা-কিছুকে আমরা দেখি খুবই স্পষ্ট করে, কিন্তু তার সম্পর্কে আমাদের ভাবনা প্রায় সবসময়েই আবছা। আবার আমাদের মন নিজের জগতের সম্পর্কে খানিকটা ওয়াকিবহাল হলেও অপরের মন সম্পর্কে একেবারে দিনকানা—সেখানে আবছা অনুমানের ওপর তার সব নির্ভর। অথচ সব মনই এক বিরাট মন:সমুদ্রে ঢেউএর মত—একের দোলা অপরকে অহরহ দুলিয়ে দিচ্ছেই। প্রাকৃত ভূমিতে এই দোলনকে আমরা বশে আনতে পারি না। কিন্তু অন্তর্মুখীনতা এবং তটস্থতার ফলে চৈত্যসত্তা যখন আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে, তখন গভীরসমুদ্রে শক্তির যে-আন্দোলন উপরের ঢেউকে দোলাচ্ছে তাকে আমার সত্তার অন্তস্তলে অনুভব করি। তখন এই মনই হয় একাধারে সকল মনের বিচিত্র আন্দোলনের ধারক এবং প্রেরক। এই মনে এবং এই মন থেকেই তখন সব মনের দোলন। মন দিয়ে মন জানা এবং মন পাওয়া তখন ইন্দ্রিয়সংবিতের মতই একটা সুস্পষ্ট অনুভবের বলক্রিয়ার (dynamism) ব্যাপার। অপরের মনের সঙ্গে যোগ তখন শুধু অন্ত:-সমুদ্রের গভীরেই নয়, স্নায়ুচেতনাবোধ পাকা হলে তার শক্তি উপরের ঢেউএর দোলা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। অধ্যাত্মজগতে শিষ্যের মধ্যে গুরুর ভাব ও শক্তি সংক্রামণের এই রহস্য।

চৈত্যবিভূতির স্ফুরণকে আমরা যদি প্রাকৃত মনের ক্ষুদ্র বাসনার চরিতার্থতায় লাগাই, তাহলে সে হবে তার হানিকর অপব্যবহার। শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে শিবের আরাধনায়, তবেই তার সার্থকতা। বিভূতির উন্মেষ জানিয়ে দেয়, চেতনার প্রাকৃতভূমি ছাড়া আরও-সব মহাভূমি আছে, অধ্যাত্মশক্তির একটা বিপুল উৎস আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। এই জ্ঞান আর শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে অহন্তার পরিতর্পণে নয়, আত্মার উন্মীলনে, প্রকৃতির রূপান্তরসাধনে। বিভূতিতে শক্তির খানিকটা বাইরে ছলকে পড়েই, কেননা এ হল শক্তির ঐশ্বর্যের প্রকাশ। কিন্তু এই ঐশ্বর্যকে বাঁধতে হবে বৈরাগ্যের প্রশাসনে, গোড়া হতেই সাধককে শক্তির রাশ টানতে হবে, তাকে অন্তর্মুখ এবং একাগ্র করতে হবে। 'সিদ্ধাই চাই না, চাই আমাকে অথবা চাই শুধু তোমাকে'—এই হবে সাধকের একমাত্র অভীপ্সা। শক্তির উচ্ছলন নিরুদ্ধ হয়ে তার প্রবেগ তখন অন্তরের পথ ধরে উজান বইবে বিশুদ্ধ আনন্দলোকের দিকে।

উত্তরধাত্রিণী শক্তির তখন আলম্বন হতে পারে দিব্য নাম এবং দিব্য রূপ অথবা দুই-ই। নাম হল মন্ত্র কিনা মননের চিদ্‌ঘন বীর্য। অর্থভাবনা বা পরিশুদ্ধ স্মৃতির সঙ্গে জপের ফলে তার শক্তি জাগে, শব্দ সচেতন ইষ্টবিগ্রহে রূপান্তরিত হয়। এই বিগ্রহ চিন্ময়, অরূপকল্প, শক্তির একটা বিদ্যুৎকূট—যা প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে চিদাকাশকে উদ্ভাসিত করে

তোলে। সে-উল্লাস জমাট বাঁধে অকল্পিতপূর্ব দিব্যরূপে, নাম হয় রূপের প্রবর্তক। রূপোল্লাসে চৈতন্যের সমৃদ্ধি, বিচিত্র চৈত্যবিভূতির উচ্ছলন এবং পরিণামে ইষ্টসম্প্রয়োগ-জনিত সাযুজ্য। তারপর চিৎকেন্দ্র হতে শক্তির বিচ্ছুরণ ও সর্বান্বভাব। শিবসদনে তখন শক্তির সার্থকতা, শান্তিসমৃদ্ধ আনন্দের হিল্লোল।

অতিমানসের আবেশে চৈত্যসত্তের রূপান্তর হল সিদ্ধির চরম। চৈত্যপুরুষ তখন হল বিজ্ঞানঘনপুরুষ। এই পুরুষের বিশিষ্ট লক্ষণ হল সর্বান্বভাব—চেতনায় হৃদয়ে মনে প্রাণে এমন-কি দেহেও সবার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। শুধু বিশ্বভূতের হৃদয়-মনের সঙ্গে নয়, বিশ্বপ্রকৃতিরও হৃদয়-মনের সঙ্গে সাযুজ্যবোধে বিজ্ঞানঘনপুরুষ যুগপৎ স্বরাট্ বিরাট্ এবং সম্রাট্। আত্মস্থিতিতে তাঁর স্বারাজ্য, বিশ্ববিভাবনায় বৈরাজ্য, আর সব হয়ে সব ছাপিয়ে যাওয়াতে সাম্রাজ্য। যে-জ্যোতি এই হৃদয়ে, সেই জ্যোতিই আদিত্যে এবং লোকোত্তর শূন্যতার অনালোকে। বিজ্ঞানঘনপুরুষের আত্মবোধ বিশ্বের সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধের রসে উল্লসিত, পলতোলা হীরার মত বেদিক থেকে আলো আসে সেইদিকেই সে ঝিকিয়ে ওঠে। গীতার ভাষায়, 'যে যেভাবে তাঁতে প্রপন্ন হয়, তিনি সেইভাবেই তাকে ভজনা করেন'। তিনি সবার সব-কিছু—শুধু এই লোকেই নয়, লোকে-লোকান্তরে, চেতনার সকল ভূমিতে।

অতিমানসের আবেশে চৈত্যসত্তের যে-রূপান্তর ঘটে, তাতে দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। প্রথমটি হল ঋতচ্ছন্দ। প্রাকৃতমনের মধ্যে বেসুর নিত্য লেগেই রয়েছে। সুর জাগে চৈত্যসত্তার জাগরণে; কিন্তু তারও প্রথমটায় অ-সুরের অত্যাচার একেবারে থামে না, বরং আগের তুলনায় সুরের অভাবটা যেন বেশী করে বাজে। কিন্তু চৈতন্যের গভীরতায় ব্যাপ্তিতে এবং তুঙ্গতায় চৈত্যসত্তা যখন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার ভিতর দিয়ে বিশ্বের হৃদয়-মনের মৌল ঋতচ্ছন্দই প্রকাশ পায়, অন্তর-বাইরের সমস্ত অনুভব ও প্রবর্তনার মধ্যে খেলে এক অপরূপ সুরসঙ্গতির সৌষম্য। রূপান্তরের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল অনুভবের সহজতা। অন্তরে আশ্চর্যের এবং বাইরে অঘটনের মেলা—কিন্তু কিছুকেই তখন খাপছাড়া অপ্রত্যাশিত বা লোভনীয় বলে মনে হয় না, আলোর ঐশ্বর্যের মতই অনুভবের ঐশ্বর্য বাইরে-ভিতরে ফুটে ওঠে সহজের ছন্দে এবং সুরে। অতিমানসের মধ্যে রয়েছে সবাইকে নিয়ে অদ্বৈতের যে-সৌষম্য, তা-ই তখন জীবনে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে।

রূপান্তর সম্পূর্ণ হয় যখন অতিমানসের বীর্য আধারের ধাতুতে (substance) নিবিষ্ট হয়। আমাদের প্রাকৃত সত্ত্ব (being) প্রধানত তিনটি ধাতুতে গড়া—জড় প্রাণ এবং মন। সাধনা আমরা শুরু করি মন দিয়ে। রূপান্তরের কাজ প্রথম শুরু হয় মনে, এবং মনোধাতুর রূপান্তরে মানসভূমিতে তা শেষ হয়। অনেক সাধক এতেই তুষ্ট থাকেন, প্রাণ আর দেহের রূপান্তর তাঁরা চান না। কিন্তু পূর্ণযোগের লক্ষ্য হল আধারের সমগ্র রূপান্তর। যে আলো আনন্দ আর শক্তি মনে পেয়েছি, তাকে নামিয়ে আনতে হবে প্রাণে এবং দেহেও। কয়লায় উপরে-উপরে আগুন ধরলেই চলবে না, আগুনকে ঢুকতে হবে একেবারে তার বস্তুসার ভিতরে। এই অনুবেধের জন্য তার শক্তির সংহনন চাই। শক্তি সংহত হয়ে আছে আমাদের চৈত্যসত্ত্বে। যেমন আমাদের আছে স্থূল বর্ত্মতনু, তেমনি আছে সূক্ষ্ম ভাবতনু—চৈত্যসত্ত্ব যার আশ্রয়। শুদ্ধসত্ত্ব তার ধাতু বা উপাদান। সে শুধু চিন্ময় নয়, চিদ্‌ঘন। এই চিদ্‌ঘন ধাতুর বীর্যকে অবতারিত করতে হবে প্রাণে এবং দেহেও। প্রাণ এবং দেহে অনুপ্রবিষ্ট যোগাগ্নি ধাতুর রূপান্তর ঘটিয়ে তাদেরও অগ্নিময় করে তুলবে। বিজ্ঞানঘনপুরুষ তখন সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। তাঁর বর্ত্মতনু শুধু ভাবতনুই নয়, চিৎশক্তির চরম সান্দ্রতায় দেবতনুও। এই তনুর এক আশ্চর্য তেজস্ক্রিয়তা (radioactivity) আছে, যা মৃত্যুধর্মের সঙ্কোচকে অতিক্রম করে যায়। বুদ্ধের মতই বিজ্ঞানঘনপুরুষ বলতে পারেন, 'যো মাং পশ্যতি স ধর্মং পশ্যতি,—যে আমাকে দেখে সে ধর্মকেই দেখে। 'শুদ্ধং বৃহৎ' আকাশের অতনু যোগবায়ুর গড়া হয় তাঁর নিত্যসিদ্ধ সত্যতনু। রূপান্তরের এই হল নিরবধিক অবধি।

অতিমানস চেতনা যখন চৈত্যসত্ত্বাকে অধিকার করে তাতে আবিষ্ট হয়, তখন সে তার ধর্মের বা ক্রিয়ার কোনও ব্যত্যয় ঘটায় না, বরং অপরা প্রকৃতির সংস্পর্শে তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয় যে মালিন্য বিভ্রম বা ন্যূনতা তা দূর করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে স্বভাবের ঔজ্জ্বল্যে, তার নিজের বৃহৎ জ্যোতি আনন্দ ও শক্তির স্ফুরন্তাকে ঝলকে-ঝলকে তাদের মধ্যে ঢেলে দেয়। নাম এবং রূপকে আশ্রয় করে চিন্নাকাশে চৈত্যবিভূতির যত উল্লাস, প্রাতিভসংবিতের যত ঐশ্বর্য, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের তাৎপর্য যত সঙ্কোচ নিঃসংশয়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চেতনার সমস্ত ভূমির সমস্ত অনুভব অতিমানস জ্যোতির আবেশে এবং ধারণায় উত্তীর্ণ হয় 'শুদ্ধং সত্যং বৃহৎ'-এর অবিপ্লুত মহিমায়।

বিজ্ঞানঘনপুরুষের ব্যক্তিত্ব সমুদ্রে নুনের পুতুলের মত গলে যায় না, কিন্তু নুন জমে পাথর হয়ে যায়। আনন্ত্যের চিদ্‌ঘনতাই তাঁর ব্যক্তিত্ব। এক যখন বহুতে পরিকীর্ণ হয়, তখনই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি। অজ্ঞানদশায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু স্বরূপের জ্ঞানে বিরোধ রূপান্তরিত হয় বৈচিত্র্যে। আর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় বৈচিত্র্য হয় সাযুজ্যের বিলাস। সব আমিই তখন এক পরম আমির উচ্চাবচ বিভূতি। বহু ছড়িয়ে আছে অসীম দেশে, অনন্ত কাল ধরে চলছে তাদের ধর্মের পরিণাম। বাইরে থেকে দেখলে তাদের মনে হবে খণ্ডিত। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে তারা এক অখণ্ড শক্তি

ও চৈতন্যেরই উল্লাস। সেই শক্তি ও চৈতন্যের অপরোক্ষ অনুভব হয় 'আমি'তেই। অনুভব শুদ্ধ হলে আর 'আমি' নয়—'আত্মা'। আত্মা সামুজ্যবোধে সবার সঙ্গে যুক্ত, সবার মধ্যে নিবিষ্ট। তখন 'ঐতাদাত্ম্যম্ ইদং সর্বম্'। 'ইদং' দেহ, আত্মা 'দেহী'। বহু যেন গুণ ও ক্রিয়ার বৈচিত্র্যে একই দেহের কোষস্থানীয়। বহু কোষ, কিন্তু একই শক্তিতে সঞ্জীবিত, একই চৈতন্যে উদ্ভাসিত—সবার স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম এক পারার্ধ্যে। এই অখণ্ড অনন্তের বোধ সংহত হয়েছে বিজ্ঞানঘনপুরুষের ব্যক্তিত্বে। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে এ-ব্যক্তিত্ব বিবিক্ত, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে সর্বাত্মভূত। বিবিক্তদের মধ্যে কাজ করতে হলে বিবিক্তত্বকে অঙ্গীকার করে নিতে হয়। তাই বিজ্ঞানঘনপুরুষেরও দেহ প্রাণ মন সবই আছে। কিন্তু প্রাকৃত দেহ প্রাণ মনের মত তারা অভেদের বাধক নয়—সাধক। তাদের সংবিৎ এবং বৃত্তি অকুণ্ঠ, কেননা তারা অতিমানসের স্বরূপশক্তির দ্বারা আবিষ্ট আবৃত এবং প্রচোদিত।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৫১

মা তাঁর "মাতৃবাণী" (Words of the Mother) পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের গোড়ার দিকটা পড়ে শোনালেন—স্বপ্নদর্শন ও অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে।

প্রশ্ন : প্রায়ই আমি রেলগাড়ির স্বপ্ন দেখি, আর প্রায়ই ট্রেন ফেল করি...

ওটা তো প্রতীকের ব্যাপার!

প্রশ্ন : আমার সঙ্গে বিস্তর মালপত্র থাকে। কখনো কখনো আমি প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে গিয়ে কোনোগতিকে ট্রেন ধরে শেষের কামরাতে লাফ দিয়ে উঠে পড়ি।

উত্তর : যোগের পথ যারা নিয়েছে তাদের পক্ষে ট্রেন, জাহাজ, ও সম্ভবত এরোপ্লেনও হবে তাদের গন্তব্য পথের ও নিয়ন্ত্রণশক্তির প্রতীক। তুমি যদি বিলম্বে পৌঁছাও বা সঙ্গে অনেক লটবহর থাকে, তার মানে তোমার পথে তুমি পিছিয়ে পড়ছ, তোমাকে আরো ত্বরান্বিত হয়ে গতির সঙ্গে তাল রাখতে হবে। এমনি অনেক স্বপ্নই আসে যা তোমার ভিতরকার বর্তমান অবস্থার সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে।

প্রশ্ন : আর এ কেমন ক'রে হয় যে বাস্তব জীবনে ভবিষ্যতে যাকে কখনো দেখব বা চিনব, সেই লোকটিকেই অনেক আগের থেকে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পাই ও চিনতে পারি?

উত্তর : সম্ভাব্য অনেক কারণেই তা হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে মন প্রাণ বা সূক্ষ্মদেহের স্তরে আগের থেকেই একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়ে গিয়ে পরে বাস্তব জগতে তার সাক্ষাৎ মেলে—স্বপ্ন সেখানে কেবল পূর্বচেতনা নয় কিন্তু পূর্বাবস্থারও কাজ করে। আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকাতে আগের থেকে এমনি স্বপ্নসাক্ষাৎ ঘটে,

ও পরে ঘটনাচক্রে স্থূল সাক্ষাৎ ঘটে যায়। কখনো কখনো ওটা পূর্বচেতনা মাত্রই হয়, কিন্তু স্বপ্নের কিছু বিশিষ্ট ক্রিয়া আছে—স্বপ্নের জিনিসকে তা বাস্তবে এনে দেয়।

তবে সাধারণত এর থেকে পূর্বসম্পর্ক সূচিত হয়। স্বপ্নে কাউকে হয়তো প্রায়ই দেখতে পেতে থাকলে, তার সঙ্গে আলাপ করলে, রাত্রের কয়েক ঘন্টা তার সঙ্গে কাটালে। অনেক পরে যখন প্রথম স্থূলদৃষ্টিতে তার দেখা পেলে তখন মনে হলো পরস্পরের মধ্যে কতই ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। আর প্রকৃতই তাই, বাস্তবে তাকে দেখার অনেক আগেই পরিচয় পাকা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন নিখাঁ দর্শনও কি হতে পারেনা ?

উত্তর যা তুমি দেখনি এমন কিছু যদি গল্প ক'রে বলো তাহলে সে তো নিখাঁ দর্শনই হলো ! আর যদি বলবার সময় তাকে অলঙ্কারের বাহুল্য দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে উল্টে-পাল্টে বলো, সেও হবে নিখাঁ দর্শন। কিন্তু ঠিক যেটুকু দেখেছ তাই যদি সোজাসুজি বলো, তার মধ্যে নিখাঁর কি থাকবে ? তার সম্বন্ধে তোমার ব্যাখ্যাটা হয়তো নিখাঁ হতে পারে। তুমি বলতে পারো, "এই স্বপ্ন দেখার মানে হচ্ছে এই" সেখানে প্রায়ই তুমি ভুল করো। কিন্তু এটা তো ঠিক কথা, যা দেখেছ, যা দেখনি তা দেখনি। এ প্রশ্নে আমি অবাক হয়ে যাই !...তুমি কি এটা দেখেছ ? যদি বলো হাঁ, তবে নিশ্চয়ই দেখেছ। ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু দেখে যদি থাকো, তাহলে তো সত্যসত্য সেটা দেখেইছ।

যারা ওরূপ প্রশ্ন করে তারা দেখা জিনিসকে প্রায়ই অতিরঞ্জিত ক'রে থাকে। হয়তো অল্প একটু আলোর ঝিলিক্ দেখলে, আর অমনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাতে এখানে কিছু ওখানে কিছু জুড়ে দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে এক সঙ্গতিপূর্ণ ঘটনাতে দাঁড় করিয়ে তার অর্থ ক'রে নিয়ে বললে, "আমি অমুক রকনের দর্শন পেয়েছি", কিন্তু যা বললে তা আসলে ঠিক কথা নয়....এ হলো মনের খলতা। এরূপ আপনা হতেই হয়ে থাকে—মন যখন ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে, এখানে একটু ওখানে একটু দেখে, তাতে সে খুশি হতে পারে না। তাই সেগুলোকে জুড়ে বাকী ফাঁকগুলোকে নিজেই ভরাট ক'রে নিয়ে বলে, "ওর থেকে এই অর্থটা এসে পড়ছে" "এই হলো ওর ভিতরকার মতলব", আর এবার যুক্তির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে ভেবে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু মন যেটুকু জুড়ে দিয়ে ফাঁক ভরাট করলে, তা ঠিকও হতে পারে আবার বেঠিকও হতে পারে।

অতএব নিজেকে সেখানে প্রশ্ন ক'রে দেখবে যে তোমার মন নির্ভেজাল দৃষ্টি নিয়ে ঠিক যা দেখেছে তাই বলছে কিনা, অথবা এমন হলো কিনা যে একটা কিছু দেখে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে আপনা হতেই তাতে কিছু লবন মিশিয়ে তাকে বিরাট এক গল্পে পরিণত করলে,

আর তোমার মধ্যেও এই দৃঢ়বিশ্বাস এসে গেল যে তুমি অবিকল তাই-ই দেখেছ, অথচ বাস্তবিক তা দেখনি। এই সব ব্যাপার থেকেই বলতে হয় যে অলৌকিক দর্শন খাঁটি জিনিস হয় না। কিন্তু তাতে দর্শনের কোনো দোষ নেই; তুমি যা দেখেছ তা ঠিকই দেখেছ, কেবল সেটা বলতে কিংবা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জিনিসটা অতিরঞ্জিত হয়ে গেছে। এমন দৃষ্টান্ত আমি অনেক জানি যেখানে বাস্তবিকই তারা অলৌকিক বা অর্থজ্ঞাপক কিছু দেখেছিল, কিন্তু তার মর্ম কিছুই বোঝেনি। সেই মুহূর্তেই তারা আপনা হতে যে কথা প্রথম বলেছে—আধ ঘন্টা পরেই সে গল্প একটু পাল্টে গেছে, ওরই মধ্যে ফাঁকগুলি তরাট করা হয়ে গেছে, আর তা গল্পের মতো হাত-পা-ওয়ালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে গল্পের প্রকৃত অর্থ হয় না, অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ আসল যেটুকু জিনিস সেটা দিয়েছিল তার মধ্যে চমৎকার দিব্যদর্শনের কিছু ছিল।

(নীরব থেকে)

এই দর্শনশক্তি যদি স্বতঃস্ফূর্ত হয় ও খাঁটি থাকে, তাহলে ওর দ্বারা এমন সব গূঢ় ব্যাপার জানা যেতে পারে যা যাহা চেতনার দ্বারা জানা যায় না। বস্তুত এটা অবাক হবার মতো কথা যে এই জগতের মনোলোক ও প্রাণলোক ও সূক্ষ্মদেহলোকের কোনোখানে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সব কিছু ঘটনাই অবিকল যথাযথভাবে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করা হয়ে আছে। সে এক অত্যাশ্চর্য ও কল্পনাতীত স্মৃতিকোষ যেখানে কোনো কিছুই পড়ে না, কোনো কিছুই মুছে যায় না, সমস্তই লেখা থেকে যায়। তার ভাণ্ডারগৃহে যদি প্রবেশ করতে পারো তাহলে অগ্রপশ্চাৎ সব দিকেই চলে যেতে পারো অতীতের জিনিসই হোক বা ভবিষ্যতের ঘটনাই হোক সবই আপন স্মৃতির মধ্যে নিয়ে নিতে পারো, কারণ অতীতের ও ভবিষ্যতের সবই আছে লেখা।

যেমন বলি, সেখানকার মনোলোকের মধ্যে এক ভৌতিক-মানসের আগারে পৃথিবীর যাবতীয় ভৌতিক ঘটনাগুলি সংরক্ষিত হচ্ছে—সেখানে ঢুকলে মনে হবে যে অসংখ্য খুপরিযুক্ত এক খিলানসৌধের মধ্যে ঢুকলে, খুপরিগুলি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত থাক দিয়ে বরাবর সাজানো, প্রত্যেকটিতে ছোটো ছোটো দুয়ার আঁটা। চেতনা দিয়ে যদি ওর কিছু জানতে ইচ্ছা করো, তখনই তার নির্দিষ্ট খুপরিটির সামনে একটা আলোকবিন্দু জ্বলে উঠবে, আর তোমার একাগ্রতা লাগলেই তার দরজাটি খুলে যাবে। দেখতে পাবে যে তার মধ্যে রয়েছে এক সূক্ষ্ম ধরণের পুথি যার পাতা খুলে গেল; আরো বেশি একাগ্র হলে তুমি তার ভিতরকার লেখাগুলি বইপড়ার মতো পড়ে যেতে পারবে ও সব কথাই জানতে পারবে। এমনি আছে কত হাজার হাজার খুপরি। সে জায়গাতে ঘুরলে মনে হবে যে তার কোনো সীমা নেই, আর যে কোনো বিষয়ে জানতে চাও সবই সেখানে জানা যায়। কিন্তু এও বলে রাখি, সেখানে যা জানবে তা কোনো ইতিহাসে লেখা হয়নি। ইতিহাস তোমাদের

একটা গড়া জিনিস। এমন কোনো খাঁটি "ইতিহাস" আমি জানি না যা ওর সঙ্গে সঠিক মেলে। ইতিহাস অধ্যয়নে আমি নিরুৎসাহ করতে চাইছি না, কিন্তু এ কথা ঠিকই বলছি। যা লেখা হয় তার থেকে যা ঘটে তা স্বতন্ত্র, যেহেতু মানুষের মস্তিষ্ক পুরোপুরি সত্যটা লিখতে পারে না। ঘোলাটে স্মৃতির ভিত্তি নিয়ে লেখা হয় ইতিহাস। যে লেখে সে দেখা বা শোনা জিনিসকে নিজের মন দিয়ে বেছে নেয়, কাজেই তা আংশিক মাত্রই হয়। যেমন স্বপ্নের বেলাতে, এখানে কিছু ওখানে কিছু তথ্য পেয়ে বাকীটুকু কল্পনা দিয়ে জোড়া হয়, যাতে গল্পটা খাপছাড়া না হয়ে যায়। কাজেই লেখকের মন প্রাণ বা ইচ্ছার অনুগামী তা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাতে একই কাহিনী কত হাস্যকর ভাবে যে বলা হয়েছে তা তোমরা ধারণাই করতে পারোনা। বিশেষত তার মধ্যে যদি এমন কোনো একটি দেশের কথা থাকে যার সুনাম ও স্বার্থ তার সঙ্গে জড়িত, তাহলে সেই দেশের লেখা ও অন্য দেশের লেখা দুটি ঐতিহাসিক চিত্র এতই বিভিন্ন প্রকার হয় যে তা আর বিশ্বাসযোগ্য থাকেনা, মনে হয় দুটি স্বতন্ত্র ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, যেখানে ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ স্থূল ও যেখানে মূল্য যাচাইএর কোনো প্রশ্ন নেই সেখানেও এই ব্যাপার। মানুষের মস্তিষ্ক কোনো কিছুকে সমগ্রভাবে নিতে পারেনা। এমন কি যথেষ্ট বিদ্বান ও খাঁটি মানুষও তা পারেনা—বিষয়বস্তু অনেকগুলি হলে। সে নিজে যা বুঝবে তাই শুধু বলবে, যা জানে না ও বোঝে না তা বাদ দিয়ে যাবে। তাতেই সব কিছুর চেহারা পাল্টে যায়।

কিন্তু আমি যে স্মৃতিসৌধের কথা বললাম সেখানে যদি ঢুকতে পারো তাহলে পুরো খবর নিশ্চয় মিলবে। এটি যোগ নয়, তার থেকে আলাদা ব্যাপার; এর জন্য আধ্যাত্মিক জীবনে যেতে হয় না, কেবল ঐ সামর্থ্যটি লাভ করা চাই।

সব কিছু কাজের জন্যই চাই ঐকান্তিকতা—এ কথা আমি চিরদিনই বলব, যতদিন বলবার সময় পাবো। ঐকান্তিকতা না হলে কেবল নিজেকেই ঠকাতে থাকবে, তোমার কোনো অনুভূতির কোনো দাম থাকবে না। কিন্তু যদি ঐকান্তিক হও ও নিয়মসংযত হও (যা সহজ কথা নয়) তাহলে তুমি ঐ জাগতিক মনোলোকের স্মৃতিভবনে প্রবেশ করতে পারবে আর সেখানে এত কিছুই আবিষ্কার করবে যাতে তোমার শ্রম সার্থক হবে।

ফেব্রুয়ারি ১৭, ১৯৫১

মা তাঁর বই (**Words of the Mother**) থেকে পড়লেন—

"কত ঘন্টা ধ্যান করছ সেই হিসাব থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি কতটা ঘটেছে তা বলা যায় না। যখন দেখবে যে ধ্যানের জন্যে কোনো কষ্টপ্রয়াস করতে হচ্ছে না, তখনই জানবে তোমার কিছু উন্নতি হয়েছে।"

অর্থাৎ জোর ক'রে নিজেকে টেনে বসিয়ে ভিতরকার যন্ত্রটাকে নীরব ক'রে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকার বদলে, যদি সহজে বিনা কষ্টে আপনা হতেই চিন্তার একাগ্রতা এসে ধ্যানে লেগে যেতে পারো, এবং যার জন্য ধ্যান করছ শুধু সেই উদ্দেশ্যটি চেতনার মধ্যে জেগে থাকে আর বাকী সমস্ত কিছুই মন থেকে বেমালুম মুছে গিয়ে তোমার সমগ্র সত্তা সুস্থির ও নীরব হয়ে থাকে, তোমার স্নায়ুগুলিও শান্ত হয়ে কেবল চেতনাটি একাগ্র হয়ে ওঠে—আর তুমি তীব্র আনন্দে মগ্ন হয়ে আরো গভীরের মধ্যে চলে যাও।

এমন যদি হয় তখন জানবে যে তুমি ঠিক ধ্যানের অবস্থায় পৌঁছেচ, নতুবা তা হয়নি।

"এমন সময়ও একটা আসে যখন ধ্যান ভাঙতে হয় চেষ্টা ক'রে, ধ্যানের অবস্থাকে বন্ধ করাই তখন কঠিন হয়, ভগবানের চিন্তাকে খানিয়ে সাধারণ চেতনাতে নামা কষ্টকর হয়ে পড়ে।"

এটা যদি প্রত্যেকের বেলাতেই হতে পারতো!

মনে করো তুমি ব্যস্তভাবে কিছু কাজ করছ, হয়তো ছুটোছুটি ক'রে বল ছুঁড়ে খেলা করছ, তখনও ভিতরে কিন্তু রয়ে গেছে একটা ধ্যানের ভাব ও ভগবানের দিকে নিগূঢ় একাগ্রতা। এমন একটা অবস্থাতে পৌঁছলে তখন দেখবে যে তোমার কাজগুলির চেহারাও পাল্টে গিয়ে তা আরো ভালো ভাবেই হচ্ছে, সকল কাজের মধ্যেই যেন একটা অপ্রত্যাশিত রকমের তেজ এসে গেছে, অথচ তোমার চেতনা রয়েছে এমন উঁচুতে উঠে যে সেখানে তাকে কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারছে না। এ অবস্থা এমন হয়েও দাঁড়াতে পারে যে হঠাৎ যদি তখন কোনো দুর্ঘটনাতেও পড়ে যাও, তাও তোমার আদৌ গায়ে লাগবে না। অবশ্য তা হলো চূড়ান্ত অবস্থা, কিন্তু এরও জন্যে আকাঙ্ক্ষা করা যায়।

এমন একটা ভুল ধারণা যেন কখনো করোনা যে ধ্যান করবার জন্যে তোমাকে নীরব নিস্তব্ধ অতিনিভৃত কোণের মধ্যে গিয়ে বসতে হবে, সেখানে কেউ মোটে চকতেই পাবেনা, আর তোমাকে সর্বদা থাকতে হবে সোজা টান হয়ে বসে, তবেই তোমার ধ্যান হতে পারবে—এ কথা ঠিক নয়। বরং সকল অবস্থার মধ্যে থেকেই তোমার ধ্যান করতে পারা চাই, তার মানে মাথাটাকে খালি ক'রে ফেলে নয়, কিন্তু চিন্তার একাগ্রতা ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে এনে; তেমনি চিন্তাকে যদি মনের মধ্যে নিত্য বজায় রাখতে পারো, তাহলে তুমি যা কিছুই করো তার প্রকৃতি যাবে বদ্‌লে—বাইরের চেহারাতে সে কাজ যেমন ছিল তেমনি থাকবে কিন্তু তার দান হয়ে যাবে অন্যরকম। সেই সঙ্গে তোমার জীবনের প্রকৃতিও বদ্‌লে যাবে, আগে যেমন ছিলে তার চেয়ে নিজেই অন্যরকম বোধ করতে থাকবে, নিজের মধ্যে আসবে একটা শান্তি ও সুনিশ্চয়তা, আভ্যন্তরীণ অচঞ্চলতা, একটা অটল শক্তিচেতনা যা কোনো কিছুতেই বিচলিত হবেনা।

এ অবস্থা এলে তখন তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারাই কঠিন হবে—বিরোধী শক্তিরা সে চেষ্টা অবশ্য করবেই, কারণ তারা নিতাই লেগে আছে বিপর্যয় ঘটাবার তালে...কিন্তু তোমার বেলাতে তারা সেটা খুবই কম পারবে, আর এদিকে তাতেও তোমার উন্নতির মাত্রা আরো বেড়েই যাবে।

জীবনে যখনই কোনোরকম মার খাবে, তখনই নিজেকে এই কথা বলবে, "ও, দেখছি আমার তাহলে আরো বেশি উন্নতি হওয়া দরকার," এতে তোমার মার খাওয়াতে বরং উপকারই হবে। তখন মাথা গুঁজে বসে না পড়ে ফূর্তির সঙ্গে মাথা খাড়া করে বলবে "কোন জিনিসটা শিখতে এখনই আমার বাকী আছে? তাই তো আমি জানতে চাই।" এই হবে উচিত কাজ।

প্রশ্ন : আমরা এখানে (খেলার মাঠে) যে একাগ্রতার অভ্যাস করি, আর এর আগে (আশ্রমের মধ্যে) যে ধ্যান অভ্যাস করতাম, এ দুটি কি একই রকমের জিনিস?

উত্তর না, সেদিন তোমাদের বলেই দিয়েছি যে এখনকার যে একাগ্রতার কাজ তা ধ্যানের অনেকটা উল্টো রকমের জিনিস। তখনকার সমবেত ধ্যানের মধ্যে আমি চেষ্টা করতাম উপস্থিত সকলের চেতনাকে একজোট ক'রে আশ্পৃহার দ্বারা উপরের দিকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে—অর্থাৎ সেটা ছিল আশ্পৃহার উত্তোলনের ক্রিয়া। আর এখানে যা করা হচ্ছে তা হলো কিছু নামিয়ে আনার ক্রিয়া। আশ্পৃহার উত্তোলনের ক্রিয়া। আর এখানে যা করা হচ্ছে তা হলো কিছু নামিয়ে আনার ক্রিয়া। আশ্পৃহাকে উপরের দিকে তুলে ধরার পরিবর্তে তোমাদের বলা হচ্ছে গ্রহিষ্ণুতাকে বাড়িয়ে নিজেদের খুলে ধরতে, যাতে উচ্চশক্তি নেমে এসে তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এর জন্যে অনেক উপায় আছে; কার প্রকৃতির পক্ষে কোনটা সব চেয়ে ভালো তা তোমরা নিজেই ঠিক ক'রে নেবে। দরকার শুধু গ্রহিষ্ণু থেকে নিজেদের নিবেদন করতে থাকা, দেহে প্রাণে বা মনে কোনো একটা অংশে মাত্র দিয়ে নয়, কিন্তু সমগ্র সত্তায়। আর কিছু করতে বলা হচ্ছেনা, কেবল নিজেকে তোমরা যথাসাধ্য খুলে ধরো বাকী যা করবার তা আমি করব।

ধ্যানের সময় আমি চাইতাম যে তোমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে আশ্পৃহার শিখা জ্বালিয়ে যতটা পারো উপরে উঠে যাও। অবশ্য দুই রকমই দরকার; সকালের ধ্যানের সময় মন ঠিক থাকলে নিজের উন্নতির সুযোগ বুঝে যে কেউ তাতে যোগ দিতে পারে,—কিন্তু এই খেলার মাঠের ক্রিয়াটির বেলাতে নিয়ম এই যে জীবনকে ও দেহকে ও নিজেকে তুচ্ছ ক'রে উপরের দিকে উঠে যেতে চাওয়ার বদলে যারা এই দেহেরই অপূর্ণতাগুলোকে দূর করতে চায় তারা সকলেই এতে যোগ দেবে। এর জন্য গোড়ার দিকে খুবই বাছাই করা হতো—কিন্তু ক্রমে ক্রমে এর ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে এবং তার ফল ভালোই হয়েছে বলে মনে

করি। আমরা তাদেরকেই চাইছিলাম যারা বুঝেছে যে স্থূলদেহকে আগে অটুট ক'রে রাখা দরকার, যারা বুঝেছে যে অটুট দেহের একটা নিজস্ব মূল্য আছে যার জন্যে তাকে সদা সক্ষম করে রাখা চাই, তাকে উচ্চতর সত্তার আধার হবার যোগ্য ক'রে নিতে হবে, ছেঁড়া কাঁথার মতো "আমি এটা চাই না, চাই না" বলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার মতো জিনিস এটি নয়। বরং একে ক'রে তুলতে হবে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট যন্ত্রের মতো, যতখানি পর্যন্ত একে সমুন্নত ও পূর্ণতর করে তোলা সম্ভব তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন কিন্তু আপনি যাকে বলেন আশ্পৃহা ও ধ্যানধারণা নিয়ে লেগে থাকা, তা কি বাহ্যজগতের কাজকর্মের বিরোধী জিনিস হয়না?

উত্তর না, বিরোধিতা ঘটলে বুঝতে হবে যে তোমার একাগ্রতা জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না। অবশ্য বাহ্যজগৎ এমন মিথ্যায় ঘেরা হয়ে আছে যে আমাদের বাহ্যসত্তার সঙ্গে সংস্পর্শ ছেড়ে বেরিয়ে না এলে নিজের মধ্যে ভগবৎ-উপস্থিতি অনুভবের দিকে একাগ্র হওয়া যায়না। কাজটা যে খুব সোজা তা আমি বলছিনা, বেশ কঠিন রকমের আদর্শকেই তোমাদের সামনে ধরছি, কিন্তু তবু সম্ভব তা করা এবং তাই করাও হচ্ছে এই পর্যন্তই বলতে পারি, পায়ের দিকে ছুটতে গিয়ে যাতে ঘাড়ের দিকটা বইকে না যায় সে ক্ষমতা তোমার থাকা চাই!

*

ফেব্রুয়ারি ১৯, ১৯৫১

প্রশ্ন "পৃথিবীর স্মৃতিদপ্তরে" সচেতনে ঢুকতে হলে তা আগে শেখা দরকার। তার জন্যে কী শিখতে হয়?

উত্তর: তা যোগ শেখার চেয়েও অনেক কঠিন, তা হলো গুহ্যবিদ্যার শিক্ষা।

প্রথমে তোমায় শিখতে হবে দেহ ছেড়ে কেমন ক'রে সচেতনে এক সূক্ষ্মদেহে চলে যেতে পারো, তখন সেই দেহে ইচ্ছার জোরে যেখানে খুশি চলে যেতে পারো, হঠাৎ অভাবনীয় বা ভয়ংকর রকমের কিছুর সম্মুখীন হলে তাতে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে ঠিক থাকতে পারো, মনের দৃষ্টিশক্তিকে বাড়িয়ে নিতে পারো, মনকে শান্ত ও নীরব ক'রে রাখতে পারো...আরো অনেক কিছু আছে যার লম্বা ফর্দ শোনাতে গেলে অনেক ঘন্টা লেগে যাবে।

তোমাদের মধ্যে কেউ কি দেহ ছেড়ে সজ্ঞানে বেরিয়ে যাবার অনুভূতি কখনো পেয়েছ? ইচ্ছামত বেরোতে পারার মতো ক্ষমতার কথা বলছিনা, তার আমার অন্য উপায় আছে।

একজন প্রশ্নকারী একবার আমি দেহ ছেড়ে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু তখনই আবার দেহের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

মা বাইরে বেরিয়ে একটু কি ঘুরে বেড়িয়েছিলে—না, তা করোনি? তাহলে কৌতহল ছিল না বলো।

প্রশ্ন দেহ ছেড়ে যে বেরিয়ে গেছি তা কেমন ক'রে বুঝবো?

উত্তর : দেহকে তখন দেখবে বিছানাতে অসাড়ে পড়ে আছে। এ ছাড়া জানবার আরো উপায় আছে।

প্রশ্ন : ক্লোরোফর্ম হবার সময় আমি দেহ থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন দেখি যে আমার দেহকে টেবিলে শুইয়ে তাতে অপারেশন করা হচ্ছে।

উত্তর : এ ঠিক কথা, আমিও জানি এমনি একজন অলোকদ্রষ্টার (clairvoyant) কথা। অপারেশনের জন্যে তাকে ক্লোরোফর্ম করা হলে তখনই সে দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায়, আর সেখানে যারা উপস্থিত রয়েছে তাদের কার মাথার মধ্যে কি ব্যাপার হচ্ছে সবই সে দেখতে থাকে। তার অভ্যাস ছিল ঘুমের মধ্যে সে কথা বলত, তাই এখনও সে যা যা দেখছে তা বলে যেতে থাকে...অমুক ব্যক্তি কোন নিজের ভাবনাটি ভাবছে, অমুক ব্যক্তি কি একটা অন্যরকম সমস্যার কথা ভাবছে, ইত্যাদি। ডাক্তারেরা তাই শুনে এত চমৎকৃত হলো যে তাকে আবার জাগানোর কথাটা তারা ভুলেই গেল। হঠাৎ যখন দেখা গেল যে তার শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে তখন চেতনা হলো, সে এক ঘন্টার চেয়েও বেশি এমনি ঘুমের মধ্যে ছিল।

এ একটা বিশেষ দৃষ্টান্তের কথা বললাম—খুব কম লোকেরই এমন ক্ষমতা থাকে, কিন্তু ক্লোরোফর্মের মধ্যে চেতনা থাকে অনেকেরই সাধারণত ক্লোরোফর্মের ক্রিয়া ছেড়ে যাবার পরে যখন জেগে ওঠে তখন সকলেই খুব অস্থির বোধ করতে থাকে, আর দেহের বাইরে গিয়ে যা যা অনুভব করেছিল তা অস্পষ্টভাবে স্মরণে আসে।

তোমাদের মধ্যে কেউ কি হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনার কারণে অজ্ঞান হয়েছিলে? তখন কি মনে হয়েছিল দেহটা এমন হয়ে পড়ে আছে কেন? যেমনি তাই মনে হওয়া অমনি তাড়াতাড়ি তার মধ্যে আবার ঢুকে পড়লে? প্যারিসে থাকতে আমার একবার এইরকম হয়েছিল। গুরুতর রকমের একটা ডিনারের নিমন্ত্রণ খেয়ে আমি এক সম্মেলনে গিয়ে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে বিস্তর মানুষ জড়ো হয়েছে, ঘরটা বেজায় গরম হয়ে উঠেছে। ভরা পেট খাবার পরে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার শরীরটা কেমন বোধ করতে লাগল। আমার সঙ্গের লোকটিকে বললাম, "আমি এখনই বাইরে যাবো।" বাইরে

(Place of Trocadero) বেরিয়ে তখনই আমি মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। ঐ সময় দেখতে পেলাম যে দেহটা সটান লম্বা হয়ে পড়ে আছে, দেখেই অদ্ভুত মনে হওয়াতে আমি তখনই তার মধ্যে ঢুকে তাকে ধমক দিয়ে বললাম, "না না, আমার সঙ্গে ওরকম চালাকি করা চলবে না"!

অনেকেই এমনি মূর্ছিত হয়ে গেলে নিজেকে দেখতে পায়। তার জন্যে অবশ্য একটা শর্ত রয়েছে—সূক্ষ্মদেহের বা প্রাণময় জড়দেহের ভিতরকার এমনিভাবে দেখার যন্ত্রটি তৈরি থাকা চাই।

সে ক্ষমতা আপনা হতেই বিনা চেষ্টায় জন্মাতে পারে, কেউ কেউ আবার অলোক-দৃষ্টির ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। তাদের যে খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকে তা নয়, প্রাণচেতনা হয়তো সাধারণ রকমই তথাপি এই অলোকদৃষ্টিশক্তি আপনা হতেই আসে। এ যে কোনো উন্নতির লক্ষণ তাও নয়—এর উৎপত্তি হয় অন্যরূপ কারণ থেকে, হয়তো পিতামাতার প্রভাব থেকে, বা পূর্বজন্মের কোনো কিছু কারণ থেকে ইত্যাদি। কিন্তু তোমার বেলাতে যদি এরূপ জন্মার্জিত সুযোগ না থাকে, আর তোমার চৈতাও যদি পূর্ণচেতনার ফলে মুক্ত অবস্থায় না থাকে, সে ক্ষেত্রে যদি ঐরূপ দৃষ্টিশক্তি তুমি অর্জন করতে চাও তাহলে তোমাকে বহুকাল ধরে নির্ধারিত শিক্ষার নিয়মগুলি পালন করে যেতে হবে, কিন্তু এমন লোক খুব কমই আছে যারা অতকাল পর্যন্ত ধৈর্য ঠিক রাখতে পারে।

কাজটা খুবই অসাধারণ রকমের বটে, কিন্তু এ-ক্ষমতা না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। যেমন স্বপ্নের বেলাতে চলে যায়। অবশ্য এ-ক্ষমতা লাভ করলে জীবন কিন্তু পূর্ণতর হয়ে ওঠে, আর চেতনার উন্নতিও তাড়াতাড়ি হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি বলেন দুই রকমের মানুষ আছে, তাদের মধ্যে কাউকে ধ্যান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, আর কাউকে বা নিষেধ করা হয়। কেমন ক'রে জানা যাবে কে কোন রকমের।

উত্তর : সেটা তোমাদের বলে দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : তাহ'লে আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে?

উত্তর : নিশ্চয়, সেইজন্যেই তো আমি আছি।

প্রশ্ন : কেউ যখন দেহ ছেড়ে বেরোয়, তখন দেহও তার ঐ অংশের অনুসরণ করবে?

উত্তর : তুমি স্বপ্নচারীর (Somnumbulist) কথা বলছ? সে হলো আলাদা

জিনিস। সে ক্ষেত্রে মনের বা প্রাণের যে অংশটা বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে দেহ এমনই জড়িত থাকে যে সেই অংশ যা করতে চায় দেহও সেই কাজ আপনা হতে করতে লেগে যায়। তোমার আভ্যন্তর সত্তা কিছু একটা করতে চাইছে, তার সঙ্গে দেহ এমনই সংলগ্ন হয়েছে যে আপনা হতেই সে তাই করতে শুরু করে, তার জন্য তাকে কিছু ভাবতে বা চেষ্টা করতে বা ইচ্ছা করতেও হয় না। এমন স্থলে দেহের ক্ষমতা এত বেশি বেড়ে যায় যা তার জাগ্রত-কালে থাকে না। যেমন, সে তখন এমন ভয়ংকর বিপদের স্থান দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যেতে পারে যেখানে জাগ্রত অবস্থায় কখনই যেতে ভরসা করত না। দেহের নিজস্ব চেতনা তখন নিদ্রিত, সে কেবল আভ্যন্তর চেতনাকে অনুসরণ করছে—যদিও দেহের নিজের একটা স্বতন্ত্র চেতনা আছে। আমাদের সত্তার প্রত্যেক অংশেই আছে তার আপন আপন চেতনা —এমন কি নিতান্ত স্থূল অংশেও। তাই যখন তুমি ক্লান্ত হয়ে ঘুমোও, বিশ্রামের দরকার হয়েছে বলে দেহ এবং তার চেতনা ঘুনিয়ে পড়েছে, তখন কিন্তু তোমার সূক্ষ্মদেহের বা প্রাণের বা মনের তরফের চেতনা ঘুমোয়নি, তারা তাদের কাজ করছে ; অথচ দেহচেতনা তখন দেহকে ছেড়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। তখন এই ক্রিয়াশীল চেতনাগুলি দেহ-চেতনাকে বাদ দিয়ে দেহটাকে সরাসরি তাদের কাজে লাগাচ্ছে। এমনি অবস্থাতেই লোকে স্বপ্নচারী হয়। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জানি যে জাগ্রত চেতনা যখন ঘুমোয় তার ক্লান্তিতে, আভ্যন্তর চেতনা তখনও থাকে জেগে, আর দেহটা তার সঙ্গে এমন সংলগ্ন যে আপনা হতেই সে তার কথায় চলে। এমন অবস্থায় অনেক অসাধারণ কাজ তোমরা করতে পারো, কারণ তখন দেহের দৃষ্টিশক্তিকে বাদ দিয়ে অন্যরূপ দৃষ্টিতে সব কিছুকে দেখছ ।

প্রশ্ন শোনা যায় যে জাগ্রতকালে কোনো গুরুতর চিন্তা বা উদ্বেগ হতে থাকলে তার ফলে স্বপ্নচারিতা আসতে পারে। এ কি ঠিক কথা ? তার্তিনি (Tartini) এমনি অবস্থার মধ্যে এক সঙ্গীত রচেছিলেন, সকালে জেগে সেটা লিখে নিলেন।

উত্তর স্বপ্নচারিতা কেবল যে গুরুতর চিন্তার ফলেই হতে পারে তা নয়। তবে হাঁ, এমন অবস্থায় কেউ কেউ আশ্চর্য রকমের কিছু লিখেও থাকে। কিন্তু তার্তিনি এমন 'নিশি-পাওয়া' ছিলেন না, তিনি সঙ্গীত লিখেছিলেন স্বপ্নেরই অবস্থাতে।

স্বপ্নচারিতা জিনিসটা বিপজ্জনক, ওতে হঠাৎ দারুণ কিছু দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে।

প্রশ্ন : এ দোষ থেকে আরোগ্যলাভের কি উপায় ?

উত্তর : সহজেই তা সম্ভব হতে পারে যদি ঘুমোতে যাবার আগে দেহের উপর ইচ্ছা-শক্তিকে প্রয়োগ করা যায়। স্বপ্নচারী হবার হেতু এই যে ভিতরের বাঁধনগুলিকে ভাঙবার

জন্যে মন ততটা মজবুত হতে পারেনি। গভীরের চেতনা থেকে বাহ্যসত্তাকে মন তফাৎ ক'রে রাখে। কিন্তু শিশুদের বেলাতে এ বাঁধনটা খুব জোর থাকে। আমি এমন অনেক শিশুকে জানতাম যারা খুবই সরল ও অকপট, কিন্তু বাস্তবে যা হচ্ছে আর তাদের কল্পনার মধ্যে যা হচ্ছে এই দুইএর মধ্যে কোনো প্রভেদ করতে পারত না। তাদের কাছে যাহা জীবনও ততটা বাস্তব, আভ্যন্তর জীবনও তাই। তারা মিথ্যাবাদী নয়, মিথ্যা কিছু বলত না, কিন্তু ভিতরের জীবনের কথা বাইরের জীবনের মতোই তাদের কাছে সত্য ছিল। এমন অনেক শিশু আছে যারা দিনের পর দিন ঘুমের সময় একই স্বপ্নকে অনুসরণ ক'রে যেতে থাকে এরা দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যেতেও সক্ষম হয়।

প্রশ্ন : দেহকে ঘুমন্ত রেখে বাইরে বেরিয়ে যাওয়া কি ভালো? বাড়ির থেকে যখন খুশি তখনই কি ফেরা যায়?

উত্তর : যদি সে সময় কাছে অনেক লোক থাকে, যারা কি হলো ভেবে দেহটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করতে থাকে, তাহলে তাতে বিপদ হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি একাই থাকো আর শান্তভাবে ঘুমিয়ে থাকো, তাহলে ওতে কোনো বিপদ নেই।

দেহের মধ্যে যখন খুশি ফেরা চলে, বরং ভিতরে ঢোকার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকতে পারাই কঠিন—সামান্য কিছু ব্যাঘাত দেখলে তখনই তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।

প্রশ্ন আমি যখন দেহকে বিছানায় ফেলে সরে গেছি, তখন অপর কেউ তাতে এসে ঢুকতেও তো পারে?

উত্তর : এমন হওয়া খুবই বিরল, লাখের মধ্যে হয়তো একটা।

"অপর কেউ"—যার অসাধারণ রকমের গুহ্যশক্তি নেই সে কখনো অন্যের দেহতে ঢুকতে পারে না, আর যার সে শক্তি রয়েছে সে অমন কাজ করতেও যায় না।

কিন্তু মানুষ ব্যতীত যারা প্রাণময় জগতের অদেহী সত্তা তারা একটু মজা করার জন্যে যখন দেখে যে দেহটাকে কেউ অরক্ষিত রেখে বেশ খুলভাবেই বেরিয়ে চলে গেছে, তারা এসে হয়তো ওর মধ্যে ঢুকতে পারে। কিন্তু এমন হতে পারাও এতই বিরল যে এরূপ প্রশ্ন না তুললে এ নিয়ে আমি কিছু বলতামই না। অবশ্য এমন হওয়া একেবারে অসম্ভবও নয়।

যারা সেরূপ ভয় করবে, তারা দেহত্যাগের আগে গুহ্যশক্তির দ্বারা তাকে সুরক্ষিত ক'রে নেবে—এর অনেক উপায় আছে। সবচেয়ে সোজা উপায় গুরুকে কিংবা এমন কাউকে স্মরণ করা যাকে অন্তর দিয়ে ভাকা যায়; অথবা দেহের চারিপাশে একটা অবরোধের আড়াল দিয়ে রাখা (নানা উপায় নিশ্চয় গ্রহণ করা যায়), যাতে কোনো সত্তাই ওর মধ্যে না ঢোকে।

তোমার যদি বহির্গমন করবার ইচ্ছা থাকে কিংবা তুমি যদি যোগ অভ্যাস করো, তখন তোমাকে ঘুমোবার আগে নিজেকে সুরক্ষিত করবার উপদেশ দেওয়া হয়—ধ্যান বা মানসিক একাগ্রতা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা—তার অনেক উপায় আছে। কিন্তু সবারই যে কোন বিপদের আশংকা আছে তা আমি মনে করি না ; তবে তুমি যদি কপট হও কিংবা কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করো, আর যদি অসৎ আত্মাদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে যাও, তাহলে অনেক বিপদই সম্ভব হতে পারে ; কারণ যারা সুশৃঙ্খলা ও সত্যের মধ্যে রয়েছে তারা কখনো অন্যের দেহে ঢুকতে যায় না, এমন অব্যবস্থা তারা ঘটাতেই চায় না।

প্রশ্ন দেহ ছেড়ে যা বেরিয়ে যায় তা কি চৈত্য বা সত্তার অন্য কোনো অংশ ?

উত্তর চৈত্য বেরিয়ে গেলে সে কথা তুমি জানতেই পারো না কারণ অধিকাংশ সময়েই সে তোমার ভিতরে নেই। খুব কম লোকের চৈত্যই ভিতরে অবস্থান করছে, তার থাকার আধারটি তৈরি নয় বলে। যা বেরিয়ে যায় তা সূক্ষ্মদেহ, সেই বেরিয়ে দেখে যে স্থূলদেহটা পড়ে আছে। কিন্তু চেতনভাবে তা দেখবার জন্য স্থূলদেহেরও একটু কিছু অংশ বেরিয়ে যাওয়া দরকার। তাই স্থূল বা প্রাণময় সত্তার কিছু অংশও বেরিয়ে যায়। সাধারণত প্রাণময় সত্তাই বেরোয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বেরিয়ে যায় মনোময় সত্তা, কিন্তু এর বেলাতে সে-কথা তুমি জানতে পারো না, কারণ চৈত্যের মতো মনঃসত্তাও তোমার ভিতরে প্রায়ই থাকে না। তুমি যখন ভাবতে থাকো কোনো জিনিসের বা কোনো মানুষের কথা, তখন তোমার মনের একটা অংশ তৎক্ষণাৎ সেখানে চলে যায়—যদি জিনিসটা এমনি ভবঘুরের মতো সর্বদা ঘুরতেই থাকে, একবার ঢুকে আবার তখনই বেরিয়ে পড়ে। কম লোকই তাকে বশ ক'রে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারে।

প্রশ্ন : মাঝে মাঝে আমি দেহ থেকে বেরিয়ে দেখেছি যে দেহটা মরে গেছে।

উত্তর কিন্তু তা স্বপ্নমাত্র ; হয়তো দেহ ছেড়ে তুমি মোটে বেরিয়েই যাওনি। অনেকেই এমন স্বপ্ন দেখে যে তারা মরে গেছে। কিন্তু এর কোনো মূল্য নেই।

প্রশ্ন দেহ থেকে যে বেরোতে পারে তার পক্ষে প্রথমেই তো আপনার কাছে ছুটে যাওয়া উচিত,—সকলেই তাই হয়তো করে, নয় কি ?

উত্তর : একশোর মধ্যে একজনও না।
তা করলে তো অনেক আশ্চর্য ব্যাপার হতে পারত। ফ্রান্সে একজন প্রত্যহ সন্ধ্যায়

আসতো আমার কাছে, যাতে আমি তাকে প্রাণময় বা মনোময় কোনো অজ্ঞাত জগতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার সব কিছু দেখাই, কাজেই আমি তাই করতাম। কখনো কখনো সে আসতো একা, আবার কখনো বা আরো কেউ সঙ্গে থাকতো। আমি তাকে শেখালাম কেমন করে দেহ ছেড়ে বেরোতে হয়, আবার ফিরে যেতে হয়, কেমন করে চেতনাকে ঠিক রাখতে হয় ইত্যাদি। কোনো কোনো জায়গা দেখিয়ে তাকে বলে দিলাম—"এখানে এলে এমনি সতর্ক হবে, এখানে এলে এটা করবে, ওটা করবে," এমনি অনেকদিন চলেছিল।

এমন কথা বলছি না যে কেউই তোমরা রাত্রে আমার কাছে আসো না, কিন্তু চেতনভাবে তা খুব অল্পজনই ক'রে থাকে। সাধারণত এই হয় যে (আমার কথা ভুল হলে বলবে, আমার কিন্তু এরকমই মনে হয়) ঘুমোতে যাবার আগে যখন তোমরা আমাকে স্মরণ ক'রে ঘুমোও, তখন সেটা আমাকে ডাকাই হয়ে থাকে, আমার কাছে "ছুটে আসার" ইচ্ছা নিয়ে নয়, যে কথা তুমি এইমাত্র বললে। বিছানায় শুয়ে তুমি চাও বিশ্রাম নিতে, ভালো ভাবে ঘুমোতে, ভালো চেতনা নিয়ে থাকতে, সেই হিসাবেই আমাকে তোমরা ডাকো, কিন্তু তখন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আমার কাছে আসার জন্যে নয়।

ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৫১

"Words of the Mother" থেকে মা পড়লেন—"যোগ মানে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নিজেকে নিবেদনের দ্বারা—আপনাকে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করে দেবার ভিত্তিতে।"

প্রশ্ন নিবেদন আর আত্মসমর্পণে কি পার্থক্য?

উত্তর : দুটোই প্রায় এক জিনিস—"আমি তোমাকে নিবেদন করলাম, তোমাকে সমর্পণ করলাম," কিন্তু নিবেদনের ভাবটা সমর্পণের ভাবের চেয়ে আরো কিছু সক্রিয়। ফরাসী ভাষায় Soumission শব্দটি ঠিক হয় না, ইংরেজীতে সমর্পণকে বলে Surrender। সমর্পণে আর নিবেদনে কোনো তফাৎই প্রায় নেই। দুঃখের বিষয় ফরাসী প্রতিশব্দটি যথোপযুক্ত নয়; কিন্তু নিবেদন মানে আমি দিয়ে দিচ্ছি—স্বইচ্ছায় তোমাকে দিলাম।

প্রশ্ন : আর উৎসর্গের (consecration) অর্থ কি হবে?

উত্তর : "উৎসর্গ" কথাটার মধ্যে একটা নিগূঢ় ভাব আছে, কিন্তু তাই শুধু নয়।

সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা মানে আপন সত্তার সম্পূর্ণ আত্মদান ; সুতরাং এটা "সমর্পণেরই সামিল, ফরাসী শব্দটির সঙ্গে এর মিল নেই যার অর্থ মেনে নেওয়া। "উৎসর্গ" কথাটির মধ্যে "নিবেদনের" চেয়ে আরো তীব্রতর আত্মহার অগ্নিশিখার জ্যোতি অনুভূত হয়। উৎসর্গ করছি মানে তোমার কাছে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিচ্ছি ; অর্থাৎ যোগের দিক দিয়ে বলতে গেলে ভগবানের কাজকে সম্পূর্ণতর ক'রে তোলার জন্য তার মধ্যেই নিজের সমস্তটা উৎসর্গ ক'রে দিলাম।

Words of the Mother বইখানি থেকে আবার পড়লেন—"যখন একবার তুমি স্থির-সাব্যস্ত করে নিলে যে তোমার সমগ্র জীবনকে ভগবানে সমর্পণ করছ, তার পরেও কিন্তু তোমাকে প্রতিক্ষণে ঐ কথাটি স্মরণ করতে হবে, আর তোমার অস্তিত্বের সর্বদিক দিয়েই সর্বদা এ সংকল্প পালন করে চলতে হবে। প্রতি পদেই মনে করতে থাকবে যে তুমি ভগবানের জিনিস ; আর অনুভব করতে থাকবে এই যে, তুমি যা কিছু করো কিংবা ভাবো, এগুলি সমস্তই হচ্ছে তোমার মাধ্যমে ভগবৎ চেতনার ক্রিয়া। নিজের বলতে তোমার কোনো কিছুই নেই ; সবই আসছে ভগবান হতে, আর যেখান থেকে আসছে সেখানেই তুমি তা পুনর্নিবেদন করছ। এটা যখন উপলব্ধির মধ্যে আসবে তখন দেখবে যে অতি সামান্য জিনিস, যাকে আগে তুমি নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য বলে ভাবতে, তা আর তাই নেই, তারও পুরোপুরি অর্থ রয়েছে, আর তাও বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের যোগ্য।"

এ কথা বলার কারণ জীবনের ও কর্মের, এমন কি চিন্তার ও অনুভবেরও দিক থেকে যে সব সামান্য জিনিসের সাধারণত কোনো দামই থাকেনা, সেখানেও তুমি যদি ভেবে দেখ, "এটা কি আমি ভগবানকে নিবেদন হিসেবে করলাম কিংবা তাই বোধ করছি ?"—জীবনের প্রতিক্ষণেই যদি এইরূপ মনে করতে থাকো, তাহলে তোমার আগেকার অবস্থার চেয়ে এখনকার অবস্থা একেবারে পালটে যাবে। তোমার নিজের ক্ষেত্রটাও অনেক বেড়ে যাবে ; যত সব ছোটো ছোটো অসংখ্য ব্যাপার রয়েছে সমস্তই শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে একটা নিজস্ব স্থান ক'রে নেবে, যেখানে আগে সেগুলোকে তুমি ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে না। এতেই তোমার ক্ষেত্রের অনেক বিস্তার হবে। জীবনের কোনো আধঘন্টা সময়কে ধরে নিয়ে যদি ভাবো, "এটা কি ভগবানে দেওয়া হয়েছে ?" এতেই দেখবে যে ছোটো জিনিসও কত বড়ো হয়ে দাঁড়ায়, আর জীবনও কত বৃহৎ ও উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া যোগের লক্ষ্য। সেদিক দিয়ে কি বলা যায় যে সমর্পণ হলো তার প্রথম ধাপ, আর নিবেদন হলো দ্বিতীয় ধাপ ?

উত্তর না, কেউ বা আগেই করে নিবেদন, পরে সমর্পণ। তা নির্ভর করে

প্রত্যেকের নিজস্ব চরিত্রের উপর। হয়তো প্রথমে তুমি শুরু করলে নিজেকে দীনহীন মনে করে—ভগবানের বৃহত্বের তলায় কোথায় পড়ে আছো, অতঃপর যখন কিছু মুক্ত বোধ করতে পারলে তখন যেমন আছো সেই অবস্থাতেই নিজেকে আনন্দের সঙ্গে নিবেদন করে দিলে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা হয় না। অনেকে গোড়া থেকেই আত্মদান শুরু করে, তাদের পক্ষে তাই সহজ হয়। প্রথমে আত্মদানটা হয় সাধারণভাবে, তারপরে বিশেষ খুঁটিয়ে যখন বিশদভাবে সমর্পণ করতে যাও তার জন্য সবিশেষ চেষ্টা আনতে হয়; প্রথমটায় উত্তেজিত উৎসাহের তোড়ে নিজেকে দিয়েই ফেললে, তারপর যখন দেখ যে প্রতিটি মুহূর্তে উপরের ইচ্ছাকে মেনে চলতে হচ্ছে তখন কাজটা বেশ কঠিন বোধ হতে থাকে।

প্রশ্ন : নিবেদন করছি যানেই কি সমর্পণ ক'রে দেওয়া হলোনা?

উত্তর একেবারেই না। দেবার আনন্দে তুমি দিয়ে ফেললে, প্রকৃত সমর্পিত হবার কথাটা গভীরভাবে তখন না ভেবে। আবিষ্কারের উৎসাহের মধ্যে যখন আভাসে এমন কিছুর দেখা পেলে যা তোমার নিজের চেয়ে অসংখ্যগুণে বৃহৎ, তখন আবেগের মাথায় তার কাছে নিজেকে দান ক'রে দিতে পারো, কিন্তু যখন প্রতিটি মুহূর্তে উপরের ইচ্ছার কাছে নির্বিচারে সমর্পিত হবার পালা আসবে, প্রতি মিনিটেই এমনি সমর্পণের কাজ সচেতন চলবে, তখন তা যথেষ্টই কঠিন হবে। কিন্তু "নিবেদন" বলতে যদি বুঝে থাকো তোমার সকল দিকের সকল ক্রিয়ার সমগ্রভাবে নিবেদন, তখন তা হবে সমর্পণেরই সামিল, যদিও তুমি তেমন মনে না ক'রে থাকো। কিন্তু সেটা উৎসাহের মুখের ক্রিয়া নয়, প্রতি স্তরে তার উপলব্ধি হতে থাকবে। উৎসাহ বা আগ্রহের বশে কিছু করা অনেকটাই সহজ—তা নির্ভর করে তোমার সে বিষয়ে তীব্রতার উপর। কিন্তু জীবনের প্রতি মিনিটে যখন আপন আত্মাহুতিকে অনুভব করার প্রশ্ন আসে তখন উৎসাহ যায় শিথিল হয়ে, তখনকার কাজটাকেই কঠিন লাগে।

প্রশ্ন : এমন কোনো অনুভূতি আছে যা প্রমাণ ক'রে দেয় যে আমি ভগবৎ-উপস্থিতির মধ্যে রয়েছি?

উত্তর : সেই উপস্থিতির মধ্যে যখন তোমার অবস্থান হবে তখন আর তা প্রমাণের কোনো প্রশ্নই থাকবে না। তার প্রমাণ রয়েছে তারই মধ্যে—যখন নিজে তা বোধ করবে তখন তাই নিয়ে আর প্রশ্ন করাই অসম্ভব হবে। তুমি যে রয়েছ তাঁর সামনে এ তোমার কাছে তো সম্পূর্ণ বাস্তব কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত তেমন অনুভূতি আসেনি ততক্ষণ পর্যন্তই প্রশ্ন আসে, কিন্তু সে অনুভূতি এসে পড়লে তাই তোমার কাছে অকাট্য নজীর। যে এমন কথা বলবে, "আমার মনে হচ্ছে যেন ভগবৎ উপস্থিতির মধ্যে আমি এসে পড়েছি, কিন্তু নিশ্চিত ক'রে তা

বলতে পারছি না,"—তার সে অনুভূতি আসেই নি, কারণ তার আসার প্রবল চেউয়ের ধাক্কাটা যখন ভিতরে এসে লাগবে তখন আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। যেমন অনেকে বলে, "ভগবানের কোনটা ইচ্ছা?" সে ইচ্ছার স্পষ্ট সংকেত যতক্ষণ না পাচ্ছ ততক্ষণ তা জানবে কেমন ক'রে? বিচারণা, অনুমান প্রভৃতির দ্বারা সে সম্বন্ধে কিছু একটা আন্দাজ করে নিতে পারো, কিন্তু যেমনি তার নির্ভুল স্পর্শ পেয়ে যাবে তখন আর ভগবানের কিরূপ ইচ্ছা তাই নিয়ে কোনো তর্কই থাকবে না—তখন তুমি নিজেই জেনে গেছ।

এখানে আরো একটা কথা বলে রাখি যাতে তোমরা ভুল না বোঝো ; সকল অনুভূতিরই মূল্য ততখানি তার কাছে, যার মধ্যে যতখানি ঐকান্তিকতা। যাদের মধ্যে তেমন ঐকান্তিকতা নেই তারা আশ্চর্য রকম অনুভূতির কৃত্রিম জাল বোনে আর মনে ভাবে যে খাঁটী অনুভূতিটাই পেয়েছি। এদের কথা বাদই দিলাম, কারণ তা বর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু নিজেরা যারা খাঁটি ঐকান্তিক থেকে ভগবৎ-উপস্থিতির অনুভূতি পেয়েছে, তাদের কাছে যদি সমগ্র জগৎ শোনাতে থাকে যে ও-কথা সত্য নয়, তবু তারা পুরো নিঃসন্দেহই থাকবে।

ঐকান্তিক না হলেও পাওয়া যায় আশ্চর্য ধরনের অনুভূতি, কিন্তু তার কোনো মূল্য নেই, নিজের কাছেও না পরের কাছেও না। নিজের মনের চিন্তাকে কখনো বিশ্বাস করবে না, কারণ মন বেশ বানাতে জানে, কত আশ্চর্য অনুভূতি বানিয়ে তোমাকে দিতে পারে, কিন্তু তার কিছু দাম নেই। তাই কখন কি হয়ে পড়বে তা আগের থেকে না জানাই ভালো। কারণ মন এমনই সুন্দর জাল বুনে ছবি দেখায় আর সুকৌশলে মনোরম নাটক রচনা করে যে তুমি তার সত্য মিথ্যা কিছুই ধরতে পারো না। সুতরাং সত্য অনুভূতির পক্ষে এটি খুবই জরুরী তোমার মন-যন্ত্রটিকে নীরব রাখো ; সে যতই ক্রিয়াবিরত থাকে ততই ভালো, আর তার কল্পনা মাত্রেরই সম্বন্ধে যথেষ্ট হুঁশিয়ার থাকবে।

প্রশ্ন : আশ্পৃহা করছি কিংবা চাইছি, এই দুইএর মধ্যে কি তফাৎ?

উত্তর দুইই যদি অনুভব ক'রে থাকো তবে দুটির মধ্যে কি তফাৎ তা নিজেই বুঝবে। আশ্পৃহার মধ্যে এমন এক নিঃস্বার্থের শিখা জ্বলে যা চাওয়ার মধ্যে নেই। আশ্পৃহা কখনো নিজের পানে চায়না—আর চাওয়া অর্থাৎ কামনা কেবলই চায় নিজের পানে। নিছক মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বলতে গেলে আশ্পৃহা মানেই হবে নিজেকে দেওয়া, আর চাওয়ার মানে হবে নিজের দিকে টানা ; আশ্পৃহা সাধারণত চিন্তারূপে প্রকাশ পায়না, শুধু থাকে তার স্পন্দন, প্রাণের আবেগপূর্ণ।

প্রকৃত আশ্পৃহা মাথার থেকে জন্মায় না ; যদিও চিন্তা থেকেই গড়া, তবু এটি হৃদয় থেকে জ্বলে ওঠে শিখা হয়ে। শ্রীঅরবিন্দ বেদ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছেন তা তোমরা পড়েছ কিনা জানিনা। তিনি বলেছেন যে বেদের ঐ সকল গাথা মাথা থেকে রচিত নয়,

ওগুলি প্রার্থনা নয় যেমন তোমরা ভেবে থাকো, কিন্তু তা হলো হৃদয় থেকে উৎসারিত আত্মা-হার আবেগপ্রবণতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি—ঠিক "হৃদয়" থেকে নয়, সত্তার মনস্তাত্ত্বিক কেন্দ্র থেকে। এগুলি "চিন্তা" নয়, কোনো অনুভূতিকে ভাষাতে সাজিয়ে বলা নয়, কিন্তু অনু-ভূতিগুলি আপনা হতেই যথাযথ ও সুনিশ্চিত বাক্য হয়ে উচ্চারিত—যার কোনো অদলবদল চলে না। আত্মহার প্রকৃতি ঠিক ঐরূপ; তোমাকে তা গড়ে নিতে হয় না, স্বয়ংগঠিত শিখার মতো আপনি লাফিয়ে উঠে আসে। যদি তার মধ্যে কিছু বাকা থাকে (অনেক সময় থাকেও না), তাকে কখনো বদ্‌লানো যায় না; কোনো একটি কথার বদলে অন্য কথা বসাতে পারো না, প্রত্যেক কথাটাই একেবারে সুনির্দিষ্ট এবং অকাট্য। আত্মহা গড়ে ওঠে সুস্পষ্ট ও নির্বিশেষ হয়ে, তার আর পরিবর্তন সম্ভব নয়। আপনা হতেই তা লাফিয়ে উঠে নিজেকে দিয়ে ফেলে—আর কামনা চায় নিজে পেতে।

আত্মহার প্রেম আর কামনার প্রেম, দুইএর মধ্যে তফাৎ এই যে প্রথমটি পুরোপুরি নিজেকে দিয়েই ফেলে, দেবার বদলে পাবার কোনো দাবি রাখেনা; আর দ্বিতীয়টি দেয় খুব সামান্য চায় খুব বেশি, আর দেবার সঙ্গে একটা দাম ফেরৎ পাবার দাবি তার আছেই।

প্রশ্ন: আত্মহা সর্বদাই আনন্দ দিয়ে থাকে, নয় কি?

উত্তর: বরং বলো মনকে ভরিয়ে রাখার কথা—আনন্দ দেবার কথাটা এখানে ঠিক হচ্ছে না; একটা পরিপূর্ণতার তেজের ও আভ্যন্তরীণ জ্যোতির মধ্যে তুমি ভরপুর হয়ে থাকো। ওতে যে আনন্দ আসতে পারে তা হলো বিশেষ একরকম অহেতুক আনন্দ।

প্রশ্ন আত্মা আর চৈত্য কি একই জিনিস?

উত্তর: এই কথা দুটির সংজ্ঞা যেমন তুমি দেবে তার উপরেই তা নির্ভর করবে। প্রায় সকল রকমের ধর্মে এবং দর্শনেও "আত্মা" বলতে প্রাণসত্তাকে বোঝায়, কারণ তাতে কথায় বলে "আত্মা দেহ ছেড়ে গেল"—কিন্তু বস্তুত প্রাণসত্তাই যায় দেহ ছেড়ে। "আত্মাকে বাঁচাও", "দুষ্ট আত্মার কাজ", "আত্মাকে উদ্ধার" প্রভৃতি যে সব কথা বলা হয়ে থাকে তা প্রাণসত্তারই সম্বন্ধে, কারণ চৈত্যকে বাঁচাবার বা রক্ষা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। বাহ্য মানুষ যা-কিছু দোষ করে তাতে তার চৈত্যের কোনো অংশই নেই, সর্বপ্রতিক্রিয়া হতে সে মুক্ত।

প্রশ্ন: আমি কোনো একটা কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করতে চাইলে তার জন্যে আমার যথেষ্ট সময় পাওয়া দরকার হয়। কিন্তু হাতে আরো নানা কাজ এত বেশি থাকে যে

ওর জন্যে ততখানি সময় মেলে না। নানা কাজের তাড়া থাকলে ভালো কাজটা কেমন ক'রে ভালোভাবে করি?

উত্তর: এ একটা খুব জরুরী প্রশ্ন, এই নিয়ে আমি একদিন তোমাদের কিছু বলব বলেই ভেবেছিলাম। সাধারণত যখন বিশেষ তাড়া থাকে তখন কোনো কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে না পেরে লোকে তা অসম্পূর্ণভাবেই ক'রে থাকে। কিন্তু এর প্রতিকারের জন্যে একটা তৃতীয় রকমের উপায় আছে, আপন একাগ্রতাকে তীব্রতর করা। এতে প্রায় অর্ধেকটা সময় বেঁচে যায় আর কাজটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। সাধারণ একটা দৃষ্টান্ত বলি: স্নান ক'রে তোমায় পোষাক পরে বেরোতে হবে, এর জন্যে ভিন্ন লোকের ভিন্ন রকম সময় লাগে, তবু ধরে নেওয়া যাক যে ধীরেসুস্থে এ-কাজ সারতে মোটের উপর আধঘন্টা সময় তোমার লাগল। এর চেয়ে যদি তাড়াতাড়ি করতে যাও তাহলে স্নানটা হয়তো ভালো হবে না কিংবা পোষাকটা ঠিক হবে না। কিন্তু এখানে অন্য একটা উপায় করতে পারো—অন্য কোনো দিকেই মন না দিয়ে তখন মনোযোগ ও তৎপরতাকে ঐদিকেই পুরো তন্নিবিষ্ট ক'রে নাও, যেটুকু মাত্র করা দরকার শুধু সেইটুকুই ঠিকভাবে সেরে নাও কিন্তু বাহুল্য কোনো দিকেই করতে যেও না—এতে দেখবে যে আধঘন্টার কাজ পনের মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে (নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা জোর করে বলছি), অথচ তাতেও কাজটা আগের চেয়ে ভালো ও নির্ভুল হবে, বাদ কিছু পড়বে না, শুধুই একাগ্রতার কারণে।

যারা বলে, "অমুক কাজটা ভালোভাবে সারতে কিছু সময় চাই", তাদের কথার এই হলো জবাব। তারা যা বলে তা ঠিক কথা নয়। যাই কেন করতে যাও—পড়া, লেখা খেলা করা, কোনো কাজ করা—তার সঠিক উপায় ঐ একটাই একাগ্রতা বাড়াও। তাহলে ওতে অবসাদও আসবে না। অবশ্য গোড়ার দিকে একটু চেষ্টার প্রয়োগ লাগবে, কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে আর তা থাকবে না, তখন দেখবে যে আগে যে কাজে ক্লান্তি আসছিল এখন আর তা আসছে না, মনও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে না, যা প্রায়ই হয় একাগ্রতা না থাকলে। এই একাগ্রতারই জোরে তুমি সব কাজই সুন্দরভাবে অথচ তাড়াতাড়ি সারতে পারো। আর এতে কাজের মাধ্যমে নিজেরও কিছু উন্নতি হয়। অন্যথা নিস্পৃহ হয়ে কাজ করা চাই, এইরকম ধোঁয়াটে ভাব নিয়ে কাজ করতে লাগ, তাতে এই বিপদ আছে যে তেমন নিস্পৃহার স্থানে ঔদাসীন্য এসে পড়ে।

*

ফেব্রুয়ারি ২৪, ১৯৫১

সেদিন বলেছিলাম যে অধিকাংশ সময়ে তোমার চৈত্য তোমার নিজের মধ্যে থাকে না। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি—তোমরা নিশ্চয় এ কথা জানো যে আভ্যন্তরীণ সত্তা জিনিসটা ত্রিমাত্রার মাপে নয়। দেহটাকে চিরে ফেললে দেখবে ভিতরকার যন্ত্রগুলি সবই ত্রিমাত্রার মাপের জিনিস। কিন্তু আভ্যন্তর সত্তা থাকে অন্যরূপ মাত্রাতে, আর আমি যে বলেছি অনেকের চৈত্য তাদের মধ্যে থাকে না, তার মানে এই নয় যে তা সত্তার কেন্দ্রেও উপস্থিত নেই, কিন্তু তাদের বাহ্য চেতনা এত ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ ও তমসাবৃত যে তাকে ছাড়িয়ে চৈত্য যেখানে রয়েছে তার সঙ্গে কোনো সম্পর্কেই সে আসতে পারে না ; চৈত্য থাকে চেতনার গুহ্যের এত-খানি উচ্চে ও গভীরে যে প্রকৃতিতে বা চরিত্রে তার কাছেই পৌঁছনো যায় না। ধর্মশাস্ত্রে বলে যে তোমার মধ্যে ভগবৎ-স্ফুলিঙ্গ আছে—এই "স্ফুলিঙ্গ" কথাটা ঠিকই প্রযুক্ত হয়েছে, কারণ তা এতই অণুবৎ ক্ষুদ্র যে দেহের যেখানে খুশি ঢুকে থাকতে পারে। কিন্তু তার মানে ঠিক এই নয় যে তা দেহের মধ্যেই কোথাও ঢুকে রয়েছে ; তা রয়েছে চেতনার মধ্যে তার অন্যরূপ মাত্রাতে, কেউ কেউ তার সংস্পর্শে আসতে পারে আর কেউ কেউ তা পারে না। এ কথাটা যদি ধারণায় আনতে পারো যে একটি অ্যাটমের মধ্যেই আছে ভগবৎ-উপস্থিতি, তাহলে জিনিসটা বোঝা কতক সহজ হবে, কারণ তুমি এমন এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের রাজ্যে চলে যাবে যেখানে দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা, চতুর্থমাত্রা বা পঞ্চমাত্রার মধ্যে কোনো পার্থক্যই বোঝা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান যদি পড়া থাকে তাহলে এ কথার মর্ম বুঝবে। আয়তনের দিক দিয়ে অ্যাটমের মধ্যে যে ক্রিয়া হয় তা এতই সূক্ষ্ম যে ত্রিমাত্রার আন্দাজে তাকে ধরাই যায় না, যে নিয়মে তার ক্রিয়া হয় তা ত্রিমাত্রার আন্দাজের অতীত। এই ধারণাকে নিয়ে তুমি বলতে পারো যে প্রতি অ্যাটমের মধ্যে ভগবৎ-স্ফুলিঙ্গ আছে, সে কথা মিথ্যা হবে না। কিন্তু আমি স্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধে বলিনি, আমি বলেছি চৈত্য ও চেতনার কথা, যা স্বতন্ত্র জিনিস। চৈত্যের নিজস্ব একটা আকার আছে ; সে থাকে কেন্দ্রচেতনাকে ঘিরে ; এবং তার আকার থাকাতে তার একরূপ মাত্রাও আছে, কিন্তু তা বাহ্য চেতনার ত্রিমাত্রা হতে অন্যপ্রকার।

প্রশ্ন : শোনা যায় যে শিশুরা চৈত্য লাভ করে সাত বছর বয়সে। এ কথার অর্থ কি ?

উত্তর : কথাটা ঠিক নয়। কারো কারো চৈত্য জন্মের আগেই এমন কি মাতৃগর্ভে উপ্ত হবার আগের থেকেই এসে উপস্থিত হয়। আবার কোনো কোনো শিশুর ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম কেঁদে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চৈত্য এসে পড়ে। কারো বা জন্মের কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন পরে আসে, অথবা কয়েক সপ্তাহ, মাস বা কয়েক বছর পরে আসে...আর কারো বা কখনই আসে না।

প্রশ্ন : আপনি একবার শিশুদের পক্ষে সাত বছরের পূর্বে মানসিক পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছিলেন।

উত্তর : সে হলো অন্য কথা। ওদের দেহের মধ্যে মস্তিষ্ক গড়ে উঠতে কতক বিলম্ব হয়, অতি ধীরে ধীরে তা গড়তে থাকে। সেই গড়বার সময়ের মধ্যেই তুমি যদি তাকে কোনো মানসিক প্রচেষ্টাতে লাগিয়ে দাও, তাতে মস্তিষ্ক সেই পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

প্রশ্ন আপনি কি বলেন যে চৈত্য আর ভগবৎ-স্ফুলিঙ্গ একই জিনিস?

উত্তর না, আমি কখনই তা বলিনি, তা বললে বোকামি হবে। চৈত্য থাকে ভগবৎ-স্ফুলিঙ্গকে ঘিরে। সে স্ফুলিঙ্গ এক বিশ্বব্যাপী জিনিস, সব-কিছুর মধ্যেই থেকে অন্যত্রও অনন্ত, সর্বত্রই সমান। তাকে একটা সত্তা বলা চলে না—"তত্ত্ব" বলতে পারো, কিন্তু কোনো একটা সত্তা নয়। অবশ্য যদি মূলের দিক দিয়ে দেখ তাহলে বলতে হবে যে আত্মা একমেবাদ্বিতীয়, সকল আত্মারই মূল সেই এক, সমগ্র বিশ্বের মূলও সেই এক, যাবতীয় সৃষ্টির মূলও তাই। আর চৈত্য হলো ব্যক্তিগত এক সত্তা, তার নিজস্ব অতিপ্রকৃতির ধারা ও উন্নতি ও ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতি নিয়ে তার স্ফুরণ; এবং তা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ ভগবৎ-স্ফুলিঙ্গের ক্রিয়ার ফলে।

কিন্তু যেদিন তোমার বাহ্যিক, দৈহিক, প্রাণিক ও মানসিক সত্তার সঙ্গে নিত্যকার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হবে চৈত্যের সঙ্গে, তখন সেইভাবে বলা চলবে যে তোমার স্থূল সত্তাগুলি পরিচালিত হচ্ছে ওর কেন্দ্রস্থ দিব্য চেতনার দ্বারা। যেমনি তার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটবে তখন থেকেই তুমি তার অধীনস্থ হয়ে তারই দ্বারা অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ দিব্য চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে; বলতে পারো যে দেহটা তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, কিন্তু সেই দেহটাই মাত্র, আত্মা নয়। দিব্য স্ফুলিঙ্গের দ্বারা আত্মা চালিত হচ্ছে, এমন কথা নয়।

প্রশ্ন : অ্যাটমের মধ্যেও কি চৈত্য থাকে?

উত্তর : না, ওর মধ্যে তা নেই। জড়ের মধ্যে চৈত্য চেতনার সম্ভাবনা আছে এমন কথা বলতে পারো—ভগবৎ-চেতনার উদ্দেশ্যই ঐভাবে তার ব্যাপক বিকাশ, এ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য নেই; ভগবানের প্রত্যক্ষ প্রভাব কার্যকরী হলে তা সুশৃঙ্খলে সম্ভব হতে পারে। সেই কারণে তা এখন বিশৃঙ্খলার জগৎকে বাদ রেখে যাচ্ছে। (মা এই কথাটির উপর পরে তাঁর মন্তব্য যোগ করেন—"প্রাণময় জগতের কতক অংশ বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে, তাই তার সত্তাদের মধ্যে চৈত্য নেই। চৈত্য আছে কেবল এই পৃথিবীর স্থূল রাজ্যে। তাই আমি বলেছি যে দিব্যের স্ফুলিঙ্গ বিশৃঙ্খলার রাজ্যকে বাদ রেখে সরাসরি এখানকার জগতে অভিব্যক্ত

হয়ে তাকে ঘিরেই সর্বশৃঙ্খলার সম্ভাবনা ঘটাতে চায়"।) সুতরাং বলতে পারো যে আটমের মধ্যে এবং তার অন্তরস্থ সকল উপাদানের মধ্যেও আত্মার উৎস আছে, কিন্তু তা উৎস হিসাবেই...এটা বলে রাখছি যে চৈত্য যখন পূর্ণ পরিণতি পায় তখন তার একটা আকার আসে যা দেহের আকারের অনুরূপ প্রতাক। সর্বত্র তা এক জিনিস না হলেও তার নিজস্ব আকৃতি আছে। প্রত্যেক সত্তা অপরটি হতে বিভিন্ন—সব এক ছাঁচে গড়া নয়। তার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব আছে।

"Words of the Mother" থেকে না আবার পড়লেন—"জীবনের এপার থেকে ওপারে গিয়ে আবার যদি কেউ এপারে ফিরে আসে, তাহলে সে কথা কি তার মনে থাকে ?"

আমি একবার খুব অসুস্থ হয়ে দুই ঘন্টা পর্যন্ত অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, তখন আমার বোধ হলো যে আমি ওপারের এক স্বতন্ত্র জগতে উপস্থিত হয়েছি। যখন আবার জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন বোধ হলো যে সেই জগৎ থেকে বহু পথ ঘুরে আবার আপন জগতে ফিরলাম।

সেটা হয়েছিল আংশিকরূপে চলে যাওয়া, পুরোপুরি যাওয়া নয়, যার মানে মৃত্যু। কেউ যদি দেহ থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে মৃত্যুর মধ্যে যায় এবং তারপর আবার সেখান থেকে ফিরে আসে, তাহলে তার যে অকথ্য যন্ত্রণা হতে থাকে তা ভুলবার নয়। লোকে বলে, শিশুরা যখন ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে ওঠে, তার কারণ এই যে ফুসফুসে প্রথম বায়ু প্রবেশ করাতেই তার চাপে গলা দিয়ে কান্না বাহির হয়, কিন্তু আমার মনে হয় এর অন্য কারণ আছে। দেহের মধ্যে পুনঃপ্রবেশের কালে একটা ঘর্ষণবেগ লাগে, যেমন দেহ থেকে যখন বাস্তব কিছু জিনিস বেরিয়ে যায় যা সূক্ষ্মদেহ অপেক্ষা অনেকটা বাস্তব, তখনও ঐরূপ একটা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ঘর্ষণবেগ লাগে। কিন্তু যখন কেউ মরে না গিয়ে বাহ্যতঃ অজ্ঞান হয়ে থাকে, তার সেরূপ কিছু হয় না। বাস্তব জিনিস কিছু যখন ভিতর থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে "মৃত্যু" ঘটছে, তখনই তা হয়ে থাকে। তাই মানুষ মৃত্যুর বাহ্য ঘটনাটির পরেও ছয় সাতদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে মৃত হয়না (আজকাল হয়তো অনেকে এ কথা বুঝতে পারছে)। অর্থাৎ দেহটা যতক্ষণ পর্যন্ত অটুট অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মরে না—দেহে পচনের ক্রিয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং উপায় জানা থাকলে ও শক্তি থাকলে ঐ সময়ের মধ্যে আবার তাকে বাঁচাতেও পারা সম্ভব। আমার মনে হয় অধিকাংশ "পুনরুত্থানের" এই অর্থ।

প্রশ্ন : একজন লোক একেবারেই মরে গিয়েছিল। ডাক্তারেরা তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়যন্ত্রটিকে নিয়ে মর্দন প্রভৃতি নানারূপ প্রক্রিয়া করতে করতে আবার সে বেঁচে উঠল।

উত্তর : হাঁ, এইদিক দিয়ে ওরা এখন অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব করছে।

মা আবার পড়লেন—"ওপারে গিয়ে তুমি একবার অন্যরূপ চেতনাতে পৌঁছলে, পরে সে কথা স্মরণ করা যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঐ অবস্থায় আংশিকভাবে যাওয়া খুব কঠিন কথা নয়; ধ্যানের সময়, স্বপ্নের সময়, অন্তর্দৃষ্টি লাভের সময় এমন কথা বোধ হতে পারে যে গতজীবনেও তোমার এমনি ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, এমনি ক'রে এইরূপ সত্যের সন্ধান পেয়েছিলে। কিন্তু তা পুরো উপলব্ধি নয়, তার জন্য চাই স্থায়ীভাবের চেতনাতে গিয়ে পৌঁছনো, যা চিরদিন ছিল আর চিরদিন থাকবে, যা সমস্ত অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-জীবনকে একত্রে গেঁথে রেখেছে।"

যারা প্রাণময় বা মনোময় জগতে একবার গিয়ে ঘুরে এসে লম্বা লম্বা কাহিনী শোনায় যে তারা তাদের পূর্ব পূর্ব জীবনের সব কথা জেনে গেছে, তাদের কথা বিশ্বাস করো না। তোমরা নিশ্চয় সেই বহুশ্রুত মহিলাটির কথা জানো যে বলত, যখন তার বানর জন্ম হয়েছিল তখন থেকে তার প্রত্যেক জন্মের কথাই স্মরণ আছে! এটা নিছক কল্পনা, কারণ এ স্মরণ রাখা অসম্ভব।

প্রণালীটা হয় এই রকম। মনে করো একটি দিব্য স্ফুলিঙ্গ তার টান বা প্রবণতা বা আকর্ষণীর ফলে তার চারিপাশে খানিক স্থূল চেতনাকে টেনে এনে জড়ো করলে (এটা পশুদের বেলাতে স্পষ্টই দেখা যায়—ভেবোনা যে তোমরাই একমাত্র চৈত্যপুরুষের অধিকারী, জগতে অন্য কারো মধ্যে তা নেই! খনিজ পদার্থ হতে শুরু করে উদ্ভিদের মধ্যেও তার কিছু উদ্‌গম ঘটে, আর পশুদের মধ্যে দেখা যায় চৈত্যপুরুষের উপস্থিতির প্রথম স্ফুরণ)। অতঃপর একটা সময় আসে যখন সেই চৈত্য পরিণত অবস্থা পেয়ে একটা নিজস্ব চেতনা ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার অধিকারী হয়। সেই ব্যক্তিত্ব নিয়ে সে অসংখ্য জন্ম পার হয়ে যেতে যেতে আপন উদ্দিষ্ট কর্ম ও উন্নতির পক্ষে কিরূপ অবস্থা ও পরিস্থিতি দরকার সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। এমনি জ্ঞান তার জন্মালে তখন তার এক একটা পার্থিব জীবন ফুরোবার শেষ মুহূর্তে সে স্থির ক'রে ফেলে যে এবারকার পরবর্তী জীবনে সে কিরূপ অবস্থা বেছে নেবে। এখানে একটা বিশেষ জরুরী কথা বলে রাখি চৈত্যের পক্ষে কেবল পার্থিব স্থূল জীবনের মধ্যে এসেই সে নিজের যা কিছু গঠনকার্য ও উন্নতি ক'রে নিতে পারে। দেহত্যাগের পরে যখন তার বিশ্রামের পালা শুরু হয়—যা তার ইচ্ছা ও উন্নতির মাত্রা অনুযায়ী দীর্ঘকালেরও হতে পারে বা তা নাও পারে এবং তখন সে তার পূর্বাভিজ্ঞতাগুলিকে জীর্ণ করতে থাকে—সেই নিষ্ক্রিয় বিশ্রামের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে পরে তার আরো নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আরো সক্রিয়ভাবে উন্নতির দিকে অগ্রসর হবার সময় আসে। কিন্তু একটা জীবনের কাজ শেষ করবার পরে (যে জীবন সাধারণত তার সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফুরোয়না) আবার তাকে বেছে নিতে হয় যে এবার সে কোন পরিস্থিতির মধ্যে কোনখানে জন্ম নিয়ে কেমন ধরনের জীবন যাপন করবে, কেমন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেলে তার আরো উন্নতি ঘটতে পারবে।

একটা বাস্তব দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে দেখা যাক। মনে করো কোনো চৈত্যপুরুষ বিশেষ কারণে স্থির করলে যে এমন একটি দেহে এবার সে প্রবেশ করবে যে একজন রাজা হবে, কারণ রাজা হয়ে যে অভিজ্ঞতা মিলতে পারে সেগুলোই তার তখন দরকার। শেষে রাজা হবার অভিজ্ঞতাগুলি পাবার পরে সে দেখলে যে তার এমন একটা দিক সম্পূর্ণ বাকী রয়ে গেল যেদিকের কোনোই উন্নতি সেই জীবনে হতে পারে না। তাই সেই জীবনের শেষে মুহূর্তে সে স্থির করলে যে এবার নিতান্ত মামুলী অবস্থার সাধারণ পরিস্থিতিতে সে জন্মাবে, এমন অবস্থাতে যা খুব উঁচুও নয় আর নীচুও নয়, যেখানে জন্ম নিলে সে স্বেচ্ছামত কর্ম করতে পারে। কারণ এটা খুব নতুন কথা নয় যে রাজার জীবন হলো নিতান্ত ক্রীতদাসের জীবন; রাজাকে চলতে হয় ধরাবাঁধা নিয়মের অধীনে, মর্যাদা রক্ষা করতে তাঁকে নানা ব্যসনে ও উৎসবে হাজির থাকতে হয়—দাম্ভিকের কাছে তা খুব লোভনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু চৈত্যের কাছে তা নয়, কারণ ওতে অনেক কিছু কাম্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। তাই এবার অন্যরকম সংকল্প ক'রে নিয়ে রাজাজন্মের স্মৃতিগুলিকে নিয়ে কিছুকাল বিশ্রাম যাপন করে (অবশ্য আমি বলছি এমন চৈত্যের কথা যে নিজের উন্নতি করা ছাড়া অন্য কোনো কাজে নিযুক্ত হয়ে নেই, কারণ তা থাকলে সে তখন সেই কাজেরই উন্নতির দিকে লক্ষ্য ক'রে চলবে, তাই বলছি এমন চৈত্যের সম্বন্ধে যে নিজের পথেই উন্নতির দিকে চলেছে), তারপর আবার সে দেহধারণ করতে মনস্থ করে। ইতিপূর্বে তার অনেক জন্মে অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, সে জানে যে কোন কোন দেশে কোন কোন অবস্থায় গিয়ে তার চেতনার কোন কোন অংশের উন্নতি হয়েছিল, তাই এবার সে তার প্রয়োজনমত নতুন জন্মস্থান বেছে নেয় অর্থাৎ কোথায় গিয়ে জন্মাবে, কোনরূপ জীবন নেবে, কেমন পিতামাতার ঘরে সে যাবে, তাছাড়া দেহের গঠন ও বুদ্ধিগুণাদি কেমন থাকবে, যাতে তা পরবর্তী কাম্য অভিজ্ঞতা লাভের উপযোগী হতে পারে। বিশ্রামান্তে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে সে জেগে উঠে নিজের চেতনাকে পাঠিয়ে দেয় সংকল্পিত স্থান ও পরিস্থিতির অভিমুখে—প্রায় তার ইচ্ছিত স্থানের কাছাকাছি গিয়ে পড়ে, কিন্তু তবু একটু তফাৎ থাকে, কারণ চৈত্য চেতনা থাকে স্থূল চেতনার রাজ্য থেকে বহুদূরে, সেখানে স্থূল দৃষ্টির অভাবে স্থাননির্ণয় সুনির্দিষ্ট না হয়ে একটু মোটামুটি রকমের হয়। দেশ বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ ভুল হয় না, কারণ স্থানীয় লোকদের আভ্যন্তরীণ স্পন্দনের অবস্থাটা সে ভালোই জানতে পারে, কিন্তু তবু ঠিক কোন জায়গাটিতে যাবে সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। ঐ সময়ে পৃথিবীতে যদি এমন কোনো দম্পতি থাকে অথবা বিশেষ ক'রে এমন কোনো সন্তানেচ্ছু নারী থাকে যার নিজের কিছু চৈত্য আশ্পৃহা আছে আর সে একটি অসাধারণ রকমের সন্তান কামনা করে—আর পৃথিবীর বুকেতেও যদি ঐ প্রকার আশ্পৃহা জাগে, তাহলে ওতে এমন স্পন্দন ওঠে ও চৈত্যের আলো জলে যা দেখতে পেয়ে সেই চৈত্যসত্তাটি বিনা দ্বিধায় সেখানেই ঢুকে পড়ে। সেই মুহূর্ত থেকেই (অর্থাৎ গর্ভাধানের সময় থেকে) সে ঐ রূপটির গঠনের

দিকে লক্ষ্য রাখে যাতে তা ওর ইচ্ছার অনুকূল হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠের আগেই তার প্রভাব কাজ করতে থাকে।

ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত যদি সব কাজ নির্বিঘ্নে চলে (কারণ ইতিমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটা খুবই সম্ভব) তাহলে ওর চৈত্যশক্তি (সমগ্রটা নয় কিন্তু আংশিক চৈত্যচেতনা) শিশুর প্রথম কান্না থেকেই তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাকে প্রার্থনীয় অভিজ্ঞতার অভিমুখে ঠেলে পাঠাতে শুরু করে। সুতরাং পিতামাতার কিছু জানা না থাকলেও, আর শিশুর বাহ্য চেতনাতে কিছু চিহ্ন না দেখা গেলেও (শিশুর তখন মস্তিষ্কই গড়ে ওঠেনি, তা হবে ক্রমশ ধীরে ধীরে)— এটা সম্ভব যে সেই চৈত্যের প্রভাব শিশুর জীবনের সকল ঘটনাকে ঐ দিকেই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত চৈত্যের সঙ্গে শিশুর চেতনার চেতন সংস্পর্শ না ঘটে (সাধারণত যা চার থেকে সাত বছর বয়সের মধ্যে হয়ে থাকে, কখনো বা তার চেয়ে শীঘ্র কিংবা তৎক্ষণাৎ হতে পারে, কিন্তু তাহলে সে আর "সাধারণ" শিশু নয়, তাকে বলা যায় "অতিপ্রাকৃত" জ্ঞানসম্পন্ন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়, এরূপ হয় কেবল ঐ পরিণত চৈত্যের উপস্থিতির ফলে)।

কিন্তু অনেকেরই বেলাতে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার মতো লোকের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয় না। তবুও তারা এটুকু বোধ করে যে তাদের অস্তিত্বের প্রতি পদক্ষেপ ও জীবনের প্রতি ঘটনা কোনো চেতনশক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, যাতে সে সর্বোত্তম উন্নতির দিকে আপনিই অগ্রসর হয়। তখন যে ঘটনাটি আসা প্রয়োজন তাই এসে উপস্থিত হয়, যে-সব লোকের আসা প্রয়োজন তারাও এসে উপস্থিত হয়। যে সব পুস্তকাদি পড়া তাদের প্রয়োজন তাও হাতের কাছে এসে পড়ে। সব-কিছুই এমনভাবে চলতে থাকে যেন কেউ একজন কোথা থেকে এই সব ব্যবস্থা জুটিয়ে দিচ্ছে, যাতে তার জীবনে চরম উন্নতির সম্ভাবনা সহজে এসে যায়। তাদের মনে তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, "কে এই চৈত্য ?" কেউই অবশ্য এ নাম তাকে শেখায়নি কিংবা রহস্যটাও বুঝিয়ে দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ কারো সাক্ষাৎ পেয়ে কিংবা কোনো কিছু দেখেই তারা অমনিভাবে জেগে ওঠে ; আর তখনই মনে পড়ে যায়, "এ তো আমি জানি।"

এ সব জিনিস ঘটে কেবল সেই চৈত্যেরই বেলাতে যে পরিণতির শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছবে। ওর পরে আর তাকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হবে না, উন্নতির কাজ তখন পুরোপুরি হয়ে যাবে, তার পরে সে নিজের ইচ্ছামত ভগবানের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে অথবা কোনো উচ্চতর লোকে চলে যেতে পারবে। কিন্তু এমন অবস্থা এলে তখন সাধারণত তার নিজের বেলাতে যা যা ঘটে গেছে সব কথাই মনে পড়ে যায়, আর তখন সে বুঝতে পারে যে জগতে এখনও যাদের কষ্টের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে তাদের সাহায্য দেবার জন্যেই এখানে আবার তার আসা দরকার। এই সব সত্তা তাদের অস্তিত্বকে সমর্পণ

করে দিবাকালের জন্য—কোনো বাধাবাধকতা নেই, তথাপি নিতান্ত মুক্ত থেকেই শতকরা নব্বুই জনেই এ কাজ তখন ক'রে থাকে।

সাধারণ মার্জিত অর্থাৎ শিক্ষিত ও উন্নত ধরনের মানুষের জীবনে বাহ্যসত্তার সঙ্গে চৈত্যের সংস্পর্শ কেবল মাঝে মাঝেই ক্বচিৎ ঘটতে পারে, হয়তো কোনো অনুভূতি এসে পড়ার কিংবা আভ্যন্তরীণ চাহিদা জেগে ওঠার ফলে : শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলতে গেলে ঐ সময় তাদের "চৈত্য সামনে এসে হাজির হয়", অর্থাৎ চেতনার উপরতলাতে ভেসে ওঠে, খুবই অল্পক্ষণের জন্যে, হয়তো কোনো বাস্তব ঘটনা থেকে কিংবা কোনো মূর্তি দেখে অথবা কোনো বাক্যের বা শব্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে, জীবনের সেই একটি মিনিট বা কয়েক মুহূর্তের জন্য তখন ফোটো বা সিনেমার মতো একটা ছবি ফুটে ওঠে। এমন মুহূর্ত হয়তো অনেকবারই আসতে পারে কিন্তু স্থায়ী হয়না ; এর স্মৃতি কিন্তু থেকে যায় চৈত্যের মধ্যে ; তার পরজন্মে যখন খাঁটি চৈত্যস্মৃতি আপনা হতে জাগে, যার মধ্যে প্রাণের বা মনের কিছু মিশান নেই, তখন সেই স্মৃতি প্রকাশ পায় "মাঝে মাঝে"। কিন্তু পূর্বজন্মে "আমি অমুক ছিলাম বা তমুক ছিলাম" এ কথা বলা খুবই কঠিন। কেবল তোমার সেই পূর্বজন্মের কোনো বিশিষ্ট মুহূর্তে একটা চৈত্য অনুভূতি যদি পেয়ে থাকো, এবং পরের জন্মের কোনো ঘটনাবলীর থেকে সেই পূর্বকাহিনীর যদি কোনো সূত্র মিলে যায় (যেমন, বিশেষ কোনো পোষাক দেখে, বা শ্রুতবাক্যের মতো কোনো বাক্য থেকে, বা আচারাদি ও পরিবেশ থেকে), তখন তুমি বলতে পারো, "ঠিক এমনি জীবন আমার ছিল"। কিন্তু কেউ যদি আস্ফালন করে যে তার বানরজন্ম থেকে পরবর্তী সব জন্মগুলির খবরই সে দিতে পারে বিশদভাবে, তাহলে নিশ্চয় জানবে তা বাজে কথা।

প্রশ্ন : আপনি কি বলেছিলেন যে চৈত্য কেমন দেহ নেবে তা দেখতে পাবার "সম্ভাবনা" তার থাকে ?

উত্তর : না, আমি বলেছি "দৈবাৎ" দেখতে পারে। দৈবাৎ ঘটনা আর সম্ভাবনা এক কথা নয়।

জীবনে বিরোধী শক্তিদের আক্রমণ সর্বক্ষণই চলেছে, তার ফল কখন কি হবে আগের থেকে জানা যায়না, কেবল সর্বোচ্চ চেতনাতে গিয়ে পৌঁছানো ছাড়া। তোমার এই মানব-চেতনা নিয়ে তার সীমার বাইরেকার চেতনার বিরোধীক্রিয়ার ফল কি হবে তা জানতে না পেরেই তুমি তাকে বলো দৈব দুর্ঘটনা। কিন্তু তা কোনো সম্ভাবনাও নয়, এমন কি অকারণ দৈবঘটনাও নয় ; তারও কিছু কারণ আছে, যেটা জানবার শক্তি তোমার নেই।

প্রশ্ন : স্বপ্নে কিন্তু আমি দেখেছি আমার পূর্বজন্মের সন্ন্যাসী-মূর্তি।

উত্তর ভারতের প্রচলিত ধারণা এই যে আধ্যাত্মিক জীবন চাইলে সন্ন্যাসী হতে হয়, হয়তো এমনি ধারণাটাই ঐরূপ সন্ন্যাসী-মূর্তি দেখার কারণ। আর যদিবা কোনো পূর্বজীবনে তাই ঘটে থাকে, তাও কিন্তু ঠিক গতজন্মের নয়। তারপর আরো কত জন্মই কেটে গেছে, কারণ পরে পরে দুই জন্মে কেউ একই দেশে জন্মায় না, এতে বিশেষ কাজ হয়না। কিন্তু ধরো যদি আগেকার মতো খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীর জীবন পেয়ে থাকো, তবে তার চেহারা ও পোষাক ও গায়ের রং সবই হবে আলাদা রকমের, অথচ তুমি দেখলে ভারতীয় সন্ন্যাসীর চেহারা।.....অবশ্য সম্ভব সব-কিছুই। বিশ্ব এমনভাবেই গড়া যে সম্ভাবনা সব রকমেরই হতে পারে ; কিন্তু একই দেশে প্রত্যেকবার জন্মানো জিনিসটা খুবই বিরল, যদি সেখানে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা বিশেষ কোনো কাজ করবার দরকার না থাকে ; আর সেটা তাহলে তার অজানা থাকার কথা নয়, কারণ তার চৈত্য নিশ্চয় পূর্ণ পরিণত হয়ে সেই বিশেষ কাজটির ভার নিয়ে প্রত্যেকবার একই দেশে জন্মাচ্ছে বা প্রারব্ধ কাজকে আরো অগ্রসর করছে।

সন্ন্যাসীর জীবন এখানকার অনেকেরই হয়ে থাকবে, কারণ এদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে আধ্যাত্মিক জীবন পেতে বা সিদ্ধিলাভ করতে হলে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাই চাই।

আর স্বপ্ন এমনও হয় যা প্রতীকের মতো ও পূর্বজ্ঞাপক ; কিন্তু গতজন্মের স্মৃতি খুব কম স্বপ্নেই আসতে পারে, কারণ সেরূপ স্বপ্ন দেখা যাবে কেবল চৈত্যচেতনা দিয়ে যা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব। তোমরা স্বপ্ন দেখে থাকো প্রাণের বা মনের চেতনার দ্বারা, চৈত্যের নয়। তাও অবশ্য হতে পারে, কিন্তু তা খুবই বিরল।

কখনো কখনো এমন স্বপ্নও দেখা যায় যাকে নিজের স্মৃতির জিনিস বলেই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয় ; মনের রচনা ভিতরের পর্দাতে প্রতিফলিত হয়ে ঐরূপ দৃশ্য এনে হাজির করে, যার মধ্যে তুমি হও একজন অভিনেতা।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রায়ই শোনা যায় যে এক গ্রামের শিশু ছেলেবেলাতেই বলে দিয়েছে যে আগেকার জন্মে সে অন্য এক কোন গ্রামে জন্মেছিল, তার বাপ মা কে ছিল ইত্যাদি। এ কথা সত্য কি ?

উত্তর : হাঁ, কিন্তু সেই সব শিশু শৈশবেই বা অতি বাল্যকালেই মারা গিয়েছিল, আগের জন্মে পূর্ণজীবন তারা লাভ করেনি। সে ক্ষেত্রে এমন হতে পারে।

প্রশ্ন : চৈত্যের উন্নতি হওয়া বলতে কি বোঝাবে ?

উত্তর তার একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে জড়ো করে দিব্যকেন্দ্রকে ঘিরে তার একটা নিরেট আকৃতি হবে।

চৈত্যের লক্ষ্য হলো তার মূল ভগবৎ-কেন্দ্রটিকে ঘিরে নিজস্ব একটা ব্যক্তিরূপ ফুটিয়ে তোলা। সাধারণ বাহ্য জীবনে যা কিছু অভিজ্ঞতা আসে (যদি তুমি যোগের পথ নিয়ে সর্বদা চেতন হয়ে না থাকো)—তা অভ্যন্তর সত্তাকে কোনো গঠন না দিয়েই পার হয়ে চলে যায়, কিন্তু চৈত্য সেগুলিকে যথাক্রমে সাজিয়ে রাখে। সে চায় ভগবানের দিকে একটা উপলব্ধি ফুটিয়ে তুলতে। তাই সে ওর পক্ষে অনুকূল যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে এক সূত্রে সম্পূর্ণ করে গেঁথে গেঁথে রাখে। যেমন মনে করো কেউ চায় একটা মহত্বের উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছতে—যে অবস্থায় তুমি সাধারণ মানুষের মতো কিছু করবেনা, তোমার সকল কাজই হবে মহৎ ও বীরের মতো, এমন কি সেজন্য কোনো দুঃসাহসের কাজ করতেও তুমি বিমুখ হবেনা, সেই উপলব্ধির জোরে তুমি নির্ভয়ে সকল বিপদের সম্মুখীন হবে। এইমাত্র তোমাদের বলেছিলাম যে রাজার দেহে প্রবেশ করে কি অভিজ্ঞতা মেলে তা বলব। রাজাও অন্যান্য সবাকার মতো একজন সাধারণ মানুষ, নয় কি? তার চেতনাটির কোনো আলাদা বিশেষত্ব নেই, কিন্তু তার প্রজাদের কাছে সে জগদীশ্বরের প্রতীক স্বরূপ হওয়াতে তাকে বাধ্য হয়ে এমন সব কাজ করতে হয় যা সাধারণ মানুষ কখনই করেনা। এ কথা আমি নিজের অভিজ্ঞতাতেই জানি; কোনো রাজাকে মারবার জন্যে যখন আকস্মিকভাবে একটা চেষ্টা হয়েছিল এবং তা ব্যর্থ হলো, তখনকার সময়ের ফটোগ্রাফ থেকেও আমি দেখেছি যে রাজা বিরাট মিছিল করে রাস্তায় বেরিয়েছে; হঠাৎ একজন তার দিকে ছুটে আসছে, তার কিছু মন্দ মতলব ছিল কিনা তা জানা গেল না, কিন্তু তাকে আটকে ফেলাতে রাজার কিছু ক্ষতি হলোনা; কিন্তু দেখা গেল যে রাজা এতে একটুও বিচলিত হলোনা, সমানে সে তেমনি হাসিমুখে স্থির হয়ে বসেই রইল; সবাই তাঁকে দেখতে পাচ্ছে, ইচ্ছা করলেই কেউ তাকে মারতে পারে। যতদূর জানি সেই রাজা নিশ্চয়ই খুব বীরপুরুষ নয়, কিন্তু যেহেতু সে রাজা অতএব তার ছুটে পালানো সাজে না, সেটা নিন্দনীয়। তাই বাহ্য চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখিয়ে তাকে শান্ত থাকতে হয়। রাজার জীবনে কি ধরনের শিক্ষা মেলে এতেই বোঝো।

রাণী এলিজাবেথের সম্বন্ধে এমনি এক সত্য কাহিনী আছে। মৃত্যুর পূর্বে যখন তিনি খুবই অসুস্থ, তখন শুল্কের বৃদ্ধি নিয়ে দেশে বিক্ষোভ ঘটেছে, বোধহয় ব্যবসায়ীরা তাদের পক্ষ থেকে আবেদন নিয়ে রাণীর কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। রাণী তখন একেবারে শয্যাগত, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। তথাপি জোর করে উঠে তিনি রাণীর পোষাক পরে' প্রতিনিধিকে ডাকতে বললেন। তাঁর সেবাকারীরা বললে, "আপনি অসম্ভব কাজ করছেন, এখনই মারা যাবেন।" রাণী ধীরভাবে বললেন, "এটা আগে হয়ে যাক, তারপরে মরার কথা"...রাজার জীবনের এমনি সব অভিজ্ঞতাও চৈত্য পেতে চায়।

এইসব ধরনের স্মৃতি থেকেই পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে ; লোকে তাদের গত জীবনের সম্বন্ধে এমনি সব কথাই বলতে পারে, এবং তাতে একদিক দিয়ে তাদের উন্নতিও হতে পারে। কিন্তু যখন বলে যে ক্রমে ক্রমে কেমন ক'রে তারা মস্ত লোক হয়ে উঠছে, কত আশ্চর্য ঘটনার ভিতর দিয়ে তাদের আসতে হয়েছে, সে কথাগুলো ঠিক নয়, কারণ এ জিনিস ঠিক ঐরূপ পর্যায়ক্রমে হয়না। চৈত্য তার অস্তিত্বের একটা ধারা দিয়ে চলে যাতে কতকগুলি শক্তি ও গুণ ইত্যাদি একে একে বিকাশ পায় ; সে দেখে যে কোন জিনিসের অভাব রয়েছে তার মধ্যে, তাই পরের জন্মে সে আগের জন্মের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বেছে নেয়, যাতে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণতর হয়ে ওঠে।

এক দেশে নানা ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝিতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ করি না, হৃদয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচীর পড়িয়া রহিয়াছে, অতিকষ্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাপি ভয় নাই ; এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার স্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে, হয় বর্ত্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নূতন ভাষার সৃষ্টি হইবে, মায়ের মন্দিরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার করিবে।

শ্রীঅরবিন্দ—'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

১০১

ভগবানের দৃষ্টিতে নিকট দূরও নেই আর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলেও কিছু নেই। এগুলি আছে কেবল তাঁর জগৎচিত্রকে একটা আনুপাতিক পার্থক্যের চেহারা (perspective) দেবার সুবিধার জন্য।

১০২

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টিতে এই কথাই সত্য যে সূর্য ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে, কিন্তু যুক্তিবুদ্ধির কাছে তা মিথ্যা। তার বিচারে এই কথাই সত্য যে পৃথিবী ঘুরছে সূর্যকে ঘিরে ; কিন্তু পরম চেতনার দৃষ্টিতে তাও মিথ্যা। সূর্যও ঘোরে না, আর পৃথিবীও ঘোরে না ; যা হয় তা শুধু সূর্য-চেতনা ও পৃথিবী-চেতনার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধের অদলবদল।

(মা এর পরে বহুক্ষণ নীরব থেকে বললেন)

অসম্ভব, এর উপর আমার কিছুই বলবার নেই।

প্রশ্ন : এর অর্থ তো এই হয় যে আমরা জড়জগৎ সম্বন্ধে সাধারণত যা অনুভব ক'রে থাকি তা মিথ্যা অনুভব ?

উত্তর : হাঁ, তা তো বটেই।

প্রশ্ন : তাহলে সত্য অনুভব কেমন হবে ?

উত্তর : সে তো ঐখানে বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : জগতের গাছ পাথর লোকজন—এ-সব জিনিস সত্যের বা অতিমানসের দৃষ্টিতে কেমন দেখায় ?

উত্তর : এমন দেখায় যা বলা যায় না। যখন তুমি সত্যের প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ও চেতনা পাও, যা নাকি সত্যের সরাসরি অভিব্যক্তি তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে তোমার বোধ আসবে যে একে ব্যক্ত করা যায় না, কারণ বাক্য জিনিসটাই তার থেকে আলাদা রাজ্যের ; যা-কিছু চিত্রণ, বর্ণন, তুলনা করণ, সমস্তই ভিন্ন রাজ্যের ব্যাপার।

আমার নিজের ঠিক ঐ মুশকিলই হয়েছিল (১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে) যখন আমি সত্যের সরাসরি ঐরূপ অভিব্যক্তির চেতনার মধ্যে ছিলাম। চেষ্টা করে তখন দেখলাম যা অনুভব করছি ও দেখছি তাকে বাক্যে গঠন দিতে পারি কিনা—তা অসম্ভবই হলো। কথা কিছুই জোগালো না। আর কথায় বলতে যাবা মাত্র সে চেতনা থেকে অন্য চেতনাতে নেবে গেলাম।

সে সময়ে এই সূর্য ও পৃথিবীর সূত্রটাও মনে এসেছিল। ঐ যে বলা হলো "চেতনার অদলবদল"—এ-কথা বলাও একটা চেতনা বদলের ক্রিয়া।

তাই মনে করি যে বলা কিছুই যায়না। বলবার শক্তিই নেই, বলতে যাওয়া মানে কাছাকাছি আনবার চেষ্টা করা মাত্র, যার কোনো দাম নেই।

প্রশ্ন কিন্তু যখন ঐ সত্য চেতনার মধ্যে যাওয়া যায় তখন কি একটা বিষয়গত অনুভূতি মাত্রই আসে, কিংবা বস্তুগুলোর চেহারাই আসলে পালটে যায় ?

উত্তর : হাঁ, সব কিছুই হয়—গোটা জগৎটাই পাল্টে যায়। সবই দেখা যায় আলাদা রকম। আর সেই অনুভূতিতে একটা কথা আমি নিশ্চিত ক'রে জেনেছি আর এখনও তা নিত্যই বুঝি : সত্য আর মিথ্যা এই দু'টি অবস্থা একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিত। বস্তুত যা হয়ে থাকে...হাঁ, তা হচ্ছে ঐ যাকে বলা হলো "চেতনার অদলবদল", অর্থাৎ তুমি এই চেতনাতে থাকলে কিংবা ঐ চেতনাতে থাকলে, তার জন্য কোথাও নড়ে যেতে হবে না।

আমরা নড়ে যাবার কথা ব্যবহার করতে বাধ্য হই, কারণ সব কিছুই গতিমান, সমস্তই নড়ছে, কিন্তু এই চেতনার অদলবদল কোনো নড়াচড়ার ব্যাপার নয়। সুতরাং কেমন ক'রে একে বর্ণনা দিয়ে বোঝাবে ?

যদি বলি, "এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় গেলাম", বা "অবস্থান্তরে গিয়ে পড়লাম" —অমনি সেই গতিক্রিয়ার কথাই এসে গেল...বাক্যমাত্রের ধারাই এইরূপ, তাহলে কেমন ক'রে কি বলি ?...

এমন কি গতকালও সেই অনুভূতি এমন জাগ্রত ও জোরালো ছিল যে বিকৃত ও বিরূপ চেতনার স্থানে সেই সত্য চেতনাতে যেতে কোনোরূপ গতির দরকার হয়নি। অর্থাৎ বিকৃতি ও মিথ্যার জগতের যে সব স্পন্দন তাতে অবস্থান করার পরিবর্তে সত্য ও মৌনিক চেতনার

স্পন্দনের মধ্যে অবস্থান করার শক্তি থাকলে সরাসরি ঐ সত্যের স্পন্দনেই পরিণত হওয়া যায়। বিকৃতি ও মিথ্যার স্পন্দনের মধ্যে অবস্থান করলে তাতে বিপদ ও বিনাশ অনিবার্য, কিন্তু কেন্দ্রে যদি থাকে সত্য স্পন্দনের ও তার অভিব্যক্তির চেতনা, তাহলে সেই সত্যের স্পন্দন মিথ্যার স্পন্দনগুলিকে খানিয়ে দিতে পারবেই ; এবং তার বাহ্য লক্ষণ হবে সকল বিঘ্ন বিপদ ও বিনাশের নিবারণ।

তাই এই বোধটাই ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে জগতের পরিবর্তন আনতে কেবল সত্যই হলো একমাত্র উপায়। রূপান্তর ঘটাবার যার যা কিছু বিলম্বিত প্রণালী সবই বাঁকা রেখার স্পর্শকের মতো (অর্থাৎ কাছাকাছি হয়ে ছুঁতে আসবে কিন্তু কখনই মিলবে না), সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাই হবে, সত্যের স্পন্দনই স্থান অধিকার করবে।

এর আংশিক প্রমাণ তুমি পেতে পারো। কিন্তু আংশিক হওয়াতে তা প্রমাণই নয় ; কারণ সাধারণ ক্ষেত্রে যা ঘটতে দেখা গেল তাতে যা বোঝালো—তার এরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে তুমি অনায়াসেই বলতে পারো যে সর্বনাশ কিছু হবে না সে তো জানাই ছিল, বিপদের ও ধ্বংসের আশংকা কেটেই যাবার কথা, কারণ ওর পিছনে কাজ করছে "নিয়তি"। ঐটি ছাড়া যে অন্য কিছু কারণ আছে, তার প্রমাণ কি ? আর কিছু সম্ভব নয়।

যেমনি তিতিক্ষের কথা ব্যক্ত করতে যাবে অমনি তোমাকে মনের দেউড়ির ভিতর দিয়ে মাথা গলাতে হবে, আর সেখানে রয়েছে মনের ঐ ধরনের যুক্তিবিচার যা দারুণ ভয়ংকর, কারণ সেই তখন সর্বশক্তিমান ; সে বলবে, যখন সকল কিছুর অস্তিত্ব আপনা হতেই রয়ে গেছে অনাদিকাল থেকে, তখন তাহলে এর মধ্যে একটার স্থানে অন্যটা আসবে, এ কেমন ক'রে হতে পারে ?...এখানে কি কখনো কোনো ব্যাপার "বদ্‌লে যেতে পারে ?

কথিত আছে (আর শ্রীঅরবিন্দ সে কথা নিজেই এখানে বলছেন) যে পরমতম চেতনার কাছে কালও নেই, অতীতও নেই, গতিধারাও নেই—যা বর্তমান তা বরাবরই বর্তমান। আমরা তাকে তর্জমা করে বলি "শাশ্বত কাল অবধি"—সেটা হলো মূর্খের মতো কথা, কারণ সবই চিরবর্তমান ; যখন সবই রয়েছে, তখন বাস্ (না আপন বাহু দুটি আবদ্ধ করলেন) চুকেই গেল কথা, কোনো কিছু আর তাহলে করবার নেই। এই ভাব নিলে, অর্থাৎ এরূপ ধারাতে বলতে থাকলে (কারণ এটা বলবারই একটা ধারা মাত্র) উন্নয়নের প্রশ্নও নস্যাৎ হয়ে যায়, বিবর্তনের প্রশ্নও নস্যাৎ হয়ে যায়, আর...আর তোমাকেও তাই বলা হবে, "তুমি যে উন্নয়নের চেষ্টা করবে সেটাও নিয়তিরই কাজের মধ্যে",—হাঁ, এ-সবই হলো আলংকারিক বাক্‌চাতুরী।

আর এ কথাও জেনো যে এইরূপ বলা হলো মিনিট খানেকের অনুভূতি থেকে বলা, সমগ্র অনুভূতি নয়। একটা মুহূর্ত আগে যখন অমনি বোধ হয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ জিনিস নয়, আংশিক মাত্র। এ মাত্র একটি দিকের কথা, সর্বদিকের নয়। শাশ্বত চেতনায় যে সত্য তা ওর চেয়ে অনেক বেশি গভীর আর অনেক বেশি বাক্যাতীত। যখন কেউ সাধারণ

চেতনার গণ্ডী ছাড়িয়ে সবে প্রথম বেরিয়ে আসে তখন তার ঐরূপ ধোঁয়া-ধোঁয়াই ঠেকতে থাকে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ জিনিস নয়। উপরোক্ত তারিখে যখন আমার ঐ সূত্রটির কথা স্মরণে এসেছিল, তখন হঠাৎ একটা ঝলকের মতো আমার ঐরূপ কথাই মনে হয়েছিল, যা দুইএর মাঝামাঝি একটা বিরোধী ভাব কিন্তু তাই সবটুকু কথা নিশ্চয়ই নয়, আরো অনেক কিছু বাকী ছিল।

যা আরো কিছু রয়েছে তা আমাদের বোধসীমার অতীত, কেবল আমরা যতটা পর্যন্ত বুঝতে পারি তার মধ্যেই তা ভর্ৎসনা হয়ে আসে। আর সে কথা কেউ প্রকাশ করতেই পারে না, যেহেতু তা বক্তব্যের সীমার বাইরে।

একথায় সারমর্ম হলো এই যে আমাদের সাধারণ চেতনার কাছে যা-কিছু বিকৃত, ভ্রান্ত, অসত্য ও মিথ্যা, তা মূলতঃ সত্য চেতনার কাছে সমস্তই সত্য। কিন্তু কেমন ভাবে সত্য? কিন্তু শুধু ঐ কথাটাই কথায় বলতে পারি, যেহেতু কথাও মিথ্যার রাজ্যের অন্তর্গত।

প্রশ্ন: তবে জগতের যে জড়ত্ব তাই কি ঐ চেতনার দ্বারা ঘুচে যাবে, না তার চেহারাই পাল্টে যাবে?...কিংবা জগৎটাই হয়ে যাবে অন্যরূপ?

উত্তর কথাটি একটু বোঝা চাই। আমরা যাকে "জড়ত্ব" বলি তা শুধু একটা মিথ্যা চেহারা নয়। যদিও ঐ ধরনেরই কিছু বটে, কিন্তু...

যেমন ধরো সূত্রাবলীর উপরোক্ত সূত্রটি, ওকে বিষয়গত কথা বলেই শেষ করা যায়, কিন্তু শুধু তাই বললেই সেটা সত্য হবে না—একেবারেই না। কারণ তাহলে তো প্রলয় এসে গেল, নির্বাণ এসে গেল। কিন্তু শুধু নির্বাণই তো নেই এখানে, বাস্তবধর্মী বস্তুও যে রয়েছে, তা যে মিথ্যা নয় তবে কেমন ক'রে বলা যায়?

এ সত্য আমি বহুবারই বোধ করেছি, বহু বহুবার—কেবল চকিত দৃষ্টিতে নয়—নিতান্ত বাস্তবভাবে...(কিন্তু কেমন ক'রে বোঝাবো, বাক্যও যে প্রতারণা করে)...অনন্য ঐক্য চেতনার মাঝেও বস্তুর বস্তুত্বের স্থান আছে, এটা ওটাকে খণ্ডন করেনা। পৃথক দেখার মতো একটা বোধ আসে, তুমি যে তুমি নও এমন নয়, কিন্তু ওরই মধ্যে একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টি। তাই তো তোমাদের বলছিলাম, কথা যাই বলা হোক সব ভুয়ো, খানিকটা বোকামি মাত্র, কথা কেবল মিথ্যা জগৎকেই দেখায়...তবে হাঁ, শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন "ঐক্যের মাঝে বহুত্বের বোধ", এতে একটু কিছু বোঝায়, যেমন লোকে আপন একটি সত্তাতে আভ্যন্তরীণ বহুত্ব বোধ করে অনেকটা সেইরকম।...আমার এখন আর "আমি" বোধটা নেই, এমন কি দেহ সম্পর্কেও না, কিন্তু তাতে এর বস্তুধর্মী সম্বন্ধগুলি বোধ করতে আটকায় না—হাঁ, এখানে শ্রীঅরবিন্দের ঐ কথাটাই এসে পড়ছে, "পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের চেতনা সম্পর্কের অদলবদল"; (হেসে) এমনি বলাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো। এ হলো চেতনারই সম্বন্ধ।

"আমার" সঙ্গে "অন্যদের" সম্বন্ধ নয়—ও কথা বাদ দাও—কিন্তু তোমার একই সত্তার বিভিন্ন অংশের পরস্পরের মধ্যে চেতনার যেরূপ সম্বন্ধ থাকে সেইরকম বলতে পারো। এতে অংশগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা বাস্তব সম্পর্ক বোঝাবে।

(বহুক্ষণ নীরব থেকে)

ঐ সোজাসুজি দৃষ্টান্তের কথাটায় আসা যাক, জগতে দুর্দৈব ঘটার সম্ভাবনা ফেঁসে যাওয়া সম্পর্কে। এটা সহজেই ধারণা করা যায় যে ঋত-চেতনার প্রভাবধারা বর্তে আছে "শাশ্বত কালের জন্য", আর নতুন জিনিস বলতে কোনো কিছুই নেই, কিন্তু তার দ্বারাই যে বহু দুর্দৈব নিবারিত হচ্ছে এ কথা যুক্তিগ্রাহ্য (অতএব সেই ঋত-চেতনা যে অন্যবিধ চেতনা অপেক্ষা বলশালী এ-কথা স্বীকার্য)। আর নিজেকে তুমি যদি ভগবানের স্থানে বসিয়ে দেখ, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে যে এই নিয়ে নানারূপ পরীক্ষানিরীক্ষা ক'রে তিনি আমোদ পান, দেখতে চান যে কি ভাবে কোনটা কাজ করে(এ হলো একটা স্বতন্ত্র দিকের কথা, তাই বলে সর্বজ্ঞ চেতনা শাশ্বত কালের জন্য সব কিছুই বিদিত আছে এ দিকটা চাপা পড়ে না, যদিও বাক্য মাত্রই অপূর্ণ তবু বলছি) ; কিন্তু তথাপি ভগবৎ প্রভাবে যে দুর্দৈব নিবারিত হচ্ছে এ-কথা অপ্রমাণিত হলো না ; বলা যায় যে সত্য-চেতনার ক্রিয়াতে অসত্য-চেতনার ক্রিয়া থেমে গেল।

আবার মনে হয় যে এই ব্যাপারই নিত্য হয়ে থাকে—যা কল্পনা করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি। যতবার তোমরা রোগ থেকে আরোগ্য হচ্ছ, যতবার মারাত্মক ফাঁড়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাচ্ছ, যতবার পার্থিব দুর্দৈব আসন্ন হয়ে তা কেটে যাচ্ছে, সমস্তই হচ্ছে অসঙ্গতির স্পন্দনধারার উপর সুসঙ্গতির স্পন্দনধারার ক্রিয়াপ্রভাব। তাই বিশ্বাসী লোকে যখন বলে "ভগবানের কৃপাতে এটি হলো" তখন তারা নেহাৎ মিথ্যা বলেনা।

এখানে বাস্তবে যা ঘটে সেই কথাই আমি বললাম, সত্যের সঙ্গতির স্পন্দনধারাই যে ঐ সব কাজ করে (কেন করে সে প্রশ্ন উঠছেনা, বৈজ্ঞানিক ধরনেই বলছি যেমন ঘটেছে তাই)—এ সম্বন্ধে আমার বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

প্রশ্ন : তাহলে ঐ উপায়েই কি জগতের রূপান্তরও আসবে ?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : সঙ্গতির স্পন্দনগুলি একেই উত্তরোত্তর স্থান অধিকার করতে থাকবে ?

উত্তর : হাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই।

আর এমন কি এদিক থেকেও আমি দেখেছি...এই যে এক সাধারণ ধারণা রয়েছে

যে দিব্যচেতনা কর্তৃক রূপান্তরের অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে দেখা দেবে প্রথমে দেহেরই উপরে, এটা অর্থহীন এবং এ হলো পরের কথা ; যেখানে সর্বাধিক প্রস্তুতি থাকাতে সর্বাপেক্ষা সহজে ও সম্পূর্ণরূপে তা হতে পারবে সেখানেই সেটি হবে,—এই জমাট করা দেহকোষগুলির উপরেই (নিজের দেহকে ইঙ্গিত ক'রে) হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। হয়তো এটা যেমন আছে তেমনই থেকে যাবে অনেক কাল অবধি, যদিও এর বোধশক্তি ও গ্রহিষ্ণুতা অসাধারণ রকমের হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এই দেহগত চেতনা ও অনুভূতিশক্তি যদিও তখন পাশাপাশি অন্য সকলের অপেক্ষা অনেকগুণ বেড়ে যায়, আর তাদের বেলাতে ভগবৎ কৃপার ফলে যে অনুভূতি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যই আসে সেই অনুভূতি এর বেলাতে সহজে নিত্যই বর্তমান থাকে—যাতে প্রমাণ হয় যে ঋতচেতনা সরাসরি এই কোষসমষ্টির উপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তথাপি বাস্তব কার্যক্ষেত্রে এ স্পন্দনের পরিবর্তে ঐ স্পন্দনের কাজ দেখা দেবে মাত্র সেইখানেই যেখানে তার সব চেয়ে ভালোরূপ সার্থকতা ঘটবে।

এ আমি খুব স্পষ্ট ভাবেই জেনেছি ; যতক্ষণ অহংবোধ রয়েছে ততক্ষণ এটা জানা যায় না, কারণ দেহগত অহংএর একটা নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে যা অহং ঘুচলে তবে ঘুচে যায় এবং তখন বোঝা যায় যে সত্যের স্পন্দনের অভিব্যক্তি কোনো ব্যক্তিসত্তার উপর নির্ভর করে না (কোনো মানুষের বা জাতির বা এমন কি প্রকৃতির বেলাতেও এই কথা খাটে, যেমন পশু, উদ্ভিদ ইত্যাদিও)—কিন্তু তা নির্ভর করে কোষসমষ্টির বা জড়সমষ্টির একরূপ বিশেষ অবস্থার উপর, যা রূপান্তরের পক্ষে ঠিক উপযোগী ; "রূপান্তর" বলা এখানে ঠিক নয়, বলা উচিত মিথ্যার স্পন্দনের স্থানে সত্যের স্পন্দনের স্থাপনা। এবং তাও আবার সামগ্রিকভাবে হয় না (এখানে একটু, সেখানে একটু, এখানে একরকম, ওখানে অন্যরকম, এমনও হতে পারে) ; অর্থাৎ সেখানে যখন এমন অবস্থা আসে যাতে এক ধরনের স্ফীতির অবতারণা হয়—সেটা গ্রহিষ্ণুতা আসার স্ফীতি—তখনই জিনিসটা ঘটতে পারে।

দুঃখের বিষয় কথাগুলো সবই বাহ্য জগতের অন্তর্গত, যা পূর্বেই বলেছি।

(নীরব থেকে)

এর মধ্যে সর্বক্ষণই আমি এই অনুভূতি পেয়েছি—স্পষ্ট দৃষ্টিতে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জেনেছি—যাদের অনুভূতি হতেই এই দৃঢ় প্রত্যয় এসেছে যে এই দুই রকমের স্পন্দন এই ভাবেই হয়ে থাকে (নিজের হাতের উপর হাত রেখে দেখালেন)—সর্বদাই এই, সর্বদাই এই।

যখন অনেকখানি চুকে পড়ে তখন তা এতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তা অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমার খুব জোর ধারণা এই যে—এ কাজ সর্বক্ষণই চলছে, সর্বত্র ও সর্বক্ষণই হচ্ছে বিন্দু বিন্দু রূপে (আঙুল ঠুকে বিন্দুপাতের ইঙ্গিত), অতি সূক্ষ্মতম আকারে ; আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে তা দৃশ্যমান হয়ে পড়ে সূক্ষ্মদৃষ্টির কাছে—একরূপ সমুজ্জ্বল জ্যোতিবিকাশের মতো—ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না, কিন্তু সেখানে তার

অনুপ্রবেশ এতটাই হয় যে তাকে অলৌকিক বলে বোধ হতে থাকে। কিন্তু সে প্রকার ছাড়াও এ-জিনিস খুব সূক্ষ্মভাবে সর্বক্ষণই ঘটছে বিন্দু বিন্দু রূপে (পুনরায় আঙুল ঠুকে ইঙ্গিত) ...মিথ্যার স্থান এসে দখল করছে এই আলো, অসত্যের অন্ধকারের স্থানে সত্যের আলোকপাত নিত্যই ঘটে চলেছে।

এই দিব্য স্পন্দনধারা আমি দেখতে পাই ও অনুভব করি, যেন প্রজ্বলন্ত আগুনের মতো ; বৈদিক ঋষিরা যে পুনঃ পুনঃ অগ্নিশিখার কথা বলতেন তা নিশ্চয় এই জিনিসটাকেই বোঝাতে—মানব চেতনাতে, জড়ের মধ্যে, সর্বত্রই অগ্নিশিখার কথা। নিশ্চয় সে কোনো উপরকার অগ্নির এমনি প্রজ্বলন্ত স্পন্দনধারা।

এমন কি আমার আধ্যাত্মিক ক্রিয়া যখন কেন্দ্রীভূত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠত তখন এই দেহেতেও আমি প্রবল জ্বরের মতো উত্তাপ অনুভব করতাম।

দুই তিন রাত্রি আগে এমনি কিছু ব্যাপারই ঘটেছিল ; উচ্চতম শক্তিস্তর অবতরণ ঘটেছিল প্রবল বেগে...এবং সেই জিনিসই তো ঘটছে সর্বত্র সর্বক্ষণের জন্য। আর তা যদি ঘটে বৃহৎ একটা জড়পিণ্ডের উপর, তখন তাকেই দেখায় অলৌকিক, কিন্তু তা গোটা পৃথিবীর জন্যই অলৌকিক।

সে স্থলে দৃঢ়পদে দাঁড়াতে পারা চাই, কারণ ওর কিছু ফল হবার রয়েছে, যা খুব কম লোকেই সোজা দাঁড়িয়ে থেকে অনুভবের মধ্যে নিতে পারে, কারণ তার জন্য যে ব্যাপক ও পূর্ণ নীরবতা ও প্রশান্তির ভিত্তি তৈরি থাকা দরকার তা তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। আমি বহু বহুবার এ কথার পুনরুক্তি করেছি : "প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব আছে ; থাকতে হবে শুধু শান্ত স্তব্ধ হয়ে, আরো শান্ত, আরো বেশি শান্ত হওয়া চাই, আর নিজের মাথা দিয়ে কোনো জবাব খুঁজবে না, কারণ সে জবাব মিলবে না। শুধু থেকে যাবে চুপচাপ একেবারে শান্ত ও নীরব হয়ে—সম্পূর্ণরূপে স্থির, স্তব্ধ, প্রশান্ত। শুধু এই-ই হলো জবাব।"

এ যে উদ্ধারের পন্থা তা বলছি না, কিন্তু সকল প্রশ্নের সমুচিত জবাব হলো এটাই : সর্বদাই থেকে যাবে স্থির ও শান্ত হয়ে...

তাহলে অবশেষে একটা কিছু ঘটবে। ২৫-৩-১৯৬৪

১০৩

বিবেকানন্দ সন্ন্যাসের সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন যে ভারতের ইতিহাসে জনক রাজা মাত্র একটিই ছিলেন। কিন্তু তা ঠিক নয়, জনক একটি ব্যক্তিমাত্রের নাম নয়, একটা বিশেষ আদর্শের জয়ঘোষণা করতে আত্মজয়ী রাজাদের বংশের সকলকেই ঐ নামে বলা হতো।

১০৪

লক্ষ লক্ষ গৈরিকবাস সন্ন্যাসীদের মধ্যে ক'জন পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেছে? খুব অল্প কয়েকজন মাত্রই সিদ্ধি অর্জন করে, বাকী অধিকাংশ তার কাছাকাছি মাত্রই যেতে পারে, তাতেই ঐরূপ আদর্শের যা কিছু মূল্য।

১০৫

বহু শত সন্ন্যাসী সিদ্ধিলাভ করেছিল, কারণ সন্ন্যাস ধর্মের প্রচার ছিল খুব বেশি, তাই বহু লোকেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতো; জনকের মতো মুক্ত জীবনের আদর্শেরও যদি তেমনি বহুল প্রচার হতো তাহলে জনকও অনেক শত তৈরি হতে পারতো।

১০৬

সন্ন্যাসের একটা পরিচিত বেশ থাকে ও কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ থাকে, তাতেই লোকে সহজে তাকে সন্ন্যাসী বলে চিনতে পারে; কিন্তু মুক্তচেতা জনক কখনো নিজেকে কোনো বেশ দিয়ে জাহির করেন না, সে থাকে নিতান্ত সাধারণ বেশে; তাই তার সামনে গিয়ে নারদ পর্যন্ত অন্ধ হয়েছিলেন।

১০৭

জগতে সাধারণ মানুষের মতো হয়ে সাধারণ জীবনে থেকে মুক্তচিত্ত হতে পারা খুব কঠিন বটে; কিন্তু কঠিন বলেই তার জন্য চেষ্টা ক'রে তাকে অর্জন করতে হবে।

এগুলি তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।

প্রশ্ন কথা স্বতঃসিদ্ধ হলেও কাজটা খুবই কঠিন।

উত্তর: বন্ধন থেকে মুক্তি মানে বন্ধনের সম্পর্ক ছেড়ে দূরে পালানো নয়, তাই নয় কি? যারা বলে সন্ন্যাস নিয়েছি তারা কেবল নিজেরাই পালায় না, কিন্তু অপর সকলকে সতর্ক ক'রে দেয় যাতে ওদিকে কেউ না ঘেঁসে।

এটাই তো আমার কাছে সোজা প্রমাণ বলে মনে হয় যে তুমি যখন কোনো কিছুকে এড়াতে নিজেই তার থেকে দূরে পালাও, তার মানে তুমি এখনও সেই আগের স্তরেই রয়ে গেছ, তার থেকে উপরে উঠতে পারোনি। চাপা দেওয়া, কমিয়ে দেওয়া, ছেড়ে পালানো, এতে কখনই তোমাকে মুক্তি দিতে পারেনা। মুক্তিকে উপলব্ধি করতে হয় সমগ্র জীবনে, সকল বেদনার মধ্যে।

আমি এই নিয়ে পুরোপুরি ভেবে দেখেছি, নিছক পার্থিবের স্তরেই...সকল রকমের সম্ভাব্য দোষের উপরে ওঠার জন্য সাধারণত চেষ্টা করা হয় সেই দোষের সুযোগমাত্রকে চাপা দিয়ে। যেমন, তুমি যদি বাজে কথা বলবনা বলে স্থির করো তাহলে তখন কথা বলাই বন্ধ ক'রে দাও . যারা নীরব থাকার ব্রত নেয় তারা ভাবে যে এতে তারা বাক্‌সংযম করছে —কিন্তু তা তো ঠিক হয় না। তারা শুধু কথা বলার সুযোগ চাপা দেয়, কাজেই তখন বাজে কথা বলা বন্ধ থাকে। খাওয়া সম্বন্ধেও সেই কথা যেটুকু খাওয়া দরকার সেটুকু খেতে হবে। আমরা এখনকার পরিবর্তিত যুগে আগের মতো খাওয়া ও জিনিসের লেনদেন করা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পার্থিব রীতি অনুসরণ করতে চাইনা ; কিন্তু তাই বলে এমন অবস্থা এখনও আমরা পাইনি যাতে কিছু না খেলেও দেহরক্ষা করা যাবে (যদিও অনেকটাই তফাৎ হয়ে গেছে, এখন এমন চেষ্টা চলছে যাতে অনেকটা খাওয়ার বদলে এমন খাদ্য নিলেই যার একটুর মধ্যেই পুষ্টির প্রয়োজনের সমস্ত সারবস্তু মিলে যাবে)—কিন্তু সাধারণ প্রবণতা অনশনের দিকে, এটা ভুল।

পাছে আমরা কাজে ভুল করি করি, তাই কোনো কাজই না করলাম ; পাছে ভুল কথা বলে ফেলি, তাই কোনো কথাই না বললাম ; পাছে ভোজনলোভী হয়ে পড়ি, তাই খাওয়াই ছেড়ে দিলাম—এর নাম মুক্তি নয়, কেবল কাজগুলিকে বাদ দেওয়া ; আর এর স্বাভাবিক পরিণতি হবে নির্বাণ। কিন্তু নির্বাণই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হতো, তাহলে এতদিনে নির্বাণ ছাড়া আর কিছুই থাকত না। কিন্তু দেখাই যাচ্ছে যে তিনি যাবতীয় বিপরীতকে একত্রে জড়ো করেছেন, আর এতেই তাঁর সব মিলিয়ে একটা সমগ্রতা গড়ে তোলার সূত্রপাত হচ্ছে। অতএব কেউ যদি মনে করে যে নেতি নেতি ভাবটাও তাঁর এই নানা বৈচিত্র্যের একটা দিক এবং তার জন্যেই সে উদ্দিষ্ট, তাহলে অবশ্যই তা সে করতে পারে। তথাপি সেও একরকম সংকীর্ণতা। আর তাঁকে পাবার এটাই যে একমাত্র রাস্তা এমন কথা হতে পারেনা।

বহু প্রাচীন ধারণা থেকেই হোক কিংবা অভাব অক্ষমতা হতেই হোক—সাধনার ক্ষেত্রে সর্বত্র এই ভাবটা এসে গেছে যে সব কিছুই কমাও, নিজের প্রয়োজন কমাও, নিজের জীবনের কাজকর্ম কমাও, কথা বলা কমাও, খাওয়া কমাও, তৎপরতা কমাও, সমস্তই গুটিয়ে ছোটো ক'রে আনো। যেন কোনো ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনামাত্র না থাকে, এই আশঙ্কা নিয়ে সব কিছুকেই যথাসাধ্য দাবিয়ে রাখো। এ কিন্তু ঠিক প্রতিকার নয়। তবে অন্য পন্থাটা কঠিনই বটে, খুবই বেশিরকম কঠিন।

(নীরব থেকে)

তা নয়, এ প্রশ্নের সঠিক সমাধান হবে এই যে আমি যা কিছুই করছি সমস্তই ভগবৎ প্রেরণাতে, কথা বলছি তাও, খাবার খাচ্ছি তাও, সবই তাই। এ-অবস্থায় আসা কঠিন তো

বটেই, কারণ এ কথা ভাবতে গেলেই নিজের প্রেরণাকে ভগবৎ প্রেরণা বলে ভুল হয়ে যায়।

বোধ করি ত্যাগের আদর্শ যাঁরা বাৎলেছিলেন তাঁদের এই ছিল উদ্দেশ্য বাইরের থেকে বা নীচের দিক থেকে যা কিছু আসছে সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে দেওয়া, যাতে উপরের কিছু নেমে এলে তাকে গ্রহণ করবার জায়গা তৈরি থাকে। কিন্তু সমবেত মানুষদের দিক থেকে দেখলে এতে অনেক সহস্র বছর লেগে যাবে। ব্যক্তিগত ভাবে এটা সম্ভব; কিন্তু তাহলে সত্যের প্রেরণা লাভের আশ্বাসটি বরাবর বজায় রাখা চাই—"পূর্ণ মুক্তি" লাভের আশ্বাস নয়; এই আশ্বাস থাকবে যাতে ভগবানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে একাত্ম হয়ে যাই, অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হবে, তিনি যে কাজ চান সেই কাজই আমার হবে, তাঁর জন্যেই আমার অস্তিত্ব আর তাঁর মধ্যেই আমি থাকব। এই যদি আশ্বাস হয় তখন ত্যাগের পথ নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাতে নিজেকে সকলের থেকেই বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে হবে। তাতে কি প্রকৃত পূর্ণ সিদ্ধি মেলে?...আমার তা মনে হয় না।

আমি যে কি করতে চলেছি তা প্রকাশ্যভাবে সকলকে জানিয়ে দেওয়াতে অনেক সুবিধা আছে। অনেকে হয়তো আপত্তি করতে পারে, ভুল বুঝতে পারে, বিরোধিতা করতে পারে, কিন্তু সাধারণে তোমার কাছে কি "প্রত্যাশা" করবে তা সবাই জানতে পারলে এ সব বাধাগুলো অনেকটা খণ্ডন হয়ে যায়। বোধহয় গৈরিক বেশ নেবার এটাই ছিল উদ্দেশ্য, সকলকে জানিয়ে দেওয়া। তাতে কেউ হয়তো বিদ্রূপ করলো, কেউবা কিছু মন্দ ভাবলো কিন্তু অন্তত বাকী সকলকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে এটা অন্য রকম জিনিস, এতে হাত দিওনা, এদিকে এসো না, এ তোমাদের জন্যে নয়।

কেন জানিনা, আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে এর মধ্যে কিছু বড়াই করা আছে—সকলের বেলাতে অবশ্য নয়, কিন্তু এ যেন লোককে ডেকে ডেকে বলা "দেখ আমি লোকটা কে বটে।" এতে একদিক দিয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু অসুবিধাও যথেষ্ট।

যাই কেন বলো, তবু এ এক রকমের ছেলেমানুষী।

এ সবকিছুই হচ্ছে পন্থা, উপায়, সিঁড়িতে ওঠার ধাপ, কিন্তু ..আসল মুক্তি মানে সব কিছু হতেই মুক্তি, এমন কি সবরকম পদ্ধতি হতেও মুক্তি।

(নীরব থেকে)

ও সব হলো বিধিনিষেধের কথা, সব কিছু কমিয়ে ছোটো ক'রে আনার কথা, কিন্তু আসল কাজটি হলো নিজেকে খুলে ধরা, বিস্তার করে ধরা, সমগ্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়া।

যখন তুমি হাঁটাই শুরু করো, নিজেকে কমিয়ে কমিয়ে ছোটো ক'রে আনো, তাতে কেবল সেই ভয়টাই তোমার বন্ধ হয় যাতে নিজেকে হারিয়ে না ফেল,—নিজেকে নিরেট ও

মজবুত ক'রে নিলে। কিন্তু ওর বদলে যদি নিজেকে প্রসারিত ক'রে দেবার এ পথ বেছে নাও—যতটা পারো নিজেকে উদার উন্মুক্ত ক'রে দাও, তাহলে হারাবার প্রশ্নই আর থাকে না।

এ পথ অবশ্য খুব কঠিনই বটে।

প্রশ্ন ঠিকই বলেছেন, এখনকার বাহ্য জগতের এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সর্বক্ষণ ডুবে থেকে কেমন ক'রে ওটা সম্ভব হয়? যেমন ধরুন, আমি যদি এখানকার পাশ্চাত্য জগতের লোকদের কথা ভেবে দেখতে যাই; তারা নিতাই ব্যস্ত রয়েছে কাজের ভিড়ে, লোকদের সঙ্গে অনবরত কারবার করতে হচ্ছে, অনবরতই টেলিফোন হচ্ছে, বিরামহীনভাবে যে সকল প্রভাবগুলো তাদের উপর এসে পড়ছে তার থেকে নিজেকে বাঁচাবার এক মিনিটের ফুরসৎও তাদের নেই—এমন অবস্থাতে কেমন করে ওগুলো সম্ভব হয়?

উত্তর: সে অবস্থায় তাকেই নেনে নিতে হবে।

এ হলো অন্য সীমান্তের কথা...এই সকল কারণেই দরকার হয় নিরালা আশ্রমে, মঠে, গুহাতে, বনে চলে যাওয়া, অতিব্যস্ততার কবল এড়াতে। অথচ দু, এক হাজার বছরের আগে এই ধরনের আশ্রমস্থল যত বেশি ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক কম আছে। বোধকরি বোঝবার ভুলের জন্যই সেগুলি টিঁকতে পারেনি।

যেখানে অতিরিক্ত অস্থিরতা সেখানে তার উল্টো ঠিক তেমনি অতিরিক্ত স্থিরতারই দরকার।

প্রশ্ন: কিন্তু সাধারণ অবস্থাতে কি করণীয় তা জানবার কি উপায়?

উত্তর: অর্থাৎ যাতে কোনো দিকেরই অতিরিক্ততার চাপে না পড়তে হয়?

প্রশ্ন: হাঁ, যাতে সহজ ভাবে মুক্ত হতে পারা যায়।

উত্তর: বলি তোমাদের, এ আশ্রম যে তারই জন্যে হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যই এর ছিল। ফ্রান্সে থাকতে আমি কেবলই ভাবতাম, "নিজেকে একটু খুঁজে দেখার সময় মেলে কেমন করে? নিজেকে মুক্ত করবার উপায়টা ভাবতে পারার মতো সময় সুযোগ হতে পারে কেমন করে?" আমি এমন একটা জায়গা তৈরি করার কথা ভাবলাম যেখানে জীবনের পার্থিব প্রয়োজনগুলো দরকারমতো পূরণ হয়ে যাবে, সুতরাং কেউ যদি বাস্তবিক নিজেকে মুক্ত করতে চায় তাহলে সেখানে থেকে নির্বিঘ্নে তার চেষ্টা করতে পারবে। সেই ভাব নিয়েই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল—এর আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এ এমন জায়গা যেখানে জীবনরক্ষার সকল ব্যবস্থা করা থাকাতে লোকে নিশ্চিন্তে সদ্‌বস্তু চিন্তার সময় পাবে।

(মা একটু হেসে বললেন) কিন্তু মানুষের প্রকৃতিটাই এমন যে আশ্পৃহার বদলে এসে গেছে আলস্য (সকলের পক্ষে নয়, কিন্তু সাধারণপক্ষে তাই), আর স্বাধীনতার স্থানে স্বেচ্ছাচার বা ভ্রষ্টাচার ; যার থেকে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে মানবজাতিকে এক চোট নির্মম শাস্তিভোগের পালা কাটিয়ে উঠতে হবে, তবেই তারা আরো আন্তরিকভাবে ঐ সকল জিনিসের বশে চলা থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে।

প্রথম কাজ শুরু করতে হবে এই ভাবে একটা জায়গা ঠিক ক'রে নেওয়া যেখানে দুঁদণ্ড বসে একাগ্রতার মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া যায়, নিজেকে আবিষ্কার করা যায়, কোনো পার্থিব বিষয়ে অবহিত না থেকে নিজেকে নিজের প্রকৃত জীবনে অনুভব করা যায়। এই হবে প্রথম আশ্পৃহা (অন্ততপক্ষে এরই ভিত্তিতে গোড়ার দিকে শিষ্যদের বেছে নেওয়া হয়), কিন্তু তবু এ আশ্পৃহা স্থায়ী হয়না। অবস্থাটা গতানুগতিক হয়ে এলেই তখন মন এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়ায়। এখানে কোনো নৈতিক বাধানিষেধ নাই, তাই অনেক কাজ করা হয়ে যায় নির্বোধের মত।

তাই বলে বাছাই করার মধ্যে যে কিছু ভুল থাকে তা নয়—যদিও তা মনে হতে পারে, বটে, কিন্তু সে কথা ঠিক নয় ; কারণ বাছাই করা হয় ভিতরকার লক্ষণ দেখে, যা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট...হয়তো আভ্যন্তরীণ মনোভাবের সঙ্গে অনেক রকম মিশ্রণের দোষ এড়াতে না পারাতে অমন হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু চেয়েছিলেন সেইরকম, তারই জন্যে তিনি চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন, "যদি আমি মাত্র একশো জন লোককে পাই, তাতেই যথেষ্ট হবে।" একশো সংখ্যা পোরেনি অনেককাল পর্যন্ত, কিন্তু যখন সে সংখ্যা পূরণ হলো তারই মধ্যে মিশ্রণ ঢুকে পড়েছে।

অনেকেই এলো সদ্বস্তু লাভের আকর্ষণে, কিন্তু...শৈথিল্য এসে পড়ে। অর্থাৎ সত্যের মধ্যে দৃঢ়স্থিতি বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন হাঁ, আমিও এটা লক্ষ্য করেছি যে বরং জাগতিক বাহ্য পরিস্থিতির মধ্যে নিদারুণ বাধাবিঘ্নের ভিতরে থেকে আশ্পৃহা যেন আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে।

উত্তর হাঁ, এটা ঠিক কথা।

প্রশ্ন তখন তা এতই বেশি তীব্র হয়, যেন জীবন মরণের সংগ্রামের মতো।

উত্তর হাঁ, তাই বটে। কারণ মানুষ এখনও এমন স্থূল যে তার পক্ষে এস্পার ওস্পার দুটোরই চরম প্রান্ত থাকা চাই। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন : "সত্য প্রেম যদি চাও তবে সেখানে ঘৃণাও থাকা দরকার ; প্রকৃত প্রেম তখনই জাগে যখন পিছনে ঘৃণার চাপটা থাকে।" সত্যই তাই। অতএব বর্তমান অবস্থা যেমন হয়েছে তাকে তেমনি নিয়ে আরো এগিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। এই পর্যন্ত।

হয়তো সেই কারণেই এখানে এত রকমের বাধাবিপত্তি এসে জড়ো হয়েছে ; নানারূপ চরিত্রের খুঁত, স্বাস্থ্যের গণ্ডগোল, ঘটনার প্রতিবন্ধক—কারণ এই সব অসুবিধার চাপের নির্যাতনে চেতনা ওঠে জেগে। আর যদি সবই সহজ ও শান্ত হয়ে আসে, অমনি তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।

আর এই কারণ হতেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি থাকলেই তোমরা ঝিমোতে শুরু করো।

দুঃখের কথা তো বটেই। এ যে ভালো তা বলছিনা, কিন্তু অবস্থাটা এই রকমই।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "The Hour of God" (দেবমুহূর্ত) বইখানিতে মোটের উপর এই কথাই বলেছেন : শক্তি ও জ্ঞান পেয়েও যদি তোমরা তা সদ্ব্যবহার করতে না পারো তবে ধিক্ তোমাদের।

এখানে কোনো শাস্তি দেওয়া বা প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্ন নেই, কিন্তু তোমরা নিজেরাই দরকার হিসাবে এগুলোকে টেনে আনছ, একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়া তোমাদের দরকার, যাতে তেমনি প্রচণ্ডভাবেই তার প্রতিক্রিয়া করতে পারো।

(নীরব থেকে)

এমন অনুভূতি আমি উত্তরোত্তর পাচ্ছি, প্রকৃত দিব্য প্রেমের স্পর্শ নেমে আসা যাতে তা মুক্তভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত ক'রে দিতে পারে, এর জন্য সকলের মধ্যে ও সব-কিছুর মধ্যে একটা অসাধারণ শক্তি আসা চাই, যা এখনও আসেনি। ওর অভাবেই সমস্ত অসংলগ্ন হয়ে যায়।

চূড়ান্তে এর অনেক খুঁটিনাটি "বৃত্তান্ত" আছে, কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে জানা বলে তার কথা আমি বলতে চাইনা। কিন্তু পুনঃপুনঃ অনুভূতি থেকে বহু প্রমাণ পেয়ে এই কথা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি বিশুদ্ধ দিব্যপ্রেমের যে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় বিকাশ, তা যখন মুক্ত ও পর্যাপ্তরূপে অকস্মাৎ তার বিপুল ভার নিয়ে বাধার উপর নেমে আসবে—তখন কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেনা, কোথায় তলিয়ে চলে যাবে। তখন...সব কিছুই যাবে থেমে। তাকে বিপর্যয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অনন্ত কৃপা।

চাই কেবল নিরেট ও নিঃসন্দেহ ভাবে এইটুকু বোধ করা যে, আমরা যে স্পন্দনতরঙ্গের মধ্যে স্বভাবত অবস্থান করছি তার সঙ্গে প্রকৃত সত্যের স্পন্দনের সঙ্গে কতখানি প্রভেদ—আমাদের এই বিবনিঘাতনক দৌর্বল্যের রোগটাকে যদি শুধু চিনতে পেরে যাই—তাতেই সকল বিনষ্টি থেমে যাবে।

এই গতকাল সকালেই সেই দিব্যশক্তির অভিব্যক্তি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছিল, তার পর হঠাৎ এলো এক অপরিমেয় প্রজ্ঞা যার ফলে সকল চঞ্চলতা শান্ত হয়ে গেল। যা হবার তা

হবেই, তাতে যা সময় লাগবার তা লাগবেই। পরে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে, তখনই সব ভালো হয়ে যাবে। এই জানবার পরে সেই জ্যোতির দ্যুতি নিতে গেল।

এখন দরকার শুধু ধৈর্য ধরে থাকা।

শ্রীঅরবিন্দ তাই লিখেছেন: তীব্রভাবে আস্পৃহা করো, কিন্তু অধৈর্য না হয়ে.... এই তীব্রতা ও অধৈর্যের প্রভেদটা খুব সূক্ষ্ম—কেবল কিছু স্পন্দনের পার্থক্য। খুব সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু তাতেই অনেক তফাৎ হয়ে যায়।

তীব্রতা থাকবে বিনা অধৈর্যে, এই অবস্থাতে আসা চাই। এবং তা অনেক সময়ের জন্য, দীর্ঘকালের জন্য,—কেবল আভ্যন্তরীণ ফলটুকু নিয়েই খুশি থাকা, অর্থাৎ বাকী জগতের সঙ্গে তোমার আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া যা দাঁড়াচ্ছে তাই নিয়ে; বাস্তবে দেখবার মতো কোনো ফল তাড়াতাড়ি না চেয়ে বা তার প্রত্যাশা কিছু না ক'রে। তাড়াতাড়ি করতে গেলেই আরো বিলম্ব এসে যায়।

জিনিসটা যখন এমন, তখন এমন বলেই একে নাও।

আমরা অর্থাৎ মানুষ—বেঁচে আছি বিব্রত হয়ে; জীবন শীঘ্র ফুরিয়ে যাবার একটা অর্ধ-চেতন মনোভাব নিয়ে; কেউ যদিও তা স্পষ্ট ক'রে ভাবেনা, কিন্তু অর্ধচেতনভাবে এই অনুভবটা থাকে। তাই লোকে সব কিছু চায় তাড়াতাড়ি—এখনই হোক, এখনই হোক—একটা কিছু ধরলেই তাড়াতাড়ি সেটা সেরে আবার অন্য কিছুকে ধরে, আগে যেটা ধরেছিল তাকে ভালো করে শেষ পর্যন্ত হতে দেয় না। কেবল চল আরো আগে, আরো আগে... তাতেই কাজ নষ্ট হয়।

কেউ কেউ তাই এই তত্ত্ব প্রচার করছে: বর্তমান মুহূর্তটাই আমার কাছে সব চেয়ে দামী মুহূর্ত—কথাটা ঠিক না হলেও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে তাই সত্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ জীবনের প্রতি নিনিটে আপন সম্ভাবনার চূড়ান্ত ক'রে নাও, পরের কথা আগেত থেকে না ভেবে কিংবা পরক্ষণের জন্যে অপেক্ষা না রেখে বা পরক্ষণের জন্য প্রস্তুত হতে না চেয়ে। ঐ কারণেই প্রতি মুহূর্তে তোমার তাড়া থাকে—তাই ভালো ক'রে কোনোটাই করা হয় না। ভিতরে লেগে থাকে একটা নিরন্তরের উদ্বেগ—যা মিথ্যা—একেবারেই মিথ্যা।

যাঁরা প্রাজ্ঞ হয়েছেন তাঁরা বরাবরই বলেছেন (চীনে এবং ভারতেও সে কথা প্রচলিত): শাশ্বত বোধের মধ্যে নিত্য অবস্থান করো। ইউরোপেও বলা হয়েছে যে—আকাশ ভাবনা করো, নক্ষত্রলোকের কথা ভাবো, তার অসীমতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাও—এতেই তোমার মনের বিস্তার হবে ও শান্তি পাবে।

এগুলি উপায় বটে, কিন্তু অপরিহার্য উপায়।

আমি দেহের কোষগুলির মধ্যে এ ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে দেখেছি; তারা সর্বদাই খুব ব্যস্ত থাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে, পাছে সময় না মেলে। তাই ঠিক ভাবে কিছুই সম্পন্ন হয় না। অপটু মানুষ যারা (যাদের সব কাজই এলোমেলো এবং বেসামাল, যাতে হাত লাগাবে তাই

নষ্ট করবে). তাদের মধ্যে এই তাড়ার ভাবটা খুবই থাকে.—জল্‌দি জল্‌দি সব পারতে চায়।...

...কাল হলো কি, একজন এসে তার বাতের ব্যথার সম্বন্ধে দুঃখ ক'রে বললে "দেখুন তো, অনর্থক কত সময় নষ্ট হচ্ছে, সব কাজই করতে হচ্ছে খুব ধীরে ধীরে।" আমি বললাম (মা হাসলেন), "তাতে হয়েছে কী ?" আমার কথায় সে খুশি হলো না। কেউ অসুস্থ হলে তখন সে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে ওঠে, এটা হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য যদি বলে, "আমার সময় নষ্ট হচ্ছে, কাজগুলো খুব আস্তে করতে হচ্ছে"—তাতেই বোঝা যায় যে মানুষের তাড়া কতখানি—জীবনকালের মধ্যে যেন উল্‌কার মতো ছুটে যেতে চায়...কিন্তু যাচ্ছে কোথায় ?...শেষে কি উল্‌কার মতো ফেটে মিলিয়ে যাবে ?

এতে কি ফল হবে ?

(নীরব থেকে)

এই সব সূত্রাবলীর সারনীতি হলো এই যে—বাইরে দেখানোর চেয়ে ভিতরে হওয়া অনেক বেশি জরুরী—সত্যিকার বাঁচাটাই বাঁচো, মিথ্যে ছল করো না। আর অন্যেদের সকলকে নিজের উপলব্ধির কথা শোনানোর চেয়ে নিজে সত্যিকার সম্পূর্ণভাবে ও নিখুঁত-ভাবে উপলব্ধি করো, যা অনেক বেশি দরকার।

সেই একই কথা, তুমি কি করেছ তা কাউকে জানাতে গেলেই তার অর্ধেক জিনিস নষ্ট হয়ে যায়। অথচ এও ঠিক কথা যে তাতে নিজের সীমার হদিস পেতে পারো, কোথা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেচ সে কথা জানতে পারো।

বুদ্ধ পরম প্রজ্ঞার সঙ্গেই বলেছিলেন "মধ্য পন্থার কথা, এদিকেও বেশি নয় ওদিকেও বেশি নয়, এর মধ্যেও ডুবে যাবে না ওর মধ্যেও ডুবে যাবে না—সব কিছুই থাকবে সমান ওজনে...কিন্তু সবই হবে বিশুদ্ধ।

বিশুদ্ধতা আর ঐকান্তিকতা হলো একই জিনিস। *

১৬-৯-৬৪

---

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

খোলা ককপিটের দুইপাশে শক্ত করিয়া হাত দিয়া ধরিয়া সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পিছনের ককপিটে দাঁড়াইয়া ছিলাম। চারিদিকে, বিশেষ করিয়া নিম্নের দিকে, ভাল করিয়া দেখিতে ছিলাম। কিছুদূরে বিমানবন্দর ধূসর রং হইয়া গিয়াছে ও নিম্নে সামনের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর তাকাইয়া দেখি দূরে এক সীর্ণকায়া নদী মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে। আরো অনেক দূরে হিমালয়ের এক অংশ কখনও কখনও আবছা দেখা যাইতেছে। একটু শীতও করিতেছে। কতটা উচেচ উঠিয়াছি তার জ্ঞান কিছুই নাই। আন্দাজ করিতেছি দশ হাজার ফিট অন্ততঃ হইবে।

প্যারাস্যুট পিছনে ঝুলান আছে ও হারনেস দিয়া শক্ত করিয়া এরোপ্লেনের খোলের সঙ্গে বাঁধা আছি। হঠাৎ মনে হইল কে যেন আমার মস্তক ও শরীরের উপর দুইশত মনের পাথর চাপাইয়া দিল। হাঁটু ও কোমর চাপে বাঁকিয়া গিয়া, দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, আর মনে হইতেছে এখনই এরোপ্লেনের খোলের যে অংশের উপর দাঁড়াইয়া আছি তাহা ভেদ করিয়া নিচে পড়িব। দুই হাত হাঁটু ও কোমর শক্ত করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছি,

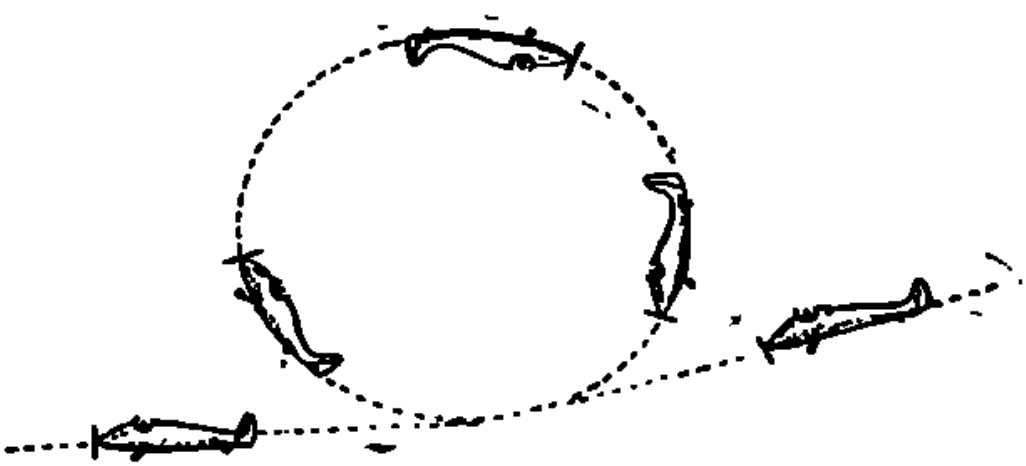

উপরের দিকে চাহিয়া দেখি মাতা ধরিত্রী, গাছপালা, মাঠপ্রান্তর। একি হইল। উড়িতে গেলে এই বিষম অবস্থায় পড়িতে হইবে এমন কথা কেহত' কখন বলে নাই। এত কথা মনের মধ্যে খেলিয়া যাইতে যাইতেই আবার সহজ উড়ন্ত অবস্থায় আসিয়া পোঁছিলাম।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই বোধে আসিল লুপ করিতে কি অসম্ভব রকমের কেন্দ্রাতিগ শক্তির উদ্ভব হয়। আর গতির বেগ বৃদ্ধির সাথে এই শক্তির চাপ কত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বুঝিলাম প্রত্যেক লুপেই এই অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। প্রস্তুত হইলাম। উপর্যুপরি পাঁচবার লুপ এরোব্যাটিকের (aerobatic) পর পা: অ: রঙ্গনাথন এরোপ্লেন সাধারণ উড্ডীন অবস্থায় আনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিলেন। প্রথমত এক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উঠাইয়া দেখাইলাম, জানাইলাম এখনও ঠিক আছি। পেট ও বুকের মধ্যের অন্ত্রযন্ত্রাদি সব যথাস্থানেই আছে, স্থানচ্যুত এখনও হয় নাই। যাহার স্থানচ্যুত হয়, অবতরণের পর, আইন অনুযায়ী, জল, সাবান ও গন্ধনাশক ঔষধ সহযোগে ককপিট তাহাকেই পরিষ্কার করিতে হয়। উৎকট সখের উৎকট বেমারি আর তার দাওয়াইও উৎকট।

অবতরণের পর পা: অ: রঙ্গনাথন বলিলেন বার হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া তিনি লুপ এরোব্যাটিক সুরু করেন ও শেষ করেন আট হাজার ফিটে। অর্থাৎ পাঁচবার লুপে এরোপ্লেন চার হাজার ফিট নীচে অবতরণ করিয়াছে। তিনি আরও বলিলেন লুপ এরোব্যাটিকে এরোপ্লেনের গতিবেগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। আর এই গতিবেগ সহজে বৃদ্ধি করা যায় যদি এয়ারপ্লেনকে সামান্য অবতরণের অবস্থায় রাখা যায় (shallow dive)।

পরে বহু ফ্লাইং হইয়াছে এবং অনেক বেশী বিপদ ও বৈচিত্র্যের সম্মুখীনও হইতে হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রথম লুপগুলির অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রহিয়াছে। এরোপ্লেন দেখিলেই প্রথমে সেই লুপগুলির কথা মনে আসে। তন্দ্রার মধ্যে এখনও সেই লুপগুলি ও তাহার উল্লাস-রোমাঞ্চ আস্বাদন হয়।

এখন হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সপ্তাহে দুই তিন দিন উড়িতে যাইতে হইত। পা: অ: রঙ্গনাথনের সঙ্গে আর কখন উড়িতে যাইতে হয় নাই। কিছুদিন পরে তাঁহার সাথে আর একবার সাক্ষাৎ হয় উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দুর্গে-ঘেরা এক বিমানবন্দরে। তিনি সেখানে মধ্যরাত্রে বিমান উড়াইবার মহড়া দিতেন, যাহাতে আফ্রিদি, মোমন্দ সীমান্তবাসীদের মালুম হয় যে ভারতীয় জঙ্গী বিমানবহর সর্ব্বদাই জাগ্রত আছে।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও এঞ্জিনীয়ারিং কাজ শিক্ষা সমাপ্তির পর পরীক্ষা দিতে হইল। পরীক্ষায় প্রথম হওয়াতে ও নম্বর ভাল পাওয়াতে ডবল প্রমোশন মিলিল—এয়ারক্রাফ্‌ট্‌মান দ্বিতীয় শ্রেণী (AC2) হইতে একেবারে লিডিং এয়ারক্রাফ্‌ট্‌মান (L.A.C.), অর্থাৎ হাতের কাজ হইতে একবারে খবরদারির কাজে উন্নীত হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতীয় বিমান বহরে "অন্যশ্রেণী" (other ranks) হইয়া ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হাওয়াই সিপাই বলা হইত এবং তাঁদের পদ ছিল হাওয়াই সিপাই দ্বিতীয় শ্রেণী, হাওয়াই সিপাই প্রথম শ্রেণী, ল্যান্স নায়ক ও হাবিলদার, ইত্যাদি, এবং তাঁহাদের মস্তক কুল্লাশোভিত পাগড়ী দ্বারা অলঙ্কৃত হইত, যদিও এই পাগড়ী কপাল বা চক্ষুকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতে পারে না। সৈন্যবিভাগের

আইন অনুযায়ী ভারতীয় পদ সব সময় ব্রিটিশ পদ হইতে নীচে গণ্য হইত। সেইজন্য হাওয়াই সিপাই হাবিলদারকে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ পদধারীর সর্ব্বনিম্নের সাথে কথা বলিতে হইলে অ্যাটেনশন হইয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতে হইত, এবং প্রত্যেক কথার সাথে **yes Corporal** বা **yes L.A.C.** বলিতে হইত। না বলিলেই নানারূপ নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ হইত। তাহার মধ্যে ডবল মার্চ শেখার সুযোগই মিলিত বেশী। ব্রিটিশ এয়ারমেনদের মধ্যে পদ সম্বন্ধে মান-অপমানবোধ খুব তীব্র ছিল। বোধহয় এখনও আছে। তাহার পদ অনুযায়ী সম্বোধন না করিলে প্রথমেই হুঙ্কার শোনা যাইত, **yes what?** দু' তিনবার ক্রমবর্দ্ধমান স্বরে এই **yes what**-এর পরে হুকুম হইত, **double round the square** (অর্থাৎ মাঠের চারদিকে দৌড়াও)। আর যাহাই হউক এইরূপ ব্যবহারে সকলেই তটস্থ থাকিত আর সব সময় চেষ্টা করিত যাহাতে এরকম ভুল আর না হয়।

বিমানবহরে আমাদেরকেই প্রথম ব্রিটিশ পদ দেওয়া হইল। হাওয়াই সিপাই-এর পরিবর্ত্তে এয়ারক্রাফ্‌ট্‌মেন দ্বিতীয় শ্রেণী, এয়ারক্রাফ্‌ট্‌মেন প্রথমশ্রেণী, লিডিং এয়ারক্রাফ্‌ট্‌মেন, কর্পোরাল, সার্জেন্ট ইত্যাদি। এখন একই পদের ব্রিটিশ এয়ারমেনদের সামনে **attention** হইয়া দাঁড়াইয়া আর **yes Corporal** বা **yes L.A.C.** বলার প্রয়োজন ফুরাইল। উল্টা ব্রিটিশ এয়ারমেনদের নিম্নধাপের কেহ যদি আমাদের পদ অনুযায়ী কথা না বলিত, তখন তাহাদের শাসাইবার অজুহাত পাওয়া যাইত এবং বেশীর ভাগ সময়েই এই অজুহাতগুলির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা হইত।

ব্রিটিশ পদ লাভে আমাদের মস্তকে কুল্লার বদলে হ্যাট উঠিল। সৈন্য বিভাগের এই অসমঞ্জস ব্যবহারের জন্য সকলেরই মনে, সে ভারতীয় বা ব্রিটিশ যেই হউক, ভারতীয় পদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। ব্রিটিশ পদ ও হ্যাট পাওয়াতে অনেকেই মনে করিল যে এতদিনে "জাতে" উঠিলাম। কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। শীঘ্রই ব্রিটিশ বৈমানিকরা ও "অন্যরা" এমন আচরণ সুরু করিল যেন তাহারা দয়া না করিলে আমরা আহারের গ্রাসটিও মুখে তুলিতে পারিব না। এতে ফল দুই প্রকার হইল। একদল কঠোরভাবে নিজেদের সংযমের মধ্যে রাখিল, যেমন করিয়াই হউক উড়াইবার কৌশল এবং এঞ্জিনীয়ারিং কাজ সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতে প্রস্তুত হইল এবং মনস্থ করিল যে আমাদের বিমান উড়াইবার কৌশল ও এঞ্জিনীয়ারিং কাজ এত ভাল করিতে হইবে যে আমাদের যে-কোন একটি স্কোয়াড্রন রয়াল এয়ার ফোর্সের দুইটি স্কোয়াড্রনের সমকক্ষ হয়। অন্যদল নিজেদের সংযমের মধ্যে না রাখিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইল; এবং কিছু পাগল সাজিয়া, কিছু বোকা সাজিয়া ভারতীয় বিমান বহর হইতে বহিষ্কৃত হইল। কিন্তু এই সূচনার পরিণাম হইল স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে উত্তরপশ্চিম সীমান্তের কোহাট বিমান বন্দরের, বোম্বাই বিমান বন্দরের অন্যান্য স্থানের ভারতীয় বিমান বহরের "অন্যদের" বিদ্রোহ

ডবল প্রমোশন পাওয়ার পর আশায় ছিলাম এইবার কোন ষ্টোরাড্রনে যাইব। কয়েক দিনের মধ্যেই হুকুম আসিল আমাদের আটশতজনকে আম্বালার এক নম্বর স্কুল অফ্ এয়ার ফোর্স টেক্নিক্যাল ট্রেইনিংএ উচ্চস্তরের এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য যোগ দিতে হইবে। স্কুলে এতদিন বিমানের সাধারণ মেরামতের কাজ শিখিতেছিলাম, যাহাতে দৈনন্দিন উড়িবার কাজ শেষ হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে বিমান পরের দিন উড়িবার উপযোগী আছে কিনা। কিন্তু এই নূতন পর্য্যায়ে আমরা বিমান ও এঞ্জিনে সম্পূর্ণ মেরামতের কাজ শিখিতে লাগিলাম। এইখানেই বিমানের সত্যকার এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার কাজ আমাদের সুরু হইল।

রোলস্ রয়েস্ কম্পানীর তাজার অশ্বশক্তিবিশিষ্ট মারলীন এঞ্জিন তখনকার দিনে রয়াল এয়ারফোর্সের শ্রেষ্ঠ ফাইটার হকার হারিকেন ও সুপার মেরাইন স্পিটফায়ার বিমানে ব্যবহার হইত। ল্যাঙ্কাস্টার বম্বারেও এই এঞ্জিন ছিল। আর সেই সময়কার বম্বারগুলিতে ব্রিটেন কম্পানীর মারকারী এঞ্জিন ছিল। এই দুই এঞ্জিন বিষয়ে সম্পূর্ণ হাতেনাতে মেরামতের কাজ ও সেই সাথে সম্পূর্ণ থিওরীর শিক্ষাও এই স্কুলেই আমাদের সমাপ্ত হইল। শিক্ষাদানের পন্থাও ছিল অতি চমৎকার। তিনটি প্রশ্ন কেন, কেমন করিয়া ও কখন (**why, how and when**) ও এই প্রশ্নগুলিতে যেসব সমস্যা উপস্থিত হইল, সেইগুলির সমাধানের কৌশল আয়ত্ত করাই ছিল এই শিক্ষাদানের প্রথম ও শেষ কথা। এই কৌশল আয়ত্ত করা সহজ হয় যদি মনকে অনুসন্ধিৎসু হইতে অর্থাৎ সব বিষয়েই সব সময় জিজ্ঞাসা করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়—কেন, কেমন করিয়া ও কখন? আমাদের শিক্ষায় সাধারণ এঞ্জিনীয়ারী জ্ঞানের সাথে এই প্রশ্ন কয়টি যোগ করার ফলে যে কোন এঞ্জিনের, সে যতই অজানা হউক, অন্তরের রহস্য আমাদের নিকট অস্পষ্ট রহিত না।

এঞ্জিন শিক্ষার সাথে সাথেই বিমানের গঠনপ্রণালী ও বিমান হাওয়া হইতে ভারী হওয়া সত্ত্বেও কেমন করিয়া হাওয়াতে ভাসমান থাকিয়া উড়িয়া যাইতে পারে (**Theory of flight**) শিখিতে হইল। বিমান এঞ্জিনীয়ারীং শিক্ষায় এই হাওয়ায় ভাসিয়া উড়িবার অংশই বেশী আকর্ষণীয়। যাঁহারা নৌকায় হাল ধরিয়াছেন তাঁহারা বিমানের হাল (রাডার) বিষয়ে সহজেই ধারণা করিতে পারিবেন। জলপৃষ্ঠে ভাসমান নৌকার বেলায় জলমগ্ন একটা হাল দক্ষিণে ও বামে ফিরিবার জন্য; বিমানের বেলায় হাল তিনটি—ও-তিনটি এবং বিমানখানি হাওয়ার মধ্যে ডুবিয়া থাকে। বিমানের প্রথম হালটি রাডার, দক্ষিণে ও বামে ফিরিবার জন্য; দ্বিতীয়টি এলিভেটর, উপরে আরোহন বা নীচে অবতরণের জন্য; তৃতীয়টি এইলেরণ, যে দিকে ফিরিতে হইবে সেইদিকে আবশ্যকমত কাত হইয়া ফিরিবার (**banking**) জন্য। এই সঙ্গেই আমাদের শিখিতে হইল উড়িবার সময়এই তিনটি হালের সাহায্যে কি উপায়ে বিমানের নানারূপ উড়িবার কসরৎ করা সম্ভব হয়।

শিক্ষা সমাপ্তির পর পুনরায় পরীক্ষা হইল, পূর্ব্বের মত লিখিত, মৌখিক ও হাতের কাজে। এবার কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইল। পরীক্ষার মান ছিল

খুব উচ্চ ; কৃতকার্য্য হইতে হইলে শতকরা আশি নম্বর সংগ্রহ করিতে হইত। এবারও পরীক্ষায় প্রথম হইতে সমর্থ হইলাম। ডবল প্রমোশন কিন্তু মিলিল না। তবু প্রথম গ্রেডের এল. এ. সি. হইলাম।

আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে সার্জেন্ট বোসের কথাই বেশী মনে পড়ে। এঞ্জিন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ গভীর এবং পড়াইবার সময় কথা বলিতেন অল্প কিন্তু দেখাইতেন কেমন করিয়া খোলা ও লাগানর কাজ অল্পসময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে করিতে হয়। তাহার পর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেন—যতক্ষণ না শিক্ষানবীশ বুঝাইতে সক্ষম হইত যে তথ্যটি তাহার বোধগম্য হইয়াছে। তিনি প্রায়ই মনে করাইয়া দিতেন বিমানবহরে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব জানিলেই তোমার চলিবে না সবগুলি প্রশ্নের জবাবই তোমাকে জানিতে হইবে। উড়িবার সময় যদি বিপদ আসে তখন সেখানে হয়ত সার্জেন্ট বোস উদ্ধারণের উপায় বাৎলাইতে থাকিবেন না বা যুদ্ধক্ষেত্রের মাঠে যখন বিমান মেরামতের কাজ করিতেছ সেখানেও হয়ত সার্জেন্ট বোস কি করিতে হইবে বলার জন্য থাকিবেন না।

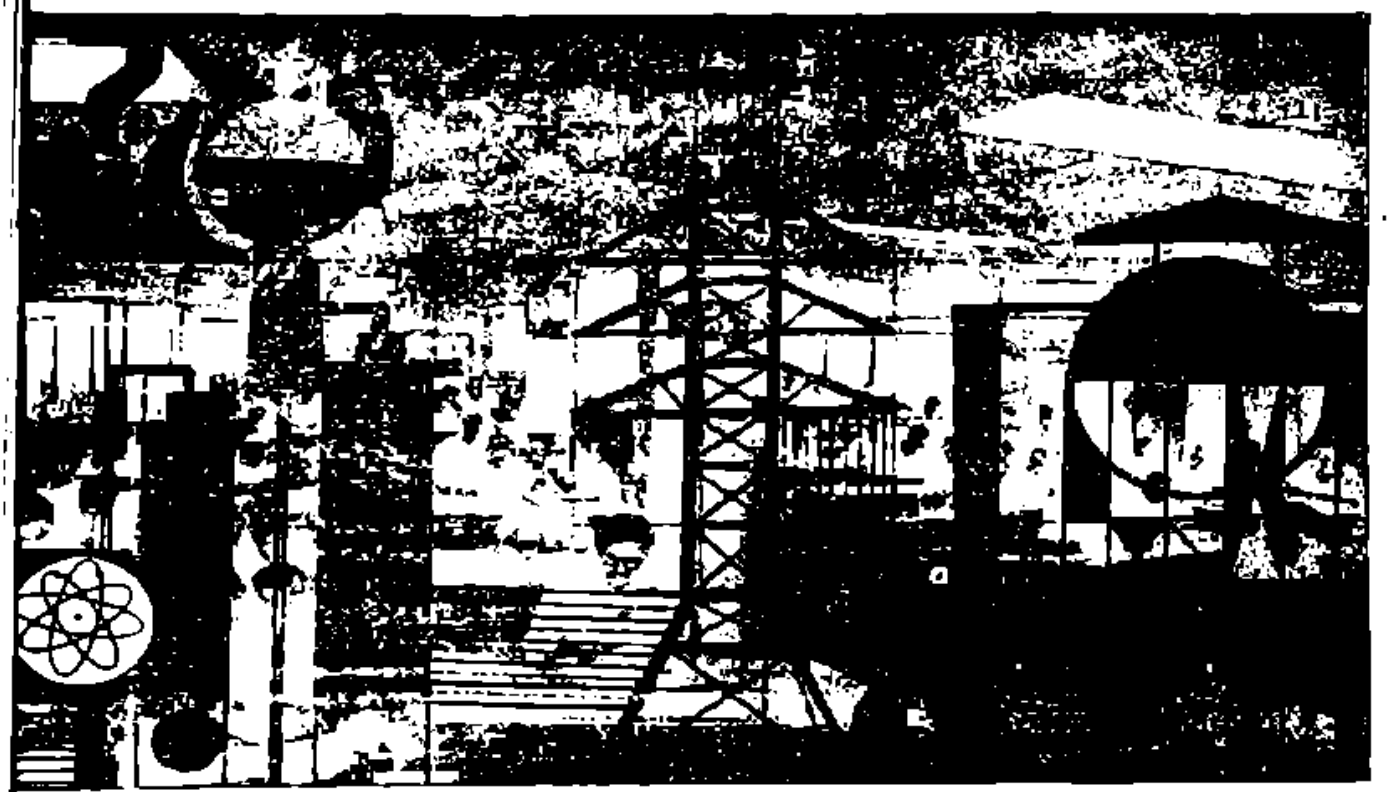

ROM BLUE PRINT TO INITIAL OPERATION

Kuljian's world-wide services in the field of consulting engineering range from preliminary surveys, site selection, feasibility reports, engineering studies, preliminary design to detailed plants and specifications, estimating and purchasing, management of construction and initial operation. ■ The Kuljian system of integrated engineering provides efficient and economical solution to all problems of an entrepreneur. Under one corporate roof Kuljian (India) maintains not only an able team of designers and experts in civil, mechanical, nuclear, electrical, architectural and chemical engineering, but also technicians, economists and management specialists who are equal to any exacting assignment anywhere in India. ■ Whatever be your project—a steel plant or an apartment house, a fertilizer plant or a thermal station, subway systems or transmission lines, let Kuljian do the job for you. It has the experience and the resources.

YOUR PARTNER IN PROGRESS

INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

VEYS ■ REPORTS ■ DESIGN ■ ENGINEERING
ROCUREMENT ■ CONSTRUCTION ■ INSPECTION ■ INITIAL OPERATION

ENGINEERS • CONSTRUCTORS
24-B PARK STREET, CALCUTTA-16

- aiaru164

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

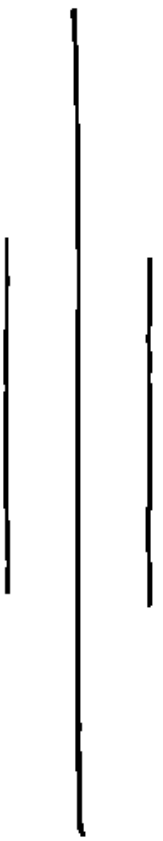

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

It's Spencer's

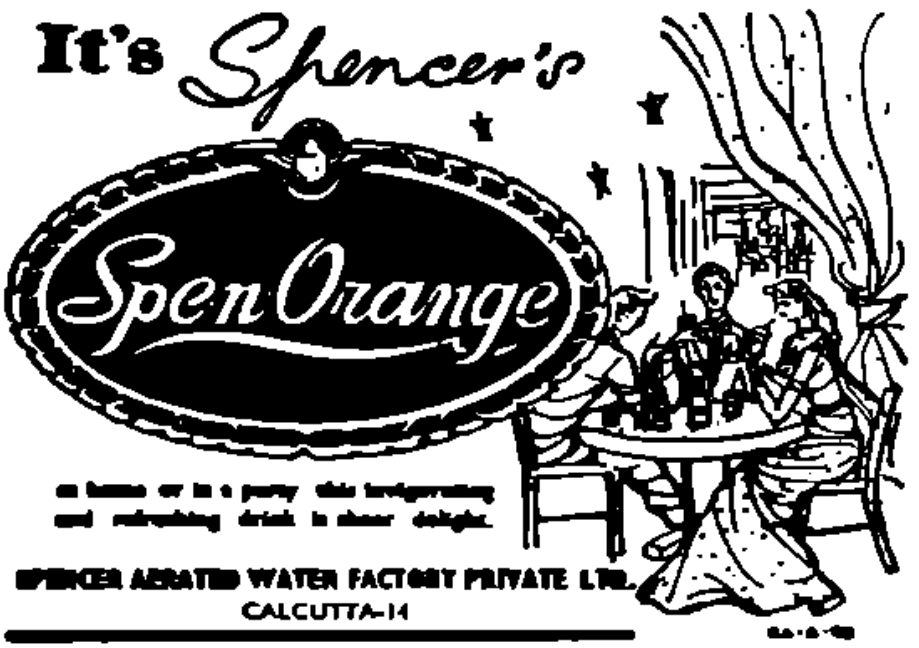

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14

Troubled by insects ??

If so, please do not hesitate to make use of our
up-to-date scientific and efficient servicing arrangements
by specially trained staff for completely
disinfecting your premises with :

" GAMMEXANE " FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

"We do not belong to the past dawns,
but to the noons of the future."

ZENITH RUBBER WORKS

INDIA'S FOREMOST MANUFACTURERS
OF
HIGH GRADE RUBBER SOLES & HEELS

Office & Factory :— **15, South Tangra Road,**
CALCUTTA-15

Telegrams: **'Vessel' Cal**
Codes { Scotts 10th. Ed., A. B. C. 5th. Ed., Bentley's

Telephones { Office : 23-1393
Dock Office:
Residence: { 55-6464, 55-3724, 55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS
3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:
AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:
LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

34-2665

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA–33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

বাংলার উৎসব
শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী
১·২৫

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য
শ্রীমণি বর্ধন
২·৯০

বাংলার শিকার-প্রাণী
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৩·০০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা
শ্রীস্বাধীন বসু
১·২৫

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৬২

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
২·০০

গান্ধী রচনাবলী
প্রথম খণ্ড (১৮৯৪-১৮৯৬)
দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৬-১৮৯৭)
প্রতি খণ্ড ৫·০০

।। স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্র ।।

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেস্টিংস্ স্ট্রীট,
কলিকাতা–১

।। ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মণি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ।।

প্রকাশন শাখা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড,
কলিকাতা–২৭

W B (P) Ad. D 1117(4)/65

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

-The Mother

BENGAL IMMUNITY

বর্ষ—২৫ সংখ্যা—২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৫

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১। মায়ের বাণী
২। ঋষি দীর্ঘতমা — শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
৩। বর্তমান পরিস্থিতি
৪। কঠিন ডানার ওড়া — বীরবাহু
৫। যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ — অনির্বাণ
৬। মায়ের সঙ্গে কথা — শ্রীমা
৭। প্রশ্নোত্তর — শ্রীমা

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Edited by: NOLINI KANTA GUPTA

Printed by: AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

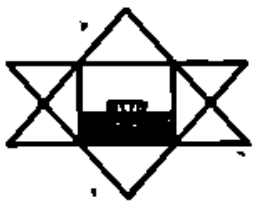

২৪ এপ্রিল, ১৯৬৫

চেষ্টা করে চল ঠিকভাবে, পেয়ে যাবে নিশ্চয়—বিশ্বাস করে থাক, সে বিশ্বাস সার্থক হবেই অবশেষে—

—শ্রীঅরবিন্দ

মায়ের বাণী

কর্মীর প্রতি কর্তা

স্থায়ী কিছু গড়া যায় না, একটা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে। আর বিশ্বাস হওয়া দরকার পারস্পরিক।

তোমার বিশ্বাস থাকা দরকার আমার লক্ষ্য কেবল আমারই ভাল নয়, তোমারও ভাল। আর আমার দিক থেকে আমাকেও জানতে হবে অনুভব করতে হবে যে তোমরা এখানে রয়েছ কেবল লাভ আদায়ের জন্য নয় কিন্তু দেবাদানের জন্য। সমগ্রের কল্যাণ হয় না, প্রতি অংশের কল্যাণ ব্যতিরেকে; সমগ্রের সুসমঞ্জস সমৃদ্ধি হয় না তার প্রতি অংশের ক্রমোন্নতি ব্যতিরেকে।

তোমরা যদি মনে কর তোমাদের কাছ থেকে অন্যায় আদায় করা হয়, আমিও তবে মনে করতে পারি আমার কাছ থেকেও অন্যায় আদায়ের তাড়া হয়েছে। তোমাদের আশঙ্কা যদি হয় পাছে তোমরা প্রতারিত হও আমিও তবে বোধ করব যে তোমরা আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করছ।

মানুষের সমাজে উন্নতি হতে পারে কেবল সরলতা, আন্তরিকতা ও বিশ্বাসকে আশ্রয় করে।

বুলেটিন—আগষ্ট '৬৪

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে লোকেরা আসক্ত কেন?

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অর্থ একটা বিশেষ ধর্ম্মমত; আর এ হ'ল একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে নীচে এমন স্তরে টেনে আনা যেখানে তা হয়ে ওঠে সহজবোধ্য কিন্তু হারায় তার পরিপূর্ণ শুদ্ধতা ও সত্য।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের যুগ চলে গিয়েছে। আমরা এখন প্রবেশ করেছি বিশ্বগত আধ্যাত্মিক যুগে—সে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা রয়েছে তার আদি বিশুদ্ধি নিয়ে।

বুলেটিন—আগষ্ট '৬৪

সত্যের আলো তমসার মিথ্যার দলবলকে পরাভূত করবে, এ-কাজে যারা সহায় হতে চায় তাদের প্রয়োজন নিজেদের কর্ম্মের গতিবিধির উৎসগত প্রেরণা সম্বন্ধে নিরীক্ষণ করা, পৃথক করে চেনা কোনগুলি আসছে সত্য থেকে আর কোনগুলি আসছে মিথ্যা থেকে যাতে প্রথমটিকে বরণ করতে পার, দ্বিতীয়টিকে প্রত্যাখ্যান ও পরিত্যাগ করতে পার।

*

এই চিনবার ক্ষমতা হল পার্থিব আবহাওয়ার মধ্যে সত্যের আলোক-আবির্ভাবের একটা প্রথম ফল।

বস্তুতঃ সত্যের অগ্রপ্রেরণাকে মিথ্যার প্রেরণা থেকে পৃথক করে দেখতে পারা অত্যন্ত কঠিন—যদি সত্যের আলো যে বিশেষ বিচার-ক্ষমতা নিয়ে আসে তা অধিকার না করে থাক।

তবুও গোড়ায় তোমার কাজে সহায় হতে পারে যদি এই লক্ষণটি অনুসরণ করে চলতে পার যে যা-কিছু নিয়ে আসে বা গড়ে তোলে শান্তি, বিশ্বাস, আনন্দ, সানন্দস্য, ঔদার্য্য, ঐক্য, ক্রমপুষ্টি তার উৎস হল সত্য। আর যা কিছু বহন করে আনে বিক্ষোভ, সংশয়, অবিশ্বাস, দুঃখ, বিরোধ, স্বার্থগত সঙ্কীর্ণতা, তামসিকতা, অবসাদ, নিরাশা তা সোজা চলে এসেছে মিথ্যা থেকে।

বুলেটিন—ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

কোন ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ নাই।

কোন শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ নাই।

কোন সামাজিক শ্রেণী বা বর্ণের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ নাই।

কোন দেশের, কোন শিক্ষা-সভ্যতার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ নাই।

আমরা যুদ্ধ করি তেমের বিরুদ্ধে, অচেতনার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানের বিরুদ্ধে, তামসিকতার বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে।

আমাদের প্রয়াস হ'ল পৃথিবীর উপর ঐক্য, জ্ঞান, চেতনা, সত্য প্রতিষ্ঠিত করা; আমাদের যুদ্ধ হল যা-কিছু আলোকের, শান্তির, সত্যের, প্রেমের এই নবসৃষ্টির আগমনীকে প্রতিরোধ করে, তার বিরুদ্ধে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

সকল ধ্বংসের পিছনে—তা প্রকৃতির বিপুল ধ্বংস সব হোক—ভূমিকম্প, আগ্নেয়-গিরি, ঘূর্ণিবাত্যা, জলপ্লাবন, অথবা প্রচণ্ড মানুষী ধ্বংস হোক—যুদ্ধ, বিপ্লব, বিদ্রোহ—রয়েছে কালীশক্তি, যে শক্তি পার্থিব আবেষ্টনের মধ্যে কাজ করে চলেছে যাতে রূপান্তরের অগ্রগতি লাভ করে ক্ষিপ্রতর বেগ।

যা-কিছু কেবল মূলতত্ত্বে যে ভাগবত স্বরূপ তা নয়, বাহ্য সিদ্ধিতেও যা ভাগবত-স্বরূপ, তা আপন প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসারেই সকল ধ্বংসের উর্দ্ধে, এ-সব তাকে স্পর্শ করে না। সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্দেশ করে অসম্পূর্ণতার পরিমাপ।

এ সব ধ্বংসে পুনরাবৃত্তি নিরোধ করবার সত্যকার উপায় হ'ল তারা যে শিক্ষা দেয় তা গ্রহণ করা, যথা প্রয়োজন অগ্রসর হয়ে চলা।

১০ই মার্চ ১৯৬৫

ঋষি দীর্ঘতমা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

উপনিষদের অনেক ঋষি তোমাদের এখন পরিচিত হয়েছেন। ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, রাজর্ষি জনক, আরও সব মহর্ষি, যেমন গৌতম, সত্যকাম—এবং মেয়েদের মধ্যে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির কথা শুনেছ।

আজ বলব বৈদিক ঋষিদের মধ্যে একজনের বিষয়। বৈদিক ঋষিদের নাম তোমরা নিশ্চয় শুনেছ কিছু কিছু—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, পরাশর, কণ্ব (ইনিই শকুন্তলা-কণ্ব কি না জানা নেই), মধুচ্ছন্দা—এঁরা সকলেই মন্ত্রদ্রষ্টা মন্ত্রশ্রোতা মন্ত্রকর্তা ; ঋক্‌বেদের অনেকখানি এঁরা জুড়ে আছেন। এঁদের প্রত্যেকেরই আছে এক একটা বৈশিষ্ট্য, তাঁদের মন্ত্রে ভাবের ও ভাষার স্বকীয়তা, যদিও সকলেরই বিষয়-বস্তু এক, মূল উপলব্ধি এক। এই যেমন বশিষ্ঠের হল প্রসাদগুণ, বিশ্বামিত্রের শক্তি ও বীর্য, কুৎসের মাধুর্য্য (যাঁর মন্ত্র 'ইদম্ শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষান্ জ্যোতি' আমরা সকলেই শুনেছি)। দীর্ঘতমার হল বক্রোক্তি, স্বভোক্তি (paradox)। *

তিনি নিজেই বলেছেন এক মন্ত্রে—

আমি দেখলাম নাতি দূরে ধূমরাশি—
উঠে গিয়েছে, ঢেকে ফেলেছে উপরকে—

আজ বলব যাঁর কথা তাঁর নাম দীর্ঘতমা। দীর্ঘতমা অর্থ বুঝবে না তিনি খুব দীর্ঘ কলেবর—"শালপ্রাংশুর্মহাভুজ"—তম অর্থ অধিকতম নয়। তম হল তমস্, তমসা, অন্ধকার। নাম থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে তাঁর প্রকৃতিতে ছিল অসাধারণ বা বিচিত্র ধরণের কিছু। ফলতঃ তাঁর সম্বন্ধে যে সব গল্প কাহিনী বিশ্বদন্তী পুরাণকারেরা চালিয়ে দিয়েছেন তা অবাধ কল্পনার শ্রী-হীন—এমন অদ্ভুত, উদ্ভট এমন কি বিকট যা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সে-সবের উল্লেখ প্রয়োজন নেই।

---

* শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—In the deep and mystic style of Dirghatamas Auchathya as in the melodious lucidity of Medhatithi Kanwa, in the puissant and energetic hymns if Vishwamitra's as in Vasistha's even harmonies we have the same firm foundation of knowledge and the same scrupulous adherence to the sacred conventions of the Infinite.

দীর্ঘতমার গভীর অতিলৌকিক ধারা, কণ্ব প্রতিধ্বনির স্বচ্ছতা, বিশ্বামিত্রের শক্তিময় বীর্যমন্ত্র, বশিষ্ঠের সুষম ছন্দ-মূর্ছনা, সকলেরই মধ্যে আমরা পাই একই জ্ঞানের অটল প্রতিষ্ঠা, সাধনব্রতীদের নিশ্চিত বিধি-বিধানে একই ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

তবে যা সম্ভব ও স্বীকার্য্য তা বোধ হয় এইটুকু যে তিনি দীর্ঘকাল তমসাবৃত হয়েছিলেন, অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন তার পরে যখন তিনি আলোকে উত্তীর্ণ হলেন 'জ্যোতির্গমং তমসাপারে'—তখন সেই আলোক সে জ্যোতি নিয়েছিল এক 'আশ্চর্য্যবৎ' রূপ। দীর্ঘতমার পিতা হল উচথ্য আর তাঁর মাতা মমতা। মাতৃগর্ভে তিনি ছিলেন সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার অনেক পরেও, বলা হয়েছে নিজের ইচ্ছাক্রমেই। তারপর জন্মিলেন যখন তখন জন্মান্ধ হয়েই ভূমিষ্ঠ হলেন। তাই কি তাঁর অনুসন্ধান তিনি আরম্ভ করলেন এই জিজ্ঞাসা দিয়ে, "আমি অপোগণ্ড শিশু, অজ্ঞ আমার মন জানে না কিছু, কে বলবে আমাকে দেবতাদের গুপ্তপদের কথা?" অন্ধকার অন্ধতাই ছিল যেন ভগবৎপ্রসাদ তাঁর পক্ষে ; তাঁর চোখ ফিরেছিল আর এক গুপ্ত জগতের দিকে, তাঁর স্মৃতিতে ফুটে উঠেছিল বিচিত্র সত্য ও তথ্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় আর এক বৃদ্ধ অন্ধকবির কথা যিনি সেই দুর্গত অবস্থাতেই লিখে গিয়েছিলেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত মহাকাব্য (Milton এবং তাঁর Paradise Lost)। আরও মনে পড়ে একান্ত বধির অথচ অতুলনীয় সঙ্গীতস্রষ্টা বীঠোভেনের কথা।

দীর্ঘতমার মুখনিঃসৃত কয়েকটি বাক্য এত প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যে তা হয়েছে সাধারণ সম্পত্তি, পরিচিত মন্ত্র। "একম্ সৎ তৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এ হল দীর্ঘতমারই মন্ত্র। তারপর "দ্যৌর্মে পিতা...মাতা পৃথিবী"...এও দীর্ঘতমার বাণী। তারপর কঠোপনিষদের সেই বিখ্যাত চিত্র 'দুটি সুপর্ণ বিহঙ্গ রয়েছে একই বৃক্ষে'—এ মন্ত্রও হল দীর্ঘতমার। এ রকম আরও বাণী আছে যা আমাদের কাছে সুলভ্য হয়ে গিয়েছে অথচ যাদের উৎস জানা নেই। দীর্ঘতমার মন্ত্রাবলী পড়তে পড়তে মনে হয় এ যেন উদ্ধৃতি-সংগ্রহ (full of quotations)।

দীর্ঘতমার বাণী যে বিশিষ্ট ও বিচিত্র ধরণের তা এরই মধ্যে লক্ষ্য করে থাকবে। তাঁর মন্ত্র হল ধাঁধা—হেঁয়ালি, প্রহেলী। এই যেমন—

> "উপর নীচের দিকে চলে আসছে,
> নীচ আবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে,
> নীচে যারা তারাই উপরে, উপরে যারা তারা আবার নীচে,"

আরো ঐ ধরনের শোনো,

> "উপরকে দিয়ে যে নীচস্থ পিতাকে জানে এবং নীচেকে দিয়ে উপরের পিতাকে জানো, তিনিই হলেন কাব্যকর্ত্তা, কবি"—

তারপর শোনো অর্থাৎ দেখতে চেষ্টা কর একটা বিচিত্র চিত্র—

> "ঊর্দ্ধমুখী গাভীটি তার সম্মুখের পা দিয়ে ধরেছে তার বৎসের পিছনের পা, আর বৎসটি সম্মুখের পা দিয়ে ধরেছে তার মায়ের পিছনের পা।"

বলা বাহুল্য, এ সব হল আধ্যাত্মিক বা অন্তর্নিহিত জগতের রহস্য, সেখানকার অনুভূতি আলেখ্য। স্মরণ করিয়ে দেয় বহু পরবর্তী কালের সিদ্ধাচার্যাদের, চর্যাপদকর্তাদের সন্ধ্যা ভাষা ও সান্ধ্য অনুভূতি।

দীর্ঘতমার সমস্যার অন্ত নেই। শোনো আর একটি রহস্য বা প্রহেলিকা। ঋষি বলছেন—

> "যে একে সৃষ্টি করেছে সে জানে না এ কে। যে দেখেছে একে তারও কাছে এ ঢাকা রয়েছে। সে মাতার জঠরে আবৃত, তার বহু সন্ততি, সে প্রবেশ করল অমৃতের মধ্যে।"

শোন কবি ঋষির আকুতি আর একটু—কি জিজ্ঞাসা তাঁকে বিচলিত করেছে, কোন প্রহেলিকার মীমাংসা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন। তিনি বিশ্ববাসীকে ডেকে প্রশ্ন করছেন—

> "বল ত পৃথিবীর শেষ অন্ত কি? বল ত জগতের নাভি কি? বল ত বীর্যবান অশ্বের তেজ অর্থ কি? আরও বল ত পরম ব্যোমস্থ বাক্ কি?"

কূট সমস্যাগুলির উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন—

> "এই বেদী হ'ল পৃথিবীর শেষ প্রান্ত, এই যজ্ঞই হল জগতের নাভি, এই সোমরস অশ্বের তেজস্রাব আর এই ব্রহ্মবাকই পরম ব্যোম।"

প্রশ্নও যেমন উত্তরও তেমনি, সমান প্রহেলিকা। এই বাক্ সম্বন্ধে ঋষি দীর্ঘতমা যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, তা অপরূপ, বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে অনেক যোগমার্গই তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং প্রচার করেছেন। দীর্ঘতমা নিজে ছিলেন অসাধারণ বাক্‌সিদ্ধ যাদুকর। তাঁর দৃষ্ট-সত্য লোক-প্রসিদ্ধিই লাভ করেছে। তিনি বলছেন, বাক চতুর্বিধ : তার চারিটি স্থিতি, চারিটি স্তর বা ক্রম। ঋষি বলছেন তিনটি অশরীরী অব্যক্ত, একমাত্র চতুর্থটিই ব্যক্ত, মানুষের মুখে। দীর্ঘতমার এই মূল সূত্রটির অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়েছে। সে-সকলের মধ্যে তান্ত্রিকদের ব্যাখ্যাই সুপরিচিত। তাঁরা এই বাক চতুষ্টয়ের নাম দিয়েছেন, (১) পরা (২) পশ্যন্তি (৩) মধ্যমা আর (৪) স্ফুটবাক হল বৈখরী। আধুনিক ভাষায় আমরা বলতে পারি প্রথমটি হ'ল পরা—পরমা চেতনার স্পন্দ, দ্বিতীয়টি ঊর্দ্ধতর মন বা বুদ্ধির স্পন্দন, তৃতীয়টি অন্তর্হৃদয়ের স্পন্দন আর চতুর্থটি কণ্ঠগত ধ্বনি-স্পন্দ। ইংরেজীতে বলতে পারি এক নম্বর **revelation**, দ্বিতীয় নম্বর **intuition**. তৃতীয় নম্বর **inspiration** আর চতুর্থটি **utterance**।

এবার উপসংহার করি আমাদের ঋষিবরের মূল দর্শনটির কথা বলে। তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি, তাঁর সমগ্র জীবন-বেদ তিনি সংগৃহীত করে ধরেছেন একটি শ্লোক্-এর মধ্যে। আমরা জানি বলা হয়ে থাকে সকল শাস্ত্রের সার হল গীতা এবং গীতার সার হল একটি শ্লোক—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য...। সে রকমে বলা যেতে পারে ঋষি দীর্ঘতমা

একটি শ্লোকের মধ্যে তাঁর গোটা দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর মূল চেতনার সংক্ষিপ্তসার গেঁথে দিয়েছেন তা হল তাঁর বিখ্যাত দীর্ঘতম ঋক্‌মালার (সূক্তটির) একেবারে প্রথম ঋকটি। তিনি বলছেন,

> "এই যে আনন্দময় অতিবৃদ্ধ হোতা তাঁর আছে আবার এক মধ্যম ভ্রাতা, তিনি হলেন ভোজ্য-ভোক্তা। তৃতীয় ভ্রাতা এক আছেন জ্যোতির্ময়-পৃষ্ঠ তিনি—তাঁর মধ্যে আমি দেখলাম রয়েছেন বিশ্বপতি তাঁর সপ্তপুত্র নিয়ে।"

অর্থ কি?

বিশ্বসৃষ্টির সত্য, বিশ্বসৃষ্টির নিগূঢ় সত্য হল ত্রিমূর্তি—পৃথিবীতে অগ্নিদেব, অন্তরীক্ষে বায়ুদেব আর দ্যুলোকে সূর্যদেব, অন্যকথায়, দেহ-প্রাণ-চেতনা কিংবা স্থিতি গতি ও জ্যোতি, এই হল বিশ্বের স্বরূপ—স্বরূপ ঠিক নয়, স্বরূপ হল তৃতীয় ভ্রাতার অন্তরে নিহিত। কি সে? কে সে? ঋষি কি দেখলেন তৃতীয় ভ্রাতার অন্তরে? তিনি দেখলেন বিশ্বপুরুষ এবং তার সাতটি পুত্র। আমাদের সহজ ভাষায় পুরুষোত্তম, স্বয়ং ভগবান এবং তাঁর সাতটি প্রকাশ-ধারা। এই সপ্তস্তর বা সপ্তভূমির কথা আমরা সকলেই জানি। সৃষ্টির নিম্নার্দ্ধে দেহ-প্রাণ-মন, উত্তরার্দ্ধে সৎ-চিৎ-আনন্দ (অথবা সত্য-তপ-জন) ; আর উপর ও নীচের মধ্যে সেতুবদ্ধ তুরীয় বা বিজ্ঞানময় লোক, আমাদের অতিমানস। ঋষি দীর্ঘতমার এই হল মূল রহস্য-কথা। এই রহস্য জানাই হল সকল জ্ঞান, এ জানলে আর কিছু জানার বাকী থাকে না।

ব্যাখ্যা আর একটু দিতে হয় পূর্ণতার জন্যে। অগ্নিকে বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ ('পলিতম্') বলা হ'ল কেন? অগ্নি, অগ্নিই সর্ব্বপ্রথম দেবতা, দিব্যশক্তি, পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর মধ্যে আবির্ভূত। পৃথিবীর উপর অন্যান্য দেবশক্তিকে তিনিই আবাহন করে নিয়ে আসেন, পার্থিব চেতনাকে সূর্য্য-চেতনার অভিমুখে ঊর্দ্ধায়িত করবার জন্যে। পৃথিবী ক্ষিতি মাটি হল ভগবানের প্রথম মূর্ত্ত প্রকাশ—সৎ যখন দেখা দিল বাহ্য-চেতনায় বাহ্যরূপ নিয়ে তখন পূর্ণ বিপরীত রূপ হল তার অনুময়। এই অনুময় মাটির অন্তরে জ্বলছে অগ্নিদেব ঊর্দ্ধমুখী চেতনার আস্পৃহা হয়ে, মাটিকে ফিরিয়ে ধরেছে লোকোত্তরের দিকে। এই অগ্র-গতির শক্তি হল বায়ু, প্রাণবেগ। সকল অন্তরীক্ষ মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মজগৎসমূহ পার হয়ে সে যায়। সর্ব্বশেষে পার্থিব চেতনা উত্তীর্ণ হয় গিয়ে সূর্যলোকে পূর্ণ অখণ্ড জ্যোতির্ম্মণ্ডলে

বর্ত্তমান পরিস্থিতি

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শুধু আজ নয়, গত কাল নয়, বিগত পরশু তরশুও নয়—যুগযুগান্ত ধরে ঘটে আসছে এই ব্যাপার। মানব চেতনার মতোই প্রাচীন। তবে আগামী কাল গতকালের পুনরাবৃত্তি করবে কি না তা-ই দ্রষ্টব্য।

সকল আধ্যাত্মিক প্রয়াস এনে ধরে যতো বিরোধী আবর্ত, প্রায় তারই নাস্তিসূচক গতিবৃত্তি। বুদ্ধ বলেছিলেন, আমাদের ঘিরে শত্রুদল, আমরা তবুও যেন তাদের আঘাত না দেই। আমরা জানি যখন যীশু খৃষ্টকে ক্রুশ পিঠে বয়ে কাঁটার রাজমুকুট মাথায় পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ভগবানের কাছে—এদের যেন ক্ষমা করা হয়, এরা জানেনা এরা কী করছে। খৃষ্টযুগের প্রথম দিকে রোম খৃষ্টবাণী প্রচার ও খৃষ্ট-রাজত্ব প্রসারে ব্রতী হয়েছিল, সেদিনও তেমনি বর্বর জার্মানিয়ার ক্ষেত্র থেকে বাধা দিতে উঠে এসেছিল দস্যুরা—সম্মুখের সব কিছু ঘূর্ণিবায়ুর মতো পিষে দলে, লুঠতরাজ করে পৌঁছেছিল 'পবিত্র নগরী'র ভিতরে, বিগ্রহ লাঞ্ছিত করে চিরদুর্নাম কিনেছিল আগামী কালের বিশ্ব-মানবের কাছে। আরো কতো শতাব্দী পরে ওরলেঁয়া-র কুমারী জান দার্ককে (Jeanne Darc) জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল আগুনে—কারণ সে বলেছিল সে দেখতে পায় দেবদূতদের, আলাপ করে ভগবানের সঙ্গে। আর মহম্মদ—যাঁর নাম আজ দেশে দেশে, সারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সুপরিচিত, অভিনন্দিত সম্পূজিত, জীবিতকালে তাঁকে স্থান হতে স্থানান্তরে পালিয়ে ফিরতে হয়েছিল—শিকারীর লক্ষ্য পশুর মত। ক্রমে অবস্থার যে উন্নতি হয়েছে তা নয়, আরো অবনতি হয়েছে যেন, সুশিক্ষিত আলোকিত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখলাম মর্মান্তিক আর এক চিত্র—স্বনামধন্য নাটকার ইবসেনের হাতে সমাজ-সংকটের আধুনিক রূপ, মানুষ বা জনতার ব্যর্থতা তাদের মঙ্গলকল্যাণটি কিসে ধরতে বুঝতে—অন্য উচ্চতর আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথা না-ই তুললাম—যে সত্যকার উপকার করতে যায় লোকসাধারণের তারই অদৃষ্টে উপহার স্বরূপ আধা জোটে 'মানবশত্রু'।

আজকের জগতে বিরোধিতা আরো দারুণ। মানুষের কাছে আহ্বান এবার বহুগুণে মহৎ ও বৃহৎ পরিবর্তনের—ভিতরে চেতনায় রূপান্তর, বাহিরে জীবনে জীবনায়তনেও রূপান্তর। আবার এ-রূপান্তর আমূল রূপান্তর—গোড়া থেকে মূল থেকে রূপান্তর, আবরণ বদল নয়। জগতকে যেমন আছে তেমনই ফেলে রাখা নয় কিম্বা সম্ভব হলে একটু রদবদল করে নেওয়া নয়, সত্যের ভাগবতের উপাদানে ও ধর্মে ঢেলে গড়া। পার্থিব জীবনের লক্ষ্য আদর্শ এই রকমে হল ভাগবত দেহের আত্মবলি নয়, পূর্ণ মহিমাসিদ্ধি।

বলা বাহুল্য পুরাতন অভ্যাস, প্রাচীনের ধারা, সংস্কার এবং প্রবৃত্তির সনাতন রীতি এরকম ওলট পালট বরদাস্ত করে না। পৃথিবীর প্রাণী অবতরণোন্মুখ আলোকে সহ্য করতে পারে না। আলোর প্রতিক্রিয়া দারুণ—যে-সব সত্তা আরামে ছায়ায় অন্ধকারে ছিল তাদের কষ্ট হয়, যন্ত্রণা হয়, তাদের ভয় হয় পাছে ধ্বংস পায়—কোনো পরিবর্তন চায় না তারা। তবে ভবিতব্য নির্দিষ্ট—সুস্পষ্ট তার চিহ্ন। পৃথিবী চলেছে—আলোর দিকে, জ্যোতির জ্যোতির্ময়ীর দিকে।

(২)

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই আলোকে মূর্ত করে ধরতে, মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে—সে যাতে আজকের মতো আর পশু বা অর্ধপশু হয়ে না থাকে।

শ্রীমার শৈশব থেকেই স্বপ্ন ছিল পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করা যেখানে মানুষ হবে স্বাধীন, সুখী, জ্ঞানী, প্রেমের সূত্রে ঐক্যবদ্ধ, অভাবের কবল থেকে মুক্ত, ভিতরে ও বাহিরে সাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাজ শুরু হয়েছিল, সে-সৌধ নির্মাণ আজো চলেছে—অবশ্য বর্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার নানা বিধিনিষেধ ও বাধাবন্ধের সম্মুখীন হয়ে—তিনি পথ করে চলেছেন এক উচ্চতর চেতনার জন্য, একটা উন্নততর সত্তা ও জীবশ্রেণীর আবির্ভাবের জন্য, জীবনের এক জ্যোতির্ময় ধারার জন্য।

স্থাবর অবস্থা ব্যবস্থা, পরিবর্তনে অনিচ্ছুক বর্তমান ও অতীত রুখে দাঁড়িয়েছে—সে কিছুতেই চায়না অনিবার্য ভবিষ্যতের জীবন পেতে। বিরুদ্ধতা আবার সংসিদ্ধির ও পূর্ণতার মাত্রা পরখ করবার সুযোগ দেয়। বিপদ আর বিঘ্ন, সংকট আর সংশয়, সব ঘটনা আর দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে আমরা অটলভাবে চলেছি ভাগবত সিদ্ধির দিকে।

আপদবিপদ আশ্রমের কাছে নূতন কিছু নয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে শ্রীঅরবিন্দ যেদিন মহীরুহের বীজ বপন করেছিলেন সেদিন থেকেই ঝড়ঝাপটার বিরাম নেই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তাঁকে চলে যেতে বলেছিল, লোভ দেখিয়ে ডেকেছিল হিমালয়ের শান্ত নিরাপদ আশ্রয়ে। ফরাসীরাও আপ্যায়নে পেছিয়ে থাকে নি, তারাও দিতে চেয়েছিল ভূমধ্যসাগরতটে আফ্রিকার সন্নিহিত ভূমিখণ্ড। এখানকার শুভানুধ্যায়ীরাও কেউ তাঁকে প্রমোদ-ভ্রমণে নিয়ে ছুটতে চেয়েছিল—অনির্দিষ্ট গন্তব্যে। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু ধ্রুব সংকল্প করেছেন। এই-ই হল কল্যাণভূমি, তাঁর সিদ্ধি ও সাধনার আসন, পীঠস্থান। শ্রীমা সে-সংকল্প অটুট রেখেছেন, তিনিও চলেছেন একই পথে।

বুদ্ধও তো বোধিবৃক্ষমূলে আসন নিয়েছিলেন, স্থির হয়ে বসেছিলেন এবং বলেছিলেন—উঠব না আর, ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং,—এই আমি বসলাম, শরীর শুকিয়ে শেষ হয়ে যাক, তবু শেষ পর্যন্ত দেখব আমি।

(৩)

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, স্বর্গের রাস্তা চলে নরকের ভিতর দিয়ে। তাঁর আহ্বান ও সাবধান-বাণী উচ্চারিত হল এই—

এখানে, ঊর্ধ্বমুখী পথের যাত্রী—
স্বর্গের সর্পিল পথ নরকের রাজ্য ভেদ করে
চলেছে পরম দুঃসাহসে—
দাঁড়াবে একটু, কি চলবে ধীরে এই বিপদসঙ্কুল
প্রসার পার হয়ে,
কণ্ঠে শুধু প্রার্থনা এক আর সেই মহানাম...
এখানে রক্তস্নাত নেকড়ে ওৎ পেতে রয়েছে
সেতুহীন স্রোতস্বিনীর ধারে,
মৃত্যু-কালো শকুনির চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে সুদূর শিখরে...

পর্বতের জন্ম হয় যখন, ভূমি ভেদ করে আকাশে মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় যখন তখন তেমনি বিপুল শক্তির আর এক বেগ এসে তাকে চেপে দাবিয়ে দিতে চায়, মাটির সমান করে দিতে চায়—পরিণামে তুষার-প্রপাত, ধ্বস, প্লাবন—দারুণ ধ্বংসযজ্ঞ বা খণ্ডপ্রলয়। অথচ এই সমস্ত দুর্ঘটনা ও দুর্বিপাকের মধ্যে পর্বত থাকে অটল, তার বিশাল সমুন্নত কলেবর জাজ্বল্যমান।

সব বৈপরীত্য ও বিরুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে, সব ক্ষয়ক্ষতির করাল হাত পার হয়ে, সব চঞ্চল অনিত্য বিপর্যয় পার হয়ে ক্রমে পরিস্ফুটভাবে দেখা দেয় কেবল ভগবানের ইচ্ছা ও অভিলাষ চলেছে কোন চরম সিদ্ধির দিকে।

একদিন সকলে আমরা দেখতে পাব—
সোনার শিখর হল গড়া, জন্ম নিল বহ্নি-শিশু।

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

সার্জেন্ট মোলের সাথে আর দুইজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। একজন ফ্লাইট সার্জেন্ট সিম্পসন্, বেঁটে পাতলা গড়নের। মাথায় সর্বক্ষণ প্রথানত কাত্ করিয়া পরা ফোরেজ ক্যাপ—হাতের কাজে অতিশয় দক্ষ; বিমানের এঞ্জিনের কাজে উঁচু সিঁড়িতে উঠিতে গেলেই পা থর থর করিয়া কাঁপে। দুই হাত দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়াই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে এক হাত দিয়া সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া রাখিতেন, যেন পড়িয়া না যান। কাজ করিবার সময়ও দাঁড়াইতেন না। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াই কাজ সমাধা করিতেন। নিকটে গেলেই প্রচণ্ড ধমক খাইতে হইত, কারণ তাঁহার ভয় হইত, আমাদের আনাড়ীর ধাক্কায় তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইবেন। আমরাও 'শত হস্তেন' পন্থা অবলম্বন করিতাম। দূরে দূরে থাকার আরও একটা কারণ ছিল,—তাঁহার সর্বাঙ্গ সব সময় বীয়ারের মৃদু গন্ধে মৌ মৌ করিত,—বীয়ার ও সুরার গন্ধও যে মধুর বোধ হইতে পারে সেই উচ্চতর অবস্থায় আমরা পৌঁছাইতে পারি নাই। অগত্যা দূরে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করিতাম।

দ্বিতীয় জন সার্জেন্ট ব্রাউন। লম্বা মোটা বেশ নাদুস নুদুস গোলগাল গড়ন। নাকের উপর পুরু কাঁচের চশমা। একটু দূরে গেলে দেখিতে পাইতেন কিন্তু চিনিতে পারিতেন না। আমাদের মারকারী এঞ্জিন শিখাইতেন এবং ভালই শিখাইতেন। ঐ বিরাট চেহারা হইলে কি হয়, অসম্ভব ভয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকিতেন। বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার এই যুদ্ধে জয় হইবে, এ কথা তাঁহার কল্পনার অতীত ছিল। তাঁহার বাড়ী ছিল কভেন্ট্রিতে। জার্মানরা কভেন্ট্রি বম্বিং করিয়া নিশ্চিহ্ন করিবে এই বিশ্বাসে তিনি নিজের দেশ ছাড়িয়া এই দেশে আসিবার জন্য ভলান্টিয়ার করিয়াছিলেন। পরে যখন জার্মানরা হাজার বম্বার বিমান হইতে সত্যই বোমা ফেলিয়া কভেন্ট্রি নিশ্চিহ্ন করিবার আয়াসে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে, তখন তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত "This is the end. This is the end." (এই শেষ, এই শেষ)। একটা কথা বলা হয় নাই, তাঁহার কণ্ঠস্বর খুব মিহি ছিল; মনে হইত যেন ছোট ছেলে কথা বলিতেছে।

ভারতীয় জঙ্গী বিমানবহরে আমাদের যোগ দিবার কয়েক মাস পরে কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ জাগে যে সত্যই যদি শীঘ্রই, অর্থাৎ আমাদের শিক্ষানবিশী পূর্ণ

হইবার পূর্বেই, যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে, আমরা যাহারা ভারতীয় বিমান বহরে যোগ দিবার পূর্ব পর্য্যন্ত বিমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, তাহাদের দ্বারা বিমান বহরে এঞ্জিনীয়ারিং বা উড়াইবার কাজ সুচারু সম্পন্ন হইবে না। তখন তাড়াহুড়া করিয়া ভারতীয় ফ্লাইং ক্লাবগুলি হইতে কিছু সংখ্যক এঞ্জিনীয়ার তাঁহারা সংগ্রহ করেন। এইরূপ একদল, পায় দশবারজন হইবে, আমাদের সাথেই এঞ্জিনীয়ারিং শিখিতেছিলেন। শিক্ষা-কালে তাঁহারা সব সময়ে আমাদের নানা উপদেশ দিতেন। আমরাও যথেষ্ট সনীহ করিয়া সেই উপদেশগুলি মনের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতাম, কারণ উপদেশগুলি ছিল একেবারে এঞ্জিনীয়ার মুখনিঃসৃত বাণী। বিমানের কাজ কত শক্ত ও কি ভয়ানক সে কথা তাঁহাদের নিকট শুনিয়া শুনিয়া আমরা বিমানকে প্রায় "জুজুর" মত ভয় করিতে শিখিলাম। কিন্তু সত্যই বিমানের মেরামতের কাজ সুরু হইলে দেখা গেল, একাগ্রতা ও কানুন অনুযায়ী মেরামতের কাজ করিলে, বিমান উড়িবার সময় বন্ধুর মতই ব্যবহার করে। বিমানের মেরামতের কাজে ফাঁকি না দিলে বিমান ও তার উড়িবার সময় ধোকা দেয় না। তাহার পর পরীক্ষাতে তাঁহারা কেহই যখন এন, এ, সি পর্য্যন্ত হইতে পারিলেন না, সাধারণ এ, সি-ই রহিয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের বক্তব্য ও মন্তব্যগুলি বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আস্থা হারাইলাম।

এই এঞ্জিনীয়াররা প্রায় সবাই দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব হইতে আগত ছিলেন। এই দলের দলপতি ছিলেন গোয়ার অধিবাসী; তাঁহার কর্মস্থল ছিল এলাহাবাদ। সুন্দর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখশ্রী ও সেই সাথে উজ্জ্বল গৌর ছিল তাঁহার গাত্রবর্ণ। নিজেকে খুব খানদানী ঘরণার লেড়কা বলিয়া পরিচয় দিতেন। নামও ছিল দম্ভ সিংজী। তাঁহার ধারণা ছিল, পরীক্ষায় ভারতীয়রা তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না,—তিনিই পরীক্ষায় নিশ্চয় প্রথম হইবেন ও সেই সূত্রে ভারতীয় জঙ্গীবিমান-বহরের এঞ্জিনীয়ারদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃপদের তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। পরীক্ষাতে আশানুরূপ কৃতকার্য্য না হওয়াতে, তাঁহার উচ্চাশায় যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হইল। উপরন্তু মহা বিপত্তি উপস্থিত হইল যখন আমাদের আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহাকে প্যারেড করিতে হইল। দ্বিতীয় দিনেই কম্প দিয়া তাঁহার জ্বর আসিল ও সাতদিনের মধ্যে স্বরভঙ্গ ও গলা দিয়া রক্তপাত হইতে দেখা গেল। আর এক সপ্তাহ মধ্যে বিমানবহরের ডাক্তাররা একত্রে তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন, ও রাজযক্ষ্মা সন্দেহে সকলেই একমত হইয়া তাঁহাকে বিমানবহর হইতে মুক্তি দিলেন। আশ্চর্য্য কিন্তু, মুক্তির ছাড়পত্র পাওয়ার পর দিন হইতেই গলা দিয়া রক্তপাতও বন্ধ হইল ও কণ্ঠস্বর পূর্ব্বা-বস্থায় আসিল। খানদানী ঘরণার সন্তান এইবার ফ্লাইংক্লাবে ফিরিয়া গেলেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে বানরাওলী বিমানবন্দর হইতে পুরাতন বিমান ক্রয় করিয়া আনিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় এলাহাবাদে এক বায়োস্কোপে তাঁহার সহিত পুনরায় দেখা হয়। অনেক গল্পের পর, তাঁহার পীড়ার কথা উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কি উপায়ে রাজযক্ষ্মার উপসর্গগুলি

তিনি তাঁহার শরীরে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার থুতু ও রক্তে যক্ষ্মার বীজাণু স্থাপিত করিলেন? খুব হাসিয়াছিলেন কিন্তু উহা বলিলেন না।

আর একজনের কথা খুব মনে পড়ে। তুরী সাহেব; দিল্লী ফ্লাইং ক্লাব হইতে আসিয়াছিলেন। জাতিতে মুসলমান ছিলেন, কিন্তু চিনিবার কোন উপায় ছিল না, না কথা-বার্ত্তায়, না পোষাক-আশাকে। একবার তাঁহার সহিত পুরী জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেখা হয়। তিনি কয়েকদিনের ছুটি লইয়া দেশভ্রমণে আসিয়াছিলেন। শ্যামবর্ণ, ও বেশ পুষ্ট দেহে অসাধারণ শক্তি ধারণ করিতেন। ছোট বিমানগুলির এঞ্জিন একাই দুই হাতে ধরিয়া উঠাইয়া অনায়াসে বিমানে লাগাইতে পারিতেন। তাঁহার আহারও ছিল তদ্রূপ অসাধারণ। চল্লিশ পয়তাল্লিশটা কাট্‌লেট একস্থানে বসিয়াই আহার করিতে পারিতেন এবং তাঁহার পেটের পীড়ার কথা কখনও শুনি নাই।

বিরাট দেহ বা অসীম দেহশক্তি কিন্তু তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। ভারত বিভাগের পর তিনি এদেশেই বসবাস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, স্বাধীনতা-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে দিল্লীতে যে তাণ্ডবলীলা সংঘটন হয়, সেই সময় পাঞ্জাব হইতে আগত রিফিউজিদের হস্তেই তিনি নিখোঁজ হন। তাঁহার এদেশে বসবাস করার ইচ্ছা ঘোল আনা পূর্ণ হইয়াছে।

আম্বালায় এয়ার ফোর্সের টেক্নিকাল ট্রেনিংএর এক নম্বর স্কুলের শিক্ষা-সমাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে, নূতন দিল্লীর উইলিংডন বিমানবন্দরে ও লাহোরে, ভারতীয় বিমান বহরের পক্ষ হইতে দুইটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বিমান বহরের জন্য পাইলট ও এঞ্জিনীয়ারিং বৈমানিক সংগ্রহ।

প্রদর্শনীতে ভারতীয় পাইলটরা বিমান উড়াইবার নানারূপ কৌশল (acrobatic) দেখান। উড়িয়া যাইতে যাইতে বিমান কিরূপে উল্টান (inverted), পাল্টান (rolling), বৃত্তাঙ্কন (loop), সোজা নামিয়া পড়া (dive), সোজা উপরে উঠিয়া যাওয়া vertical climb), ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়া (spin) বা কখন যদি এঞ্জিন আকাশেই থামিয়া যায়, তখন কিরূপে পড়িয়া না গিয়া নামিয়া পড়া যায়, এই সব খেলা আমাদের পাইলটরা খুব কৃতিত্বের সাথেই দেখাইতে সমর্থ হয়।

বিমানবন্দরের টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে, বিমান, বিমানের এঞ্জিন ও বিমানে ব্যবহৃত নানারূপ কলকব্জার প্রদর্শনী করা হয়। এই কাজে এঞ্জিনীয়ারিং এয়ারমেনরা ছিলেন। প্রদর্শনীতে আগত ব্যক্তিদের তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন বিমানের কোন অংশ কখন, কেন ও কেমন করিয়া ব্যবহার করা হয়। সরকারী এঞ্জিন দেখাইবার ও বুঝাইবার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। তাহাতে আমার কিছু সুবিধাই হইল। খুব অল্পসংখ্যক দর্শকরাই এঞ্জিনের মত রসকষহীন অংশের কথা জানিতে চাহিতেন। সকলেই ভীড় করিয়া যাইতেন যেখানে ভিকার্স ও ব্রাউনিং মেসিনগানগুলি দেখান হইত। সেখানে গোলন্দাজ বৈমানিকরা মেসিনগানগুলি

একবার খুলিয়া, বন্দুকের নল পরিষ্কার করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় লাগাইয়া ফেলিতেন ও গুলি ছুঁড়িবার মহড়া দিতেন। দর্শকরা সকলেই আশ্চর্য হইয়া শুনিতেন কেমন করিয়া প্রতি মিনিটে প্রত্যেক মেসিনগান হইতে প্রায় ১ হাজার গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। আরো আশ্চর্য হইতেন যখন বৈমানিকরা তাঁহাদের বুঝাইতেন যে প্রত্যেক বিমানে দুইটি, চারিটি বা আটটি মেসিনগান লাগান থাকে এবং একটি বোতাম টিপিয়া এই আটটি মেসিনগান হইতে একত্রে গুলি নিক্ষেপ করা হয়।

একদিন অপরাহ্নে, কয়েকজন ভদ্রমহিলা, খুব সম্ভব মুসলমান হইবেন, কারণ এঞ্জিনের সামনে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য মুখের উপর হইতে বোরখা সরাইয়া দিলেন ও ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন সামনে অবস্থিত ঐ বৃহৎ গোলাকার বস্তুটি কি? অল্পক্ষণ বলার পর তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিতে পারিলাম না তাঁহারা আমার ইংরাজী বুঝিতে পারিতেছেন কিনা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হিন্দুস্তানীতে বলিলে কি তাঁহাদের সুবিধা হইবে। অতদিন উত্তর পশ্চিম দেশে থাকিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল হিন্দুস্থানী ভালই বলিতে পারিব। অন্ততঃ কিছুটা বুঝাইতে সক্ষম হইব। তাঁহারা ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলে, আমার হিন্দিতে বুঝাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণেই তাঁহাদের মুখে চাপা হাসি লক্ষ্য করিলাম। তারপর যখন "আগনে সব রাজা লাল হো যা হ্যায়" বলিয়াছি সকলেই উচ্ছ্বসিত হাস্যে প্রদর্শনী মুখরিত করিয়া অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ নিজেই রাজা অর্থাৎ বেগুনে হওয়ার পর মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলাম একান্ত প্রয়োজন না হইলে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করা আর সঙ্গত হইবে না। এবং এ পর্যন্ত বিশেষ উত্তেজনার সময় অটোমেটিক হিন্দি ছাড়া অন্য সময় হিন্দি কথা সহজে আর আসেনা।

দিল্লী হইতে বিমানে লাহোর আসিতে আমাদের তিনদিন লাগিয়া গেল। তখনকার দিনে, ভিকার্স কোম্পানীর দুই এঞ্জিন বিশিষ্ট ভ্যালেন্সিয়া বাইপ্লেন একমাত্র সৈনাবাহী বিমান ছিল। বিমানের খোলের দুইপাশে লম্বালম্বিভাবে দুইটি বেঞ্চ। তাহাতে গদি ত ছিলই না, শব্দনিবারক কোন আবরণও ছিল না। শুধু অ্যালুমিনিয়ামের খোলের মধ্যে ঐ ধাতুরই দুইটি লম্বা বেঞ্চ। তাহাতে আটাশ জন যাত্রী মুখোমুখি ভাবে বসিয়া থাকিতে পারে। বিমান যখন "এয়ার পকেটে" পড়িয়া দুলিত, তখন মাথা বাঁচান দায় হইত। প্রায়ই মাথার নানা স্থানে আঘাত লাগিয়া নানাপ্রকার আকার হইত। আর অসুস্থ হইলে ত কথাই নাই। সম্মুখে বসা যাত্রীর উপর তরল উদ্গার ছাড়া আর উপায় ছিল না। এই বিমান কিন্তু ঘন্টায় আশি মাইলের উর্দ্ধে কখনও যাইত না।

প্রথম দিন অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করার পর গোরা পাইলটের মনে পড়িল বিমানের Log book দিল্লীতে ফেলিয়া আসিয়াছেন। Log book না লইয়া লাহোরে অবতরণ করিলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনায় আমাদের সেইদিন দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে হইল।

পরদিন মিনিট পনর উড়িবার পর সেই গোরা পাইলট আসিয়া সকল যাত্রীদের সাবধান

করিয়া বলিলেন "দক্ষিণ পাশের এঞ্জিনের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। এঞ্জিন যে কোন সময় জ্বলিয়া উঠিতে পারে। সবাই সাবধান সবাই বেল্ট দিয়া নিজেকে বিমানের সাথে বাঁধিয়া ফেল। আর বিমান যদি ক্র্যাশ করে অর্থাৎ মাটিতে পড়িয়া যায়, তখন সবাই প্যারেড করিয়া যেন একজনের পর একজন বিমান পরিত্যাগ করে।" তাঁহার কথায় আমরা সকল যাত্রীরাই বিশেষ বিচলিত হইলাম। কথা বলার প্রচেষ্টা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই বিমানের জানালা দিয়া দক্ষিণ দিকের এঞ্জিনের অবস্থা দেখিতে লাগিলাম আর মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলাম। এই এঞ্জিনের গতিবেগ ক্রমশঃই কমিয়া যাইতে লাগিল, ও সেই সাথে এঞ্জিনের এক অংশ প্রায় লাল বর্ণ হইল। সকল যাত্রীই অবগত ছিলেন, এই বিমানের উইংগুলি ফেব্রিক কাপড় দিয়া ঢাকা, ও ফেব্রিক কাপড়ের উপর ডোপ নামক বস্তু লাগান আছে। দুইই অতি উত্তম দাহ্য পদার্থ। এঞ্জিন হইতে উইংয়ের ব্যবধান তিন চার ফিটের বেশী নয়। এঞ্জিন যদি জ্বলিয়া উঠে বা গরমে ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে জলন্ত পেট্রল ও তৈল এঞ্জিন হইতে উইংয়ে আসিতে মোটেই বিলম্ব হইবে না। অন্য এক জ্যোৎস্নারাত্রের কথা মনে পড়িল। এঞ্জিনের ভিতরের অগ্নি বাহিরে আসার পূর্ব্বেই পাইলট অগ্নি-নির্ব্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করিয়া দক্ষিণের এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিলেন। ততক্ষণ আমরা দিল্লীর উইলিংডন বিমানবন্দরে পৌঁছাইয়া গিয়াছি। অবতরণের পর বিমান ত্যাগ করিতে সেদিন সকল যাত্রীরই খুব অল্প সময় লাগিয়াছিল। তৃতীয় দিনে অন্য বিমানে আমরা বিনা সমস্যায় লাহোর পৌঁছাইলাম।

শিক্ষা পূর্ণ হওয়ায় কোষ্টাল কমাণ্ডের তিন নম্বর স্কোয়াড্রনে যাওয়ার হুকুম আসিল। তিন নম্বর স্কোয়াড্রন তখন কলিকাতার দমদম বিমান বন্দরে। বেশীর ভাগ সময় তাঁহারা বঙ্গোপসাগরের উপর বিমান উড়াইয়া অনুসন্ধানী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

শিক্ষানবীশ কালে, অন্য শিক্ষানবীশদের উপর খবরদারি করিবার জন্য অ্যাক্টিং কর্পোরাল হইয়াছিলাম। কানুন অনুযায়ী রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে অ্যাক্টিং পদ প্রত্যার্পণ করিয়া পুনরায় এল, এ, সি হইলাম।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে একদিন ভোরে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছাইলাম। একটু খুঁজিতেই দেখি একজন গোরা কর্পোরাল সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কর্পোরাল লীডার—"। জবাবে বলিলাম—"না। এল, এ, সি..."। দমদমায় পৌঁছাইয়া অফিসার কমাণ্ডিং ফ্লাঃ লেঃ চৌধুরীর কাছে নীত হইলাম। তাঁহার সহিত পূর্ব্বেই আলাপ ছিল।

যে জন্য এত দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম, সে কাজ এত দিনে পাওয়া গেল।

তিন নম্বর স্কোয়াড্রনের একটু পরিচয় এখানে প্রয়োজন।

যুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) লাগিবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় বিমানবহর যাহাতে এদেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে তাহার চেষ্টা হইতেছিল। ভারতীয় বিমানবহরের

এক নম্বর স্কোয়াডনের সবগুলি ফ্লাইট সম্পূর্ণ গঠিত হইবার পূর্ব্বেই, সমুদ্রের উপকূলভাগ রক্ষা ও পাহারা দেওয়ার জন্য কোষ্টাল কমাণ্ড বিভাগ সৃষ্টি হয়। পাঁচটি সহরকে কেন্দ্র করিয়া কোষ্টাল কমাণ্ডের জন্য ভলান্টিয়ার লওয়া হয়—ভলান্টিয়ার পাইলট ও এঞ্জিনীয়ারিং এয়ারমেন। এই পাঁচটি কেন্দ্র হইল কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচীন, বম্বাই ও দিল্লী।

প্রথমের দিকে কলিকাতা হইতে এই জন্য প্রায় পনর জন পাইলট ও প্রায় ত্রিশ জন এয়ারমেন ভলান্টিয়ার লওয়া হয়। অন্য সহরগুলি হইতেও অনুরূপ সংখ্যক ভলান্টিয়ার পাইলট ও এয়ারমেন লওয়া হয়।

কলিকাতা হইতে সংগৃহীত পাইলট ও এয়ারমেনরা প্রায় সকলেই তখন কলিকাতার দমদম বিমান বন্দরে। ফ্লাঃ লেঃ চৌধুরী অফিসার কমাণ্ডিং ও ফ্লাইং অফিসার এম, সিং তাঁহার আডযুটাণ্ট। উভয়েই অসাধারণ পাইলট। অন্য পাইলট ও অফিসাররাও কেহ কম ছিলেন না।

এয়ারমেনদের ত্রিশজনের প্রায় সকলেই এয়ার ফোর্স স্কুল হইতে শিক্ষার পর এখানে আসিয়া পোছিয়াছেন। নিজেদের কোন নন-কমিশণ্ড অফিসার না থাকায়, রয়াল এয়ার ফোর্সের দুইজন কর্পোরাল ও একজন সার্জেন্ট এদের সাথে ছিলেন।

এদের সাথে দুই প্রকার বিমান ছিল। প্রথম ওয়েষ্টলাণ্ড ওয়াপিটি, এক এঞ্জিনবিশিষ্ট বাইপ্লেন। সম্মুখের ককপিটে পাইলট। তাহার নিকট বিমান চালনার যন্ত্রপাতি ও দুইটি মেসিনগানের জন্য একটি বোতাম। মেসিন গান দুইটি এঞ্জিনের পাশে অবস্থিত। গুলি নিক্ষেপের সময় প্রপেলরের মধ্য দিয়া সম্মুখের দিকে গুলি চলে। দ্বিতীয় ককপিট নিরীক্ষক বেতার কর্মীর এর জন্য। তাহার নিকটও দুইটি মেসিনগান—উপরে অথবা পিছনের দিকে গুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য। এ ছাড়া দুইটি পাঁচশত পাউণ্ড বোমা ডানার নীচে লওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু এই বিমানের গতিবেগ ঘন্টায় আশি মাইলের অধিক কখনও হইত না। সেইজন্য এই বিমানকে আমরা ওয়াপিটি না বলিয়া বলিতাম হোয়াট-এ-পিটি। হোয়াট-এ-পিটি বিমানের একটা গুণ ছিল, যাহা অন্য কোন বিমানে এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, এবং অন্য কোন বিমানে সম্ভব হইবে বলিয়া কল্পনাও করিতে পারি না। এই বিমান ক্র্যাশ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা অসম্ভব ছিল। এঞ্জিন বন্ধ হইয়া গেলেও বিমান মন্থর গতিতে বিনা কষ্টে মাটিতে নামিয়া আসিতে পারিত। আর হঠাৎ কোন কারণে মাটিতে পড়িয়া গেলেও, সহজে ভাঙ্গিয়া পড়িত না। তিনবার এই বিমানের ক্র্যাশ দেখিয়াছি, এবং দুইবারই বৈমানিকরা নিজেরাই বিমান ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। একবার শুধু নই লাগাইয়া পাইলটকে বাহির করিতে হয়, কারণ বিমান উল্টাইয়া বৃক্ষের উপর পড়িয়াছিল ও পাইলট অনিচ্ছা সত্ত্বেও শীর্ষাসনের অবস্থায় ককপিটে ঝুলিতেছিলেন।

দ্বিতীয় হইল চার এঞ্জিনযুক্ত বিরাট আকারের আটালান্টা বিমান। পূর্ব্বে এইগুলি ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের ডাক ও যাত্রীবাহী বিমান ছিল। যুদ্ধ লাগিবার কিছুদিন পূর্ব্বে

এইগুলিকে বিমান বহরে লইয়া যুদ্ধোপযোগী করা হয় ও পরে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে দেওয়া হয়। মেসিনগানের সংখ্যা ছিল চার, সম্মুখে দুইটি ও পশ্চাতের খোলা ককপিটে দুইটি। কিছুসংখ্যক বোমাও লইবার ব্যবস্থা এতে ছিল। সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রায় একশত কুড়ি মাইল ঘন্টায়। এই বিমানের কাঠামোর একটা বৃহৎ অংশ কাষ্ঠের তৈয়ারি ও তাহার উপর ডোপযুক্ত ফেব্রিক কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। বহুবার ও বহু সময় এই বিমানে অতিবাহিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীর অট্টালিকাগুলির কিঞ্চিৎ উপরিভাগ দিয়া একবার এদিক হইতে অনায়াস বিপরীত দিক হইতে উড়িয়া যাওয়া। কতবার অফিসার কমাণ্ডিংএর নিকট নালিশপত্র আসিয়াছে যে "গত রাত্রে একটি বিমান তাঁহাদের অট্টালিকার ছাতে ধাক্কা লাগাইয়া উপরে উঠিয়া গেছে।" তখন যদি পত্র-প্রেরকরা জানিতে পারিতেন যে অফিসার কমাণ্ডিং নিজেই সে সময় বিমান চালনা করিতে-ছিলেন ও ঐ অট্টালিকার অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট উর্দ্ধে ছিলেন।

একবার কক্সের বাজার হইতে সংবাদ আসিল যে জেলেরা কোন এক বিরাট বস্তুকে ধীরে ধীরে সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া ভারতের দিকে আসিতে দেখিয়াছে। জঙ্গী বিভাগ আর কোন অনুসন্ধান না করিয়াই স্থির সাব্যস্ত করিলেন কোন ডুবোজাহাজ বঙ্গোপসাগর দিয়া ভারতের দিকে আসিতেছে। অমনি সরাসরি তিন নম্বর কোষ্টাল স্কুাইটকে হুকুম করিলেন বোমা ফেলিয়া ঐ সাবমেরিনকে ডুবাইয়া দিতে। অনেক অনুসন্ধানের পর আমরা বস্তুটিকে পাইলাম। হাঁ, একসময় ঐ বস্তু সাবমেরিনই ছিল। বিরাট তিমিমৎস্য। আমরা কিন্তু বোমা ফেলিয়া এই সাবমেরিন ডুবাইবার কৃতিত্ব অর্জন করি নাই।

এই সময় রসিদ আলি ইরাকে জার্মানদের পক্ষ হইয়া বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। দুই একদিনের মধ্যেই এয়ার হেড্ কোয়ার্টার হইতে হুকুম পাওয়া গেল ইরাকের হাভানিয়া বিমান বন্দরে গিয়া বৃটিশ ও ভারতীয় অসামরিক ব্যক্তিদের করাচী বিমান বন্দরে লইয়া আসিতে। তিনটি আটালান্টা বিমানের দুইটি লইয়া হাভানিয়া যাত্রা করা হয়। আমরা সব সময় চেষ্টা করিতাম যে হাভানিয়ায় রাত্রিবাস করিতে না হয়। কিন্তু একবার রাত্রিবাস করিতেই হইল। পরদিন প্রত্যুষে বিমান বন্দরে গিয়া বিমানের অবস্থা দেখিয়া চক্ষুস্থির। রাত্রিকালে ইরাকিরা বিমান ধ্বংস করিয়া যায় নাই সত্য কিন্তু বিমানের খোলের নীচে যতটা সম্ভব হইয়াছে, ততটা ডোপযুক্ত ফেব্রিক সুন্দরভাবে ছুরি দ্বারা কাটিয়া তুলিয়া লইয়া গেছে। এই অবস্থায় বিমানের পক্ষে মাটি ত্যাগ করিয়া উপরে উঠা অসম্ভব। বৃটিশপক্ষীয় ইরাকী সৈন্য যাহারা বিমান পাহারা দিতেছিল, তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া আমাদের হইতে আরও বেশী আশ্চর্য্য হইল। কি করা যায়। অগত্যা বাজারে গিয়া অনেক অধিক মূল্য দিয়া যতগুলি বিছানার চাদর পাওয়া গেল, ক্রয় করিয়া আনা গেল ও সেইগুলি ডোপযুক্ত ফেব্রিকের স্থানে সেলাই করা হইল। করাচীতে আসিয়া বিমান উপযুক্ত মেরামতের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসা হয়।

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ

অনির্বাণ

[চতুর্থ পাদ—পূর্বযোগ]

২৩

অতিমানস কালদৃষ্টি

অনন্তচেতনার দুটি বিভাব রয়েছে—একটি কালের অতীত, আরেকটি কালে প্রবহমান। যা কালে প্রবহমান, প্রাকৃতমন তারই খানিকটা দেখতে পায় কাল যেখানে চলে না, সেখানে তার দৃষ্টিও চলে না। তাইতে কালবাহিত আর কালাতীত—এদুটি সংজ্ঞা তার কাছে পরস্পরের বিরোধী। এই বিরোধের সৃষ্টি হয় বহির্মুখ চেতনাতেই, নইলে দুয়ের মধ্যে বস্তুত কোনও বিরোধ নাই। বাইরে যা ঘটছে, তার মধ্যে একটা পরম্পরা আছে বীজ হতে অঙ্কুর, তারপর ক্রমে পাতা ফুল ফল। এটা হল শক্তিপরিণামের একটা দিক—তার প্রবৃত্তির দিক। কিন্তু ফলের মধ্যে রয়েছে বীজ, গাছ তার মধ্যে গুটিয়ে আছে। এ হল শক্তিপরিণামের আরেক দিক—তার নিবৃত্তির দিক। কালের পর্বে-পর্বে ঘটনার বিন্যাস এবং বিস্তার। কিন্তু ঘটনার মূলে যে শক্তি আর ভাব, তার মধ্যে পর্বভেদ এত সংক্ষিপ্ত যে তা নাই বললেই চলে—আছে শুধু সম্ভূতির একটা প্রবেগ। কালপ্রবাহের সেই হল কালাতীত উৎস। উৎসে যা বিধৃত এবং সংহত, প্রবাহে তা-ই উৎসারিত। উৎস ছাড়া প্রবাহ হয় না। কালের ভিত্তি কালাতীত। ঘটনার ভিত্তি শক্তি এবং ভাব। শক্তি বা ভাবে অবগাহন করলে ঘটনার প্রবাহকে আগে থাকতেই ধরতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়। অন্তর্জগতে এর প্রমাণ খুব দুর্লভ নয়।

প্রাকৃত মনের গতি বাইরের দিকে, কালের প্রবাহে সে ভেসে চলেছে। উৎসের সন্ধান সে বড় একটা করে না। করতে গেলে চেতনার ধারাকে উজান বওয়াতে হয়—যেমন যোগে। কালাতীত উৎসে গেলে মন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিরোধসমাধিতে কিছুরই বোধ থাকে না, অথবা থাকে এক অনন্ত ব্যাপ্তিচৈতন্যের বোধ, আকাশানন্ত্যের বোধ—কিন্তু অনন্ত কালের বোধ নয়। ব্যুত্থানেও এই নিরোধের সংস্কার থাকে বলে মনোময় পুরুষের কাছে জীবনের কালিক প্রবাহকে মনে হয় যেন প্রারব্ধের অনিরুদ্ধ প্রবেগ, অর্থহীন একটা প্রবাহ, ছন্দোহীন একটা অনাসৃষ্টি। কালাতীত স্থিতি স্পষ্টত এখানে কালের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলে।

অতিমানস চেতনায় কিন্তু কাল এবং কালাতীতের আনন্ত্য একসঙ্গে বিধৃত থাকে। বিশুদ্ধ চৈতন্য কালাতীত শিব, আর শক্তি কালী। শিব আর শক্তি অবিনাভূত। কালাতীতে কালী সংহৃত, আবার কালে কালাতীতেরই হৃদয়ে নৃত্যপরা। বিজ্ঞানীর অনুভবে দুটি যেন তুলাধৃত। কালের ভূমিতে থাকলেও তিনি কালাতীতে প্রতিষ্ঠিত; আবার গুহাহিত কালাতীত স্বরূপে নিস্পন্দ থেকেই তিনি কালে স্পন্দিত বিচ্ছুরিত এবং কৃত্যকারী। আত্ম-সংহৃত তাদাত্ম্যের বোধে যেমন তিনি কালাতীত, তেমনি আত্মবিস্থষ্টির উল্লাসে কালময়। আবার গঙ্গোত্রী হতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত কালের সমগ্র ধারাটি তাঁর চেতনায় বিধৃত বলে তিনি যুগপৎ ত্রিকালদর্শী।

এই ত্রিকালদর্শিতা বা কালানন্ত্যের চেতনার পূর্ণ স্ফুরণ কেবল অতিমানসের তুঙ্গতম ভূমিতেই সম্ভব। যোগের সহায়ে আত্মচৈতন্যের ক্রমবিকাশের ফলে আমরা তার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। তার জন্য পর-পর চেতনার তিনটি ভূমি আমাদের পার হয়ে যেতে হবে।

প্রথম ভূমি হল অবিদ্যার। অচিতি (Inconscience) হতে অবিদ্যায় (Ignorance) উত্তরণ—চেতনার ক্রমবিকাশের এই হল শুরু। অচিতি—অবিদ্যা—বিজ্ঞান। অচিতি কিছুই জানে না—যেমন জড়প্রকৃতিতে; যদিও চোখ বুজে সে এক অন্তর্গূঢ় বিজ্ঞানের শাসনই মেনে চলে নিয়তিকৃত নিয়মের তাড়নায়। তার মধ্যে ক্রমে উন্মেষিত হয় অবিদ্যা। সেও পুরাপুরি জানে না, কিন্তু জানতে চায়, বুঝতে চায় তার মনের মুকুরে কোন্ অজানার আলোর ঝলকে কিসের ইশারা। জ্ঞান তার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত নয়, বহু আয়াসে বাইরে থেকে তাকে তার অর্জন করতে হয়। অন্তরের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে সে তাকিয়ে আছে শুধু বাইরের দিকে।

এই অবিদ্যা সর্বজীবসাধারণ। কিন্তু মানুষের মধ্যে এসে শুরু হয় তার রূপান্তর। বহিশ্চেতনতার সঙ্গে-সঙ্গে জাগে আত্মসচেতনতা, দৃষ্টির মোড় ক্রমে বাইর থেকে ফেরে ভিতরের দিকে। মানুষ দেখতে পায়, তার অনুভবের যে-অর্থ, বাইরের বস্তু তার আশ্রয় হলেও তার তাৎপর্য নিহিত রয়েছে অন্তরের ভাবে। বাইরের জগতের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে তার অন্তশ্চেতনা যে ক্রমে বিকসিত হয়ে উঠছে, এতেই তার জীবনের সত্যকার সার্থকতা। আত্মচৈতন্যের উদ্‌বোধনে বাইরের সঙ্গে ক্রমে সে অনুভব করে একটা অদ্ভুত নিবিড় আত্মীয়তা—যা তার প্রাকৃত প্রয়োজনের বাইরে। এর সাধারণ প্রকাশ দরদী চিত্তের সংবেদনায়। সংবেদনা মানুষের প্রতি, সর্বজীবের প্রতি—এমন-কি সর্ববস্তুর প্রতি। বাইরের জগৎ তখন আর শুধু বাইরে নয়, সে আমার অন্তরেও। তাকে জানা শুধু আর ইন্দ্রিয়-মন দিয়ে নয়, হৃদয় আর বোধি দিয়েও। এই বোধি প্রাকৃতমনের গণ্ডীরে আবিষ্কার করে বিশ্বমনের

সেই মহাসমুদ্রকে, আর-সব মন যার একেকটা ঢেউ। অবিদ্যা তখন চলে বিদ্যার রূপান্তরের পথে। তার লক্ষণ অন্তর্মুখীনতা, আত্মসচেতনতা, আত্মচৈতন্যের ব্যাপ্তি এবং সর্বাত্মভাব। তখন কোন-কিছুকে জানার অর্থ বিষয়ের স্পর্শটুকু নিয়ে নিজের গভীরে তলিয়ে গিয়ে যে মূলীভূত বিশ্বশক্তি হতে বিষয়টি উদ্‌গত হয়েছে, তার সঙ্গে একাত্মক হয়ে তাকে জানা।

এ-জানা শুধু প্রাক্তন সংস্কারবশে উপরভাসা জানা নয়, বস্তুর মূলে স্বভাবের প্রবর্তনাকে জানা। কারণকে জানি বলে কার্যে তার যে-বিক্ষেপ, তাকে তখন ঠিক-ঠিক ধরতে পারি। জানার এই ধরন কিছুটা প্রাকৃত ভূমিতেও দেখা দেয়, আমরা যখন একটা-কিছু 'তলিয়ে বোঝবার' চেষ্টা করি। কিন্তু সাধারণত সে-তলানো একেবারে বিশ্বমূল আত্মচৈতন্যে তলানো নয়, বহিশ্চেতনার খানিকটা গভীরে যাওয়া মাত্র। কিন্তু তাতেও বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান যে 'সংযম' বা সমাধিলভ্য একাগ্রপ্রত্যয়ের উপরেই নির্ভর করে—যোগের এই সূত্রের সত্যতাই প্রমাণিত হয়। সর্বজ্ঞতার অভিমুখে চেতনার উত্তরায়ণের এই হল দ্বিতীয় ভূমি।

তৃতীয়ভূমি বিজ্ঞানের সহজভূমি। চেতনা তখন সম্যক্ সম্বুদ্ধ, নিয়ত আত্মনিয়ত। কিন্তু এই নিয়তির অর্থ বাইরের জগৎকে ভুলে থাকা নয়। অবস্থাটা অত্যন্ত গভীর অথচ সহজস্থিতির একটা অবস্থা বলে সূর্যমণ্ডল হতে যেমন কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি জ্ঞান এখানে অন্তর হতে অনায়াসে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এমনিতর একটা বিচ্ছুরণ প্রাকৃত মনেও আছে স্মৃতি আর কল্পনা নিয়ে আমরা অনবরত একটা অন্তর্জগৎ গড়ছি আর ভাঙছি যা বাইরের জগতের উপর নির্ভর করলেও তার সঙ্গে সর্বাংশে খাপ খায় না। কিন্তু প্রাকৃত-মনের এই ভাঙা-গড়া হল সত্য-মিথ্যার তেজালে তৈরী অবিদ্যার খেলা। চিত্তের ভূমি সেখানে ক্ষিপ্ত অথবা মূঢ়, ক্বচিৎ 'বিক্ষিপ্ত'। কিন্তু ওই তৃতীয়ভূমি শুদ্ধসত্ত্ব একটি যোগভূমি। মূলের সঙ্গে যুক্ত আছে বলেই স্থূলে তার অভিব্যক্তিতে বিকার দেখা দেয় না। সে যা দেখে তা ঠিক দেখে, যা জানে তা ঠিক জানে। দ্বিতীয় ভূমির সঙ্গে এই ভূমির তফাত এই যে, ওতে জ্ঞান আহরণের খানিকটা আয়াস আছে, কিন্তু এতে জানার ব্যাপারটা একেবারে অনায়াস। অন্ধকার অথচ চেনা ঘরে আলো জেলে দিলে যেমন হয়, এও যেন তেমনি অন্তরের আলোতে চেনা জিনিসকেই আবার জানা। দ্বিতীয়ভূমিতে অনুভব হয়, যেন ভুলে-যাওয়া জিনিসকে আবার জানছি—জ্ঞান একটা প্রত্যভিজ্ঞা। কিন্তু তৃতীয়ভূমিতে জ্ঞান নিত্য-জাগ্রত এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

বিজ্ঞানময় চিত্তের এটা হল স্বভাব এবং সম্ভাব্যতার দিক। কিন্তু মনের ভূমিতে কাজ করতে গিয়ে তাকে মনের শর্ত মেনে চলতে হয়, যেমন অভিমানসকেও মানতে হয়। মন তখন বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত থেকেও তার সবটুকু কখনও ধারণা করতে পারে না। কিন্তু ইচ্ছা করলে বিজ্ঞান তার যে-কোনও বিভাব মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারে। মন তখন যন্ত্র, আর বিজ্ঞান যন্ত্রী। বিজ্ঞান সর্বজ্ঞ, কিন্তু তার জ্ঞান মনে স্ফুরিত হয় বিজ্ঞানের সঙ্কল্প

এবং মনের ধারণসামর্থ্য অনুসারে। প্রাকৃতভূমিতে বিজ্ঞানীর সর্বজ্ঞতা সে-ভূমির আইন মেনে এইভাবেই কাজ করে।

অতিমানসের দিকে যেতে-যেতে মনকে এই স্তরগুলি পার হতে হয় এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে তার কালজ্ঞানেরও বিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতভূমিতে মানুষের কালজ্ঞান নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। তার কাছে বর্তমান ক্ষণই খুব স্পষ্ট, অতীত আর ভবিষ্যৎ আবছা। ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে সে ভেসে চলেছে—কোথায় তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না। যে-কালকে সে অতিবাহন করে এল, তার প্রত্যয়ও তার কাছে একটা আবছা সংস্কারে পর্যবসিত : তা আর তার কাছে জীবন্ত নয়, একটা প্রেতচ্ছায়ার শামিল। কালিক অনুবৃত্তির (continuity) একটা সামান্যবোধ তার আছে, নইলে তার ব্যবহার চলে না তার এক মেরুতে অতীতের স্মৃতি, আরেক মেরুতে ভবিষ্যতের কল্পনা—যার নির্ভর অতীত অনুভবের সজাতীয়তা (uniformity) এবং পৌনঃপুনিকতার উপর। বরাবর যখন এইরকমটা হয়ে এসেছে, তখন এবারও তা-ই হবে—এই একটা প্রত্যাশা তার ভবিষ্য কল্পনার উৎস। কিন্তু এরকমটা যে হবেই, তা সে জোর করে বলতে পারে না। তার চাইতে যা হয়েছে তা নিশ্চিত, কিন্তু তার অনুভব উজ্জ্বল নয়। সুতরাং আগে-পিছনের একটা বিরাট অন্ধকারের মধ্যে তার অনুভবের ক্ষণিকা যেন জোনাকির আলোর মত টিপটিপ করে জ্বলে চলেছে—এই হল তার কালজ্ঞানের চেহারা।

বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বর্তমান অনুভবের এই ক্ষণস্থায়িত্বকে ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন তাঁদের বিখ্যাত ক্ষণভঙ্গবাদ। এই মতে সব-কিছুই ক্ষণিক—যেমন অন্তরের অনুভব, তেমনি বাইরের বস্তুস্থিতি। অনুভব যদি ক্ষণিক হয়, আমার এই ক্ষণের অনুভব যদি পরক্ষণেই বিলীন হয়ে যায়, আর আমার অনুভবই যদি হয় আমার আত্মভাব, তাহলে শাশ্বত আত্মা বলে কিছুই নাই। আমার অতীত মৃত, ভবিষ্যৎ অজাত ; আমি আছি শুধু বর্তমানের এই ক্ষণটিতে। তার পরক্ষণেই এই আমি ভেঙে গিয়ে দেখা দিল আরেক আমি আর একটি ক্ষণের জন্য। এমনি করে আমার আমি গুঁড়িয়ে গেল, যদি থাকবার কিছু থাকে তো রইল এক অপ্রমেয় শূন্যতা। এই শূন্যতাই আত্মভাব এবং জগতের তত্ত্ব। ক্ষণ হতে ক্ষণান্তরে চেতনা বা শক্তির অনুবৃত্তি একটা বিকল্প (mental construction) মাত্র।

একেবারে উপরভাসা আমাদের প্রাকৃতচেতনাকে অবলম্বন করে এমনিতর একটা দর্শন দাঁড় করানো যায় বটে ; এবং তা যে সর্বনাশা অনুভবে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে, তার প্রামাণ্যও অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সত্যই চেতনার সবখানি সত্য নয়। বৌদ্ধের এই বিশ্লেষণ প্রাকৃতবুদ্ধির বিশ্লেষণ, যে-বুদ্ধি এক্ষেত্রে একধরনের আণবিক বিভঙ্গবাদকে (atomic analysis) আশ্রয় করেছে। বিশ্লেষণে বস্তুকে অণু-পরমাণুতে ভাঙা

যায় বটে, কিন্তু তাতেই তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। যা ভাঙলাম, তাকে আবার জুড়ে দেখাতে হবে। তখন বিশ্লিষ্ট অবয়ব অবয়বীতে (whole) সংশ্লিষ্ট হয় কি করে? 'অদৃষ্ট'বাদী নৈয়ায়িক বললেন, হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু কি করে হয় তা জানি না। সাংখ্যবাদী আরও গভীরে গিয়ে বললেন, হয় শক্তিতে; শক্তির স্বভাব হচ্ছে পরিণাম, অনুবৃত্তিই তার ধর্ম। আমাদের বিশ্লিষ্ট অনুভবের একটি ক্ষণের গভীরে যদি তলিয়ে যাই, তাহলে দেখব ওই ক্ষণটি একেবারে পূর্বাপর ব্যবচ্ছিন্ন নয়। অতীত হতে শক্তির প্রবাহ তার মধ্যে সংহত হয়ে একটা ভবিষ্য সার্থকতার দিকে উদ্যত হয়ে রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে নিরর্থক ওই ক্ষণটিতে অর্থের বিধান করছে শক্তির পরিণাম। অনুভব যত গভীর হবে, পরিণামের অনাদ্যন্ত ধারাবাহিকতা চেতনায় ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখন বুঝব, ক্ষণভঙ্গে কালের বাইরের পরিচয় শুধু, তার সত্তাকার পরিচয় অনুবৃত্তিতে। আত্মনিবৃতি যত গভীর হয়, কালিক সংহতির অনুভবও তত স্পষ্ট হতে থাকে। অবশেষে বীজের মধ্যে বনস্পতির মত একটি ক্ষণের মধ্যে শাশ্বত কালকে সমাহিত দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষণ তখন অনন্তের ভ্রূণ। ক্ষণের সংহতিকে আশ্রয় করে শাশ্বতের বিস্তার—এই হল কালিক আনন্ত্যবোধের সঙ্কেত।

প্রাকৃতভূমিতে বর্তমান ক্ষণের অনুভব সবচাইতে তীব্র হলেও মানুষ কিন্তু বস্তুত ক্ষণ-জীবী নয়। জীবনের পথে চলতে গিয়ে তাকে সামনে-পিছনে তাকাতেই হয়। অতীতকে জীর্ণ করে নিয়ে মন থেকে তাকে মুছে ফেলা যায়, কিন্তু জীবনের বেগে ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে সে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি জানা যায়? সবটা না জানতে পারলেও কিছুটা যে জানা যায় না, তা নয়। এক্ষেত্রে কার্য-কারণের জ্ঞান আর প্রাকৃতিক ব্যাপারের সারূপ্য (uniformity) তার মস্ত বড় সহায়। প্রকৃতিতে একই কারণ থেকে একই কার্য একই ধরনে বারবার দেখা দেয়। এই সূত্রকে অবলম্বন করে জড়বিজ্ঞানী জড়ের ভবিষ্যৎ ব্যবহারের একটা নিখুঁত ছক এঁকে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্ব জড়ের ক্ষেত্রে যতখানি সার্থক, প্রাণ আর মনের ক্ষেত্রে বস্তুত ততখানি সার্থক নয়।

তার কারণ, প্রাণ আর মনের চলন যেমন সূক্ষ্ম তেমনি জটিল। কার্য-কারণের সূত্র এখানে তৈরী হয়েছে বহু বিচিত্র তন্তুর পাক দিয়ে, যার সবখানি প্রাকৃতবুদ্ধির গোচর নয়। একটা কারণ-সামগ্রী (totality of causes) হতে একটা কার্য-সামগ্রীর মোটামুটি আন্দাজ সে করতে পারে; কিন্তু তা যে সর্বাংশে সত্য হবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নাই। একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেছিলেন, রেলের উপর একটা এঞ্জিন ছুটে আসছে, আরেকটা পিঁপড়াও বাঁচছে; এঞ্জিনের গতিরেখা আমরা জানি, কিন্তু পিঁপড়াটা প্রাণ বাঁচাতে ডাইনে না বাঁয়ে যাবে তা বলতে পারি না। তাইতে প্রাণ আর মনের ক্ষেত্রে কি ঘটবে, মানুষ তার গড়পড়তা একটা আন্দাজ করতে পারে মাত্র, নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারে না। বস্তুত, একদিকে রয়েছে জড়ের নিয়ম, আরেকদিকে চৈতন্যের সর্বগ্রাহী তটস্থ স্বাতন্ত্র্য;

শক্তিসমন্বিত হলেও আসলে দুইই স্থাণুধর্মী। দুয়ের মধ্যে প্রাণ আর মনকে আশ্রয় করে প্রকাশ পাচ্ছে শক্তির বিচ্ছুরণ। সে-বিচ্ছুরণে তার স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস, সে অঘটনঘটন-পটীয়সী। সে-উল্লাসের ক্ষেত্র জড়, আর অধিষ্ঠান চৈতন্য। জড় শব, আর চৈতন্য শিব; দুইই স্থাণুধর্মী। দুয়ের বুকে শক্তির নৃত্য অন্তহীন সম্ভাবনায় বুদ্ধির অপ্রমেয়। আধুনিক জড়বিজ্ঞানীও স্বীকার করেন, জড়ের গভীরে শক্তির উল্লাসে রয়েছে এক অনিশ্চয়তা (indeterminacy)। জীবাত্মার (Soul) ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্যে তারই আভাসন। পরমাত্মার (Spirit) ইচ্ছা আনন্ত্যাবগাহী, অতএব দুর্জ্ঞেয়। সে-ইচ্ছার প্রশাসন স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে অন্বিত, কেননা তার স্বরূপ হল তাঁর আত্মবিভাবনা (self–formation)। তিনি বহু হচ্ছেন: সে-হওয়ার নিয়ম আছে, একটা ছক আছে; কিন্তু বহুত্বের কোনও নিয়ম নাই। তিনি কখন কি যে হতে পারেন, কেউ তা বলতে পারে না। অতএব মূলে পাচ্ছি, এক বিশ্বতোমুখ ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য এবং তারই যে-কোনও একটি ধারায় নিয়মের নৈশ্চিত্য। এই নৈশ্চিত্যের জ্ঞান তখনই সম্ভব, যখন আমরা ওই মূল ইচ্ছায় অবগাহন করতে পারি। এ যেন বীজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বনস্পতির ভবিষ্য ইতিহাসের অবধারণ। ত্রিকাল-দর্শিতাও এই রীতিতেই সম্ভব।

ত্রিকালদর্শিতার কিছুটা আভাস প্রাকৃতমনেও যে না ফোটে, তা নয়। সাধারণত তা দেখা দেয় অস্পষ্ট প্রাতিভসংবিতের আকারে। যেমন কখনও-কখনও অনুমানের কোনও হেতু বা ইচ্ছার কোনও তাগিদ না থাকা সত্ত্বেও মন ডেকে বলে, আজ এই হবে; এবং ঠিক তা হয়ও। এইধরনের প্রাগনুভব (presentiment) কোনও-কোনও ব্যক্তিতে বা জাতিতে বেশ পরিস্ফুট। আসলে এগুলি প্রাণ ও মনের একধরনের সহজসংস্কার (instinct) যা ইতরপ্রাণীতে প্রকট, কিন্তু তর্কবুদ্ধির (logical reason) বিকাশ ঘটাতে গিয়ে মানুষের মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। অনুশীলনের ফলে এদের আবার ফুটিয়ে তোলা যায় বটে, কিন্তু তবুও ইতরপ্রাণীর মত অবিসংবাদী তারা কোনকালেই হয় না। কেননা, প্রকৃতি চায় না, মানুষ আবার পশুর স্তরে ফিরে যাক। তাই সহজসংস্কারের নৈশ্চিত্য অর্জন করবার জন্য মানুষকে ঊর্ধ্বায়ন বোধির শক্তিকে আবাহন করতে হয়। বোধিজাত যে-প্রাগনুভব, তার ধরন আলাদা। সহজাত প্রাগনুভবের উৎস চেতনার কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু বোধি হতে তার উৎসারণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িয়ে বেশ স্পষ্ট লক্ষ্যগোচর হয়। তবুও তার মধ্যে মানস-সংস্কারের তেজাল থাকতে পারে। তাকে বিশুদ্ধ করতে হলে চেতনাকে আরও ঊর্ধ্বে তোলা দরকার হয়।

বুদ্ধি অনেকসময় বোধির সহজ স্ফুরণের বাধা, অথচ ভবিষ্যৎ জানবার আগ্রহ তার

প্রবল। তাই দায়ে পড়ে সে নানা বিকল্পের আশ্রয় নেয়, যেমন শকুনবিদ্যা (cult of omens), করকোষ্ঠি, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি। অবশ্য 'সুবুদ্ধি এদের ওড়ায় হাসে'। কিন্তু তবুও মাঝে-মাঝে এসব আবার ফলতেও দেখা যায়। বিশ্বের সবার সঙ্গে সবার ওতপ্রোত সম্পর্ক, সুতরাং এইসব অপজ্ঞানের মূলে খানিকটা বিজ্ঞান থাকা অসম্ভব নয়। তবে আসলে সে-বিজ্ঞানের ধারক এবং পোষক হচ্ছে বোধি, বুদ্ধির কোনও কসরত নয়। যারা এসব নিয়ে কারবার করে, তারাও শেষপর্যন্ত সার্থকতা অর্জন করে বস্তুত বোধির দৌলতে।

সত্যকার ত্রিকালদর্শিতার স্ফুরণ শুরু হয় চৈত্যসত্ত্ব ও চৈত্যবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে। চৈত্যসত্ত্ব অধিচেতন পুরুষের (subliminal Self) বিভূতি। উপনিষদে ইনি 'স্বপ্ন-স্থান' পুরুষ এবং যোগের 'স্বপ্নজ্ঞান' চৈত্যানুভবের সমার্থক। প্রাতিভসংবিৎ এর অন্তর্গত এবং তার পরিধি যে বলতে গেলে অনন্তবিস্তৃত, একথা আগেই বলেছি। চৈত্যসংবিতের (psychical sense) দাঁহায়ে চিত্তাকাশে দেশ-কালের ব্যবধান ডিঙিয়ে বাইরের ছবি দেখা যেতে পারে, এও বলেছি। দূরদর্শন দূরশ্রবণ ইত্যাদি যোগের ক্ষুদ্রসিদ্ধি এইধরনের। এরা আধ্যাত্মিকতার সূচক মোটেই নয়। এগুলি কারও মধ্যে সহজাত, আবার কারও মধ্যে কোনও কারণে নেপথ্যের পরদা সরে গিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হয়। কি করে এগুলি হয়, তারা তা বলতে পারে না। কিন্তু অধ্যাত্মচেতার মধ্যে একটা বিশিষ্ট চিৎপরিণামের ফলে এরা দেখা দেয় বিশ্বমনের আত্মরূপায়ণের স্পন্দরূপে। চৈত্যসংবিৎ যদি অনাবিল ও সংস্কার-মুক্ত হয়, তাহলে এদের ধারণা এবং বিবৃতিও হয় যথাযথ।

চৈত্যসত্ত্বের পুষ্টি এবং চৈত্যানুভবের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ত্রিকালদর্শিতার নানা 'প্রকারে'র (modes) স্ফুরণ হয়। চৈত্য বা অধিচেতন পুরুষ তখন চেতনাকে পিছনে হটিয়ে নিয়ে সুপ্ত অতীতকে জাগিয়ে তুলতে পারেন কিংবা ভবিষ্যৎকে আভাসিত করতে পারেন। এর উপায় হচ্ছে, যে-তত্ত্বের মধ্যে ভাব বা বস্তুর বীজসত্তা নিত্যবিধৃত হচ্ছে, তাতে অবগাহন করে তার সঙ্গে একাত্মক হওয়া এবং সেই সংহত আত্মচৈতন্য হতে কাল-কলনাকে উৎসারিত করা। আগেই বলেছি, বনস্পতির ইতিহাস কালে বিস্তৃত কিন্তু বীজ-শক্তিতে সংহত। কালব্যাপ্তির যে-কোনও পর্ব হতে অন্তরাবৃত্ত চেতনাকে যদি বীজশক্তির মধ্যে তলিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেখান থেকে বনস্পতির পূর্বাপর সমগ্র ইতিহাসকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। এমনি করে চিদাকাশে অজানার আলেখ্যকে ফুটিয়ে তোলা, অবচেতন স্মৃতির গহন হতে অতীতকে এবং অব্যক্তের গর্ভাশয় হতে ভবিষ্যৎকে উদ্ধার করা এবং অনাকুল চৈত্যসংবিতের দ্যুতিতে তাদের উজ্জ্বল করে তোলা, প্রতীকের মাধ্যমে জড়োত্তর ভূমির সত্যকে চিত্তাকাশে প্রতিফলিত করা, আকাশলিপিতে ত্রিকালের ইতিহাস পাঠ করা—চেতনার অন্তরাবর্তনের ফলে এসবই সম্ভব। নেপথ্য হতে যে-সব অলৌকিক এবং দিব্য শক্তি আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে, এই উপায়ে তাদেরও সাক্ষাৎভাবে অনুভব

করা যায়। এই বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধি হচ্ছে অতিচেতনার গহনে ডুবে ঈশ্বরসঙ্কল্পের সাক্ষাৎকার।

চৈত্যানুভবের উন্মেষের ফলে জাতিস্মরতা, ভুবনজ্ঞান ইত্যাদি নানারকমের বিভূতি দেখা দিতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে সাধককে গোড়াতেই সাবধান করে দেওয়া ভাল চৈত্যসত্বের জ্ঞান একেবারে প্রথম থেকেই প্রমাদশূন্য হয় না। মনের কাছাকাছি তার বাস বলে মানসসংস্কারের প্রভাব তার উপর পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। তাই বোধি বা অতিমানসের আবেশ দিয়ে তার শক্তিকে পদে-পদে শোধন করে নিতে হয়। সাধকের তটস্থতাও শুদ্ধির সহায়ক। প্রথম যখন বিভূতি ফুটতে থাকে, তখন তার প্রতি কোনরকম আগ্রহ না রাখাই ভাল। বাইরের মত অন্তরেও এক বিরাট জগৎ রয়েছে। তার মধ্যে কত-কিছু ফুটছে ঝরছে—আপন খেয়ালে। সাধক যদি নিঃস্পৃহ থেকে কেবল তাদের দেখে যান, তাহলে অদৃশ্য এক ঋতায়িনী শক্তির প্রভাবে ক্রমে তারা গুছিয়ে আসে, অবিদ্যার আবিলতা দূর হয়ে শুদ্ধবিদ্যার আবেশে তারা সত্যবহ হয়। জানতে হবে, নিজেকে সবসময় বিবিক্ত এবং ঊর্ধ্বশক্তির প্রতি উন্মুখ রাখা যোগের একান্ত অনুকূল।

*

চেতনার অন্তরাবৃত্তি এবং আত্মস্থিতির ফলে চৈত্যানুভব যখন সক্রিয় হয় আর অধিচেতনার বার্তা প্রাকৃতচেতনায় বুদ্‌বুদের মত ভেসে উঠতে থাকে, তখন সাধকের মধ্যে বিজ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞার (recognition) আকার ধারণ করে। গভীর হতে যা ভাসে তাকে দেখে মনে হয়, এ যেন জানা জিনিসকেই দেখছি—অজানাকে নয়। এ একরকমের স্মৃতি, কিন্তু প্রাকৃত স্মৃতির মত নয়। প্রাকৃত স্মৃতি অতীতের কোনও বিশিষ্ট ঘটনাকে জানে; আর এই ধ্রুবা স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা আবিষ্কার করে বিশেষের মূলীভূত সামান্যভাবকে যার ব্যঞ্জনা তিন কালেই ব্যাপ্ত। আমি কাল বিকালে কোথায় গিয়েছিলাম, আজ সকালে তা মনে করতে পারি এটা হল সাধারণ স্মৃতি। কিন্তু আমি যদি অন্তরাবৃত্ত হয়ে আত্মস্বরূপে অবগাহন করি, তাহলে সে-অনুভবের কালিক প্রকার (mode) হবে—আমি এই ছিলাম, এই আছি এবং এই থাকবও। আমি নিত্যকাল ধরে যা, এ-অনুভব তারই পুনরাবিষ্কার। তাই এ স্মৃতি বটে; কিন্তু ভবিষ্যৎকেও কুক্ষিগত করে বলে এ আবার স্মৃতিও নয়। এর দার্শনিক পরিভাষা হল 'প্রত্যভিজ্ঞা'। যেমন আত্মস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, অধিচেতন ভূমিতে তেমনি বস্তুস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞাও সম্ভব। আত্মস্বরূপের প্রত্যয় একরস, সদৃশ-পরিণাম (homogeneity) তার বৈশিষ্ট্য; আর বস্তুস্বরূপের প্রত্যভিজ্ঞা সেই ভূমিতেই বিসদৃশপরিণামের তরঙ্গভঙ্গ, ভাব হতে বস্তুর ভাবনা।

প্রথম অবস্থায় প্রত্যভিজ্ঞার রূপটি মানস-সংস্কারের মিশ্রণের দরুন হয় অবিশুদ্ধ। তার প্রতিকারের জন্য বোধির অনুশীলন প্রয়োজন। মন খণ্ডদর্শী, সীমিত অহংএর চাহিদা মেটাতে গিয়ে সহজ সত্যকে সে বাঁকাচোরা করে দেখে। অথচ এই মনেরই পিছনে রয়েছে

বোধি—অখণ্ডদর্শন যার স্বভাব। বস্তুর মূলে সে দেখে ভাবকে, আর সে-ভাব তার আত্মবোধেরই একটি প্রকার। আত্মবোধের বিচ্ছুরণে ভাবের যে-উল্লাস, বস্তুর ইতিহাসে তারই কালিক অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিকে বোধি স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টিতে দেখে, সীমিত বাসনার রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে নয়। তাই তার দর্শন হয় অবিকল্প সত্যের দর্শন। শাশ্বতের প্রবাহ সংহত হয়ে আছে যে-পরমক্ষণে, তা-ই হতে উৎসারিত হয় তার কালের কলনা। তাই তিনটি কালকেই সে একসঙ্গে দেখতে পায় অতীত তার কাছে বিস্মৃত নয়, কিংবা ভবিষ্যতও অজ্ঞাত নয়।

বোধিজাত এই ত্রিকালদৃষ্টির অভিব্যক্তি হয় ধীরে-ধীরে, কেননা বোধিকে প্রথমটায় মনের বাধা কাটিয়ে কাজ করতে হয়। মন হল অজ্ঞানের শক্তি, আর বোধি বিজ্ঞানের। অজ্ঞান আলো-আঁধারির মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে চলে, দেখার ন্যূনতাকে সে পূরণ করে বিকল্প (constructions) দিয়ে। কিন্তু বোধির কাছে সবই দিবালোকের মত স্পষ্ট। প্রথমটায় অজ্ঞানে-বিজ্ঞানে মেশামিশি থাকে বলে ত্রিকালদৃষ্টির শক্তি ব্যাহত বা বিকৃত হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

মনের বিকল্প দুরকমের হতে পারে। একরকম বিকল্পের সৃষ্টি হয় বাসনার প্ররোচনা থেকে। মন ঘটনার গতিকে তটস্থ হয়ে দেখতে অভ্যস্ত নয়। সে যেমন চায় ঘটনার পরিণাম তেমনই হ'ক, এমন-একটা ইচ্ছা সে সবসময় পোষণ করে। এ-ইচ্ছা হয়তো তার ব্যক্তিগত, ঋতচ্ছন্দা সত্যসঙ্কল্পের কোনও প্রকাশ নয়। দৃষ্টি তখন বাসনার রঙে রাঙিয়ে যায়, সত্যের নির্বিকল্প শুভ্র রূপটি দেখা আর সম্ভব হয় না। কখনও আবার এই অনুরঞ্জন আসে বাইরে থেকে মনের অজানতে বিশ্বশক্তির কোনও অবাঞ্ছনীয় প্রভাব তাকে অধিকার করে তার দৃষ্টিকে বদলে দেয়। মনকে সম্পূর্ণ বাসনাশূন্য করতে পারলে এইসব বিকল্পের অনাসৃষ্টি হতে সে রক্ষা পায় বটে, কিন্তু তাতে যোগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না। আমরা বিশ্বব্যাপারের শুধু উদাসীন উপদ্রষ্টা হতে চাই না, চাই তার কর্তা মহেশ্বরও হতে। দৃষ্টির বিশুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আমরা চাই সঙ্কল্পেরও সত্যসদ্ধ অবন্ধ্যতা। পরম পুরুষে দৃষ্টি আর সৃষ্টি জ্ঞান আর সঙ্কল্প এক। আমরা সেই সমর্থ দৃষ্টির শরিক হতে চাই। তাই দৃষ্টির বিশুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্কল্পের বিশুদ্ধিও আমাদের তুল্যভাবে সাধ্য। তার জন্য উপদ্রষ্টৃত্ব বা তটস্থতারও গভীরে আমাদের ডুবতে হবে, যেতে হবে অতিমানসের সেই পরম ধামে যেখানে জ্ঞান আর সঙ্কল্প এক।

মনের আরেকরকমের বিকল্পের মূল রয়েছে তার স্বভাবে। ঘটনাকে মন তিনভাবে দেখে—বাস্তব সম্ভাবিত এবং অবশ্যম্ভাবী। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অতএব বর্তমান, তা হল বাস্তব—তার আর নড়চড় নাই। অতীতও একরকম নিশ্চিত, যদিও তার অনেকখানি বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে আছে। কিন্তু গোল বাধে ভবিষ্যৎকে নিয়ে : তার কতটুকু সম্ভাবিত আর কতটুকু অবশ্যম্ভাবী, মন তা স্থির করতে পারে না। অথচ সত্যকে নিশ্চিতরূপে জানবার আগ্রহ

তার দুর্বার। আগেই বলেছি, একমাত্র জড়ের রাজ্যেই নিশ্চিত ভবিষ্যৎকে খানিকটা সে জানতে পারে, কিন্তু প্রাণ আর মনের রাজ্যে তেমন পারে না। ভবিষ্যৎ মনের কাছে প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয়। কিন্তু অনুমানের হেতু এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বা সুনিশ্চিত নয়। একমাত্র অবরোহ-অনুমানেই (deductive reasoning) নৈশ্চিত্য সম্ভব, যদি তার ভিত্তি সুনিশ্চিত হয়। ভিত্তির নিশ্চয় করে আরোহ-অনুমান (indeductive reasoning)। কিন্তু ব্যাপকভূয়োদর্শন বা কার্য-কারণসম্পর্কের অব্যভিচারী জ্ঞানের অভাবে আরোহ-অনুমানের প্রামাণ্যে ন্যূনতা থেকেই যায়। কোনও অনুমানই নিশ্চায়ক নয় বলে মন ভবিষ্যৎকে ঠিক-ঠিক জানতে পারে না। জানার গরজকে সে তখন সার্থক করে বাসনা-প্ররোচিত নানা বিকল্পের দ্বারা। আশা কত স্বপ্নই দেখে। কিন্তু সব স্বপ্ন কি আর সার্থক হয়। অথচ কাজ করতে গেলে স্বপ্ন না দেখেও তো উপায় নাই।

বোধিরও কারবার বাস্তব সম্ভাবিত আর অবশ্যম্ভাবীকে নিয়ে। কিন্তু তার জ্ঞানের সাধন হল অনুমান নয়, প্রত্যক্ষ। আর এ-প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়েরই নয়, প্রাতিভসংবিত্তেরও। সে শুধু বস্তুকে দেখে না, দেখে তার মূলে শক্তি ও ভাবের যে-প্রেরণা রয়েছে তাকেও। আত্মপ্রত্যক্ষের সঙ্গে না জড়িয়ে বস্তুতে শক্তি বা ভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং বোধির এই জ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞানেরই একটা প্রকার। বিষয়কে আত্মসাৎ করে যখন জানি অথবা 'হয়ে জানি', তখন আর তার মধ্যে অনুমানের অবকাশ থাকে না।

এই বোধিজ জ্ঞান সক্রিয় হতে পারে তিনটি ভূমিতে। বাস্তবের ভূমিতে তার প্রথম ক্রিয়া। প্রাকৃতমনেরই মত বোধি সেখানে ঘটনার প্রবাহ দেখে চলে, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার গভীরে শক্তি ও ভাবের যে-প্রবাহ তাকেও প্রত্যক্ষ করে। বলা বাহুল্য, এ-প্রত্যক্ষ কাল্পনিক নয়—এ একটা সংজ্ঞান বা সংবেদন অর্থাৎ নিস্তরঙ্গ আত্মানুভবের উপর বাইরের স্পন্দনকে অনুভব করে তার নিশ্চিত পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আত্মানুভবের সঙ্গে যোগ থাকাতে জ্ঞান তখন বাইর থেকে আহৃত না হয়ে ভিতর থেকে উৎসারিত হয় যা ঘটেছে এবং তার ফলে যা ঘটছে এবং ঘটবে, তা আমি আমার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। প্রথমটায় হয়তো ত্রিকালের পূর্ণপ্রত্যক্ষ হয় না—বর্তমানকে আশ্রয় করে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত হয় কারণের বা কার্যের প্রত্যক্ষই হয়।

এই বোধিজ প্রত্যক্ষ সুনিশ্চিত হলেও কতকটা উপরভাসা, কেননা ঘটনার উপরের প্রবাহ এখানে জ্ঞানের আশ্রয়। তার নীচে যে শক্তির প্রবাহ, তা অনন্ত সম্ভাব্যতার উৎস। এর মধ্যে আপাতত কিছুটা বাস্তবের আকারে নিশ্চিত হয়ে উপরে দেখা দিয়েছে। তার

সুদূরসম্ভাবী পরিণাম কি, তা বাস্তবাশ্রয়ী বোধির কাছেও সবসময়ে ধরা পড়ে না। তাছাড়া নীচের থেকে অতর্কিতের উদ্ভাস এমন-একটা ব্যাপার, যা উপর থেকে লক্ষ্য হয় না। উপরের ঘটনার মোড় নীচের ঠেলায় হঠাৎ বদলে যেতে পারে এবং এই বদলে দেওয়াটা শক্তির স্বাতন্ত্র্যের লীলা। অবশ্য লীলারও একটা নিয়ম আছে, কিন্তু শক্তির অন্তস্তলে না চুকলে তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

বাস্তবাশ্রয়ী বোধির এই ন্যূনতা পূরণ করে জ্যোতির্ময় চিদাবেশ (inspiration)। বিশ্বশক্তির গর্ভাশয়ে নিহিত রয়েছে অনন্ত সম্ভাব্যের ভ্রূণ। তার কোন্‌টি বাস্তবে পরিণত হবে, তা জানা যায় একমাত্র সেই শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে। অবশ্য শক্তি এখানে লীলোচ্ছলা। কিন্তু বলেছি লীলারও নিয়ম আছে। সে-নিয়ম বা 'যাথাতথ্যত অর্থের বিধান' তন্নিত হয় আরও গভীরে নিগূঢ় বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশশক্তির (revelation) দ্বারা। এই চিৎপ্রকাশ সর্বতোভাস্বর শাশ্বতনিত্যতা—ত্রিকালের সমস্ত পর্বই তার কাছে স্বরূপে অনাবৃত। একে আশ্রয় করেই কুরুক্ষেত্রে ভগবান বলতে পারেন, 'ধার্তরাষ্ট্রেরা আমার দ্বারা নিহত হয়েই রয়েছে, হে সব্যসাচী, তুমি বধের নিমিত্ত মাত্র হও।' বধ এক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী ; যা অবশ্যম্ভাবী তা-ই প্রাকৃতজগতে বাস্তব হচ্ছে। কিন্তু অবশ্যম্ভাবিতা আর বাস্তবতার মাঝখানে রয়েছে অনন্ত সম্ভাব্যতার আকারে শক্তির লীলায়ন। সে যেন টোপগেলা মাছকে খেলিয়ে ডাঙায় তুলছে। এই খেলিয়ে তোলাতেই বাস্তবের ভূমি থেকে তাকে মনে হয় অঘটনঘটনপটীয়সী। কিন্তু বস্তুত তার লীলাও ঋতচ্ছন্দা এবং সে ঋত-সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

বিচিত্র সম্ভাব্যতার ভিতর দিয়ে অবশ্যম্ভাবীর বাস্তবে রূপায়ণ—এই হল কাল-কলনার রহস্য। একে বোঝে আনা খুব সহজ নয়, কেননা মানস সংস্কার পদে-পদে তার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ত্রিকালদৃষ্টির সাধনা শুরু করতে হয় প্রাকৃত মনকে দিয়েই—যে-মন তিনটি কালের একটিকেই কেবল স্পষ্ট দেখতে পায়, আর-দুটি কাল যার কাছে আবছা। এই মনের অজ্ঞানকে প্রথম রূপান্তরিত করতে হয় প্রতাভিজ্ঞার এবং তার পরে বিজ্ঞানে। করতে গিয়ে মনকে নিথর করতে হয়, যাতে সে সংস্কারলেশশূন্য হয়। কিন্তু অমনীভাবে আবার কালজ্ঞান থাকে না, অথচ কালাতীতে না গেলেও কালজ্ঞান সম্যক্ হয় না।

এই সমস্যার সমাধান হতে পারে মনের রূপান্তরে—তাকে করে বোধিবাসিত, চিদাবিষ্ট এবং স্বপ্রকাশ করে তোলায়। বোধিই এ-সাধনার প্রধান সহায়। বোধি আছে মনের ওপারেই, তার ক্রিয়া নানাভাবে মনের মধ্যে হচ্ছেই। সুতরাং তার নাগাল পাওয়া খুব কঠিন নয়। এই বোধি আবার অতিমানস জ্যোতির বাহন। বোধি যদি অনুশীলনের ফলে চেতনায় সহজ হয়—আর তার জন্য মন বা বুদ্ধির অনুমানবৃত্তিকে দাবিয়ে দিয়ে মনকে প্রাতিভদর্শনে অভ্যস্ত করতে হবে—তাহলে বোধি প্রতিক্ষেত্রে অতিমানসের জ্যোতিকে নিজের মধ্যে নামিয়ে এনে নিজের প্রবৃত্তিকে (function) বিশুদ্ধ এবং সমর্থ রাখতে

পারে। বোধির সহায়ে তখন মনের অতিমানস রূপান্তর সম্ভব হতে পারে। তার পর্বভেদের কথা অন্যত্র বলেছি।

একথা মনে রাখতে হবে, পরম চেতনায় দৃষ্টিই সৃষ্টি বা আত্মরূপায়ণ। এ যেন নিজের ভিত্তিতেই আত্মগত বিশ্বের উন্মীলন। উন্মীলনের ধারাবাহিকতাই কাল। ধারার উৎস আত্মচৈতন্যে, ত্রিকাল সেখানে সংহত। সেই চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে সবটাকে দেখা আর করা অথবা হওয়া—একই কথা। ত্রিকালদৃষ্টির পরম তাৎপর্য এই সম্ভূতিতে। তা মাহেশ্বর্যের লক্ষণ এবং অপরা-প্রকৃতির রূপান্তরের প্রযোজক। পূর্ণযোগের পরমা সিদ্ধি এইখানে।

॥ সমাপ্ত ॥

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৫১

('মায়ের কথাবার্তা' হতে প্রশ্ন) "যোগের প্রথম অবস্থায় সাধকের পক্ষে সাধারণ বইগুলো পড়া কি ভালো ?

উত্তর : এ প্রশ্ন আমাকে অনেকবারই করা হয়েছে। তোমরা আগে বলো যে সাধারণ বই পড়ে কার কি লাভ হয়েছে, তাই আমি শুনতে চাই।

প্রশ্নকারী সাধারণ বই পড়লেই আমার ক্লান্তি আসে।

উত্তর এটা ভালোই লক্ষণ।

অন্য শ্রোতা ওতে আমি প্রভাবান্বিত হইনা, তবে মনটা কিছু বিশ্রাম পায়।

উত্তর : না, তা ঠিক নয়। অবচেতনের মধ্যে সব গিয়ে জমে, তুমি যে ভাবছ তার কোনো ক্রিয়া নেই, তার কারণ তুমি সেটা জানতে পারোনা। নিম্নচেতনার বইগুলো যতবারই পড়বে ততবারই তা অবচেতনকে নাড়া দিয়ে চঞ্চল করবে, তাতে তোমার চেতনার উন্নয়নকে বাধা দেবে। অবচেতনকে শুদ্ধ ক'রে আনতে যত কিছু প্রয়াস করেছিলে তার উপরে যেন বালতি বালতি নোংরা জল ঢেলে দেওয়া হবে।

এটা হওয়া অপরিহার্য, কিন্তু চেতনা যে ওতে কতখানি নেমে গেল তা কেউ লক্ষ্যই করেনা।

এমন অবস্থাও হতে পারে যখন সামান্য রকমের বাজে আলাপ আলোচনাও তোমাকে নীচেকার স্তরে নেমে আসতে বাধ্য করে, তখন মাথা ধরে ওঠে, পেট গোলাতে থাকে, আর বেশিক্ষণ তেমন চলতে থাকলে হয়তো জ্বরও এসে পড়ে। অবশ্য আমি বলছি যত অসার ধরনের "বাজে কথা" সম্পর্কে। অথচ বোধ করি কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকলেই এ কাজ ক'রে থাকে, এমন সব ব্যাপার নিয়ে বৃথা বাক্যব্যয় করা হয় যেখানে চুপ করে থাকাই ভালো, অবান্তর কথা নিয়ে মিছাই খানিকটা বক্ বক্ করা ইত্যাদি। এমন বেবাকুম ভাবে তা চলতে থাকে যে ওতে মোটে বিরক্তই হওনা। অথচ ওতে নিজের চেতনাকে উপরে উঠতে কেবল বাধাই দিতে থাকো। নিজেকে মামুলী চেতনাতে লোহার শিকল

দিয়ে বেঁধে রেখে দাও, আর অবচেতনের মধ্যে কোনো কাজই শুরু করতে পারোনা। যারা উন্নয়ন চাইছে তাদের এমনিতেই কত বাধা, তার উপরেও হতে থাকে এই ইন্ধন যোগানো।

চেতনাকে সর্বক্ষণ উপরে রাখতে চেষ্টা করা প্রথমটায় অবশ্য খুবই ক্লান্তিকর, যেমন মাংসপেশীর উন্নতির জন্য ব্যায়াম অভ্যাস করতে গেলেও হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে ব্যায়াম করা তো ছেড়ে দাওনা। মনের বেলাতেও ঠিক তাই করতে হবে। মনকে কখনো নীচে নামতে দেবেনা. "বাজে আড্ডা" কেবল নীচেই নামিয়ে দেয়, যোগ করতে চাইলে তা বর্জন করাই দরকার।

না আবার পড়তে শুরু করলেন তাঁর বই থেকে..."পবিত্র ধর্মপুস্তক পড়েও তুমি ভগবানের নৈকট্য থেকে অনেক দূরেই থেকে যেতে পারো—আবার নিতান্ত নির্বোধ রকমের কোনো সাহিত্যের বই পড়েও ভগবানের সংস্পর্শ পেয়ে যেতে পারো...ভগবৎ মিলনের অবস্থায় চেতনা এমন হয়ে যেতে পারে যে তুমি যাই পড়ছ আর যাই দেখছ তার থেকেই আনন্দ পাচ্ছ...কারণ জগতে এমন কিছু নেই যার মধ্যে ভগবানের সত্তা ও তাঁর সমর্থন শেষ পর্যন্ত নেই...অতএব বাহ্য অনুভবে যাকে নিতান্ত কদর্য, হীন, বিরক্তিকর ও বেসুরো ঠেকছে, সেই বাহ্য বিচারেই যদি থেমে না যাও, তাহলে তারও ভিতর দিয়ে সুবিমল সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দে গিয়ে পৌঁছতে পারবে"...

চেতনার যে অবস্থার কথা এখানে বলা হয়েছে তাতে অবশ্য পৌঁছতে পারা খুবই কঠিন ; ওর সাধনাতে বহু বছর লেগে যায় এবং এরূপ উপলব্ধি সকলের বেলাতে আসেনা। তবে ওর মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে, সে অবস্থাতে যত অবাঞ্ছিত জিনিস দেখা বা শোনা থেকে নিজেকে তফাৎ ক'রে নিতে হয়।

অতঃপর না পড়লেন অন্যরূপ প্রশ্ন প্রসঙ্গে....."বস্তুত যা-কিছু ঘটে গেছে তা ঘটবারই ছিল ; যা ঘটা উচিত নয় তা ঘটতে পারেনি। এমন কি যা কিছু ভুল কাজও আমরা করেছি আর যা কিছু বিপত্তি আমাদের ঘটেছে, তারও প্রয়োজন ছিল, অর্থাৎ আমাদের জীবনে তারও কিছু সার্থকতা ছিল। সত্য কথা বলতে কি, এ সব জিনিস মনের যুক্তি দিয়ে বোঝাবার নয় আর তা উচিতও নয়। যা কিছুই ঘটে তার প্রয়োজন থাকে, মনের যুক্তিতে নয়, কিন্তু মন যার কথা কল্পনাও করতে পারেনা সেই দিকে নিয়ে যাবার জন্য। আর সে কথা বুঝিয়েই বা কি হবে ? সমগ্র বিশ্বই প্রতি জিনিসের ব্যাখ্যা প্রতি মুহূর্তে দিচ্ছে, সেখানে বিশেষ কিছু ঘটছে, যেহেতু বিশ্ব তার সমগ্রতায় সেই রকমই..."

সমগ্র বিশ্ব প্রতি মুহূর্তে প্রতি জিনিসের ব্যাখ্যা দেয়। কথাটা খুবই দামী।

প্রশ্ন : আচ্ছা, কেউ যদি কোনো একটা ভাষা শিখতে চায়, তাহলে কি তাকে সেই ভাষার সাধারণ বইগুলি পড়ার দরকার হয়না, যেমন ফরাসীতে আলেকজান্দার দুমার বই ?

উত্তর : হাঁ, লেখক কেমনভাবে সেই ভাষাতে নিজেকে প্রকাশ করছে তা জানবার জন্য সেই ভাষার বইগুলি পড়া ন্যায্য। তাই বলে এই অজুহাতে যা খুশি তাই পড়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : কল্পনা করে লেখা গল্পের কি কোনো দাম নেই ?

উত্তর তা নির্ভর করবে সেই কল্পনার ধারার উপর। যদি বলো যে কল্পনারও উৎকর্ষ হওয়া দরকার, সে ঠিকই কথা, কিন্তু এটা দেখতে হবে যে অসত্য রকমের কল্পনাই না বাড়তে থাকে।

প্রশ্ন কল্পিত গল্প কি জীবনের ও সত্যের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটায়না ?

উত্তর সব ক্ষেত্রে নয়। আর "সত্যের সঙ্গে সংস্পর্শ" বলতে কি বোঝো ? সামান্য একটি বালুকণার মধ্যেও আছে একটি সত্য। অতএব এ কথার মানে হয়না।

জগতে অনেক বেশি নোংরা ব্যাপার আছে, বইএর মধ্যে তার ছবি দেখানোর কিছু কি দরকার আছে বলে মনে করো ? এ জিনিস আমাকে বরাবরই বিস্মিত করেছে, এমন কি অল্প বয়সেও—মানুষের জীবন এমনিতেই কত নোংরামিতে ভরা, গ্লানিপূর্ণ, এমন কি হীন ও ঘৃণার্হও হয়ে পড়ে, তার চেয়ে আরো বেশি কল্পনা ক'রে কি লাভ আছে ? বরং ওর থেকে সুন্দর কিছুর বা সুন্দরতর কোনো জীবনের কল্পনা যদি করতে পারো তাতে লাভ আছে। যারা নোংরা জিনিস নিয়ে লিখতে আমোদ পায় তারা এটাই প্রমাণ করে যে তাদের মন কত ছোটো, সেটা ক্ষুদ্র আত্মারই লক্ষণ। একটা সস্তা নাটকীয় পরিণামে বা ব্যর্থতায় ও ও দুর্গতিতে সমাপ্ত গল্প লেখার চেয়ে আগাগোড়া সৌন্দর্য সুষমায় ভরা গল্প লেখা অনেক বেশি কঠিন। তেমনি গল্প লিখতে বললে অনেক লেখকই তা পারবেনা, ততদূর পর্যন্ত কল্পনার দৌড় তাদের নেই। খুব কম গল্পই তোমাকে উচ্চে ওঠাতে পারে, অধিকাংশই নীচে নামিয়ে দেয়—তার সোজা কারণ এই যে উঠতে পারার চেয়ে নামতে পারাই সহজ। একটা উচ্চ ভাব নিয়ে গৌরবের সঙ্গে গল্প শেষ হবে, গল্পের নায়ক নিজেকে ছাপিয়ে চলে যাবে, এমন লেখা খুবই কঠিন, তার জন্য যে প্রতিভা চাই তা সকল লেখকের থাকেনা।

"সাধারণ বইগুলি পড়ে মনে হয় যে লেখকের নিজের মনের কথা তুমি সব জেনে ফেললে, তা সব সময় ভালো লাগেনা। এও দেখেছি যে বাইরের কারো সঙ্গে যতক্ষণ কাজের কথা বা পেশার কথা কইতে থাকো তখন তা বেশ ভালোই শোনায়, কিন্তু যেমনি তার নিজের ঘরোয়া কথা এসে পড়ে অমনি তা আড়ষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।"

ঠিক তাই, কারণ স্থূল কাজের দিকটা, বিশেষত তা যদি ব্যবহারিক জিনিস হয় তাহলে সেখানে হচ্ছে ঐ ব্যক্তির উৎকৃষ্টতর অংশের বিকাশ, কিন্তু নিজের ঘরের জীবনের ক্ষেত্রে প্রায়ই সে নীচের স্তরে নেমে থাকে, খুব কমই এর ব্যতিক্রম হয়। ভালো ভালো বিদ্বান,

লেখক, শিল্পী, যারা কত উচচাঙ্গের জিনিস সৃষ্টি করতে পারে, নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকলেই তারা হয়ে দাঁড়ায় অত্যাচারী স্বামী, নয়তো ভয়াবহ পিতা, বাড়ির লোকদের কাছে বিভীষিকা অসহ্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথাই এখানে বলছি, যারা নামজাদা বিদ্বান, আবিষ্কর্তা, বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ; বাইরে তারা অসাধারণ ও গুণী, কিন্তু বাইরের থেকে ঘরে ফিরলেই নিতান্ত সাধারণ ও অসহ্য প্রকৃতির—তাদের তখন চাই বিশ্রাম, ভোগ, সর্বৈব শৈথিল্য। তার উপর যদি নিজেদের আমোদ খোঁজে তাহলেই সব ফুরিয়ে গেল। এমন অনেককেই জানতাম যারা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও আশ্চর্য শিল্পদক্ষ, কিন্তু যেমনি বাড়িতে ঢুকে গা "এলিয়ে" দিতো অমনি নিতান্ত নির্বোধ হয়ে যেতো। কুশিক্ষাপ্রাপ্ত অসভ্য শিশুদের মতো তারা অতি কদর্য আচরণ করতে থাকতো—তাই নাকি তাদের বিশ্রাম নেওয়া। এই "বিশ্রামের" চাহিদা হতে সব কিছুই এসে পড়ে, অধিকাংশ মানুষই একেবারে নীচে নেমে যায়, তারা জানেনা যে প্রকৃত বিশ্রামের জন্য আরো এক ধাপ উপরে ওঠা দরকার, নিজেকে তখন ছাড়িয়ে যেতে হয়। নীচে নামলেই বরং আরো ক্লিষ্টতা আসে, নিজেকে তুমি বুদ্ধিহীন ও ভোঁতা ক'রে ফেল। আর যতবারই নীচে নামো ততবারই অবচেতনের জঞ্জাল বাড়তে থাকে—যেগুলোকে দূর করতে পারলেই তুমি উপরে উঠবে, ঐগুলোই তোমার পায়ের বেড়ি। কিন্তু এ কথা শেখানো খুব কঠিন, আগে নিজে শিখে তবে পরকে শেখাতে হয়।

এ সব কথা ছেলেমেয়েদের কখনো বলাই হয়না, তাদের যা খুশি তাই করতে দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে তাদের একটু ছেড়ে রাখাই দরকার।

নিজেকে নীচে নামিয়ে ক্লান্তি দূর করা যায়না। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যেতে হবে যেখানে রয়েছে আসল বিশ্রাম, সেখানেই মিলবে আভ্যন্তরীণ শান্তি আর আলো আর বিশ্ব-শক্তির স্ফূর্তি। আর সেখানে অল্পে অল্পে পেতে থাকবে সত্যের সংস্পর্শ, যা তোমার অস্তিত্বের মূল লক্ষ্য।

তার স্পর্শ যদি পেয়ে যাও, তবে তো সকল ক্লান্তি একেবারেই ঘুচল।

প্রশ্ন : নিজের ভুল একবার বুঝতে পারলে সে ভুল আর কেউ করেনা, তাই নয় কি ?

উত্তর : হাঁ। তাই, কিন্তু যদি তুমি খাঁটি ঐকান্তিক হও। আর যদি তবুও পুনঃ পুনঃ সে ভুল করতে থাকো তাহলে জেনো যে নিশ্চয় তোমার মধ্যে ঐকান্তিকতার অভাব আছে। দোষ জেনেও যদি আবার সে দোষ করো, তার মানে তোমার চেতনার কেবল ভাসা ভাসা অংশটাই তাকে দোষ বলে মেনেছিল, কিন্তু বাকী অংশ তাতে সন্তুষ্টই ছিল। নিজেকে তখন তুমি জোর ক'রে বলবে, "আবার যদি ও-কাজ আমি করি তাহলে ঐকান্তিকতা আমার এখনও আসেনি।" অতএব তখন ঐকান্তিকতা আনতেই চেষ্টা করবে।

"অন্যদের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রায়ই দেখা যায় যে তাদের সঙ্গে তোমার কথার

মিল হচ্ছেনা, তার কারণ তাদের মতো দৃষ্টিতে তুমি জিনিসটা দেখছনা। কিংবা তাদের কি অভিমত তা জেনেও তুমি তাকে মেনে নিতে পারছনা।"

এর কারণ তুমি ততটা নমনশীল নও। এটা জেনো যে কাউকে যখন তোমার বিরক্তিকর লাগছে, তখন তারও তোমাকে বিরক্তিকর লাগছে। তুমি যদি নিজেকে তার জায়গাতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবার মতো মনোভাব না নিতে পারো, তাহলে মীমাংসা কিছুতেই হবেনা, ওটা অপরিহার্য। কেউ যদি তোমাকে এমন কিছু বলে যা তোমার বোধগম্য নয়, তাহলে কখনই এমন কথা বলবেনা যে, "লোকটা জানেনা কিছু", তাকে একটু বুঝতেই চেষ্টা করবে। তুমি যদি প্রকৃত ঐকান্তিক হও, তাহলে একটি শিশু তোমার কাছে এসে অদ্ভুত রকমের কিছু বলতে থাকলেও তুমি বলবেনা যে ছেলেটা বোকা, বরং বলবে, "আমিই বোকা তাই ওর কথা বুঝতে পারছিনা।"

প্রত্যেকটি সমস্যাকে একশো রকম ভাবে দেখা যেতে পারে। প্রকৃত মীমাংসা চাইলে তার সকলগুলিকেই নেড়েচেড়ে দেখতে হবে, আর সবগুলির উপরে উঠে দেখবে কোথায় মিল রয়েছে।

চেতনার এমন এক অবস্থা আছে যাকে বলা যেতে পারে "বিজ্ঞানময়" অবস্থা, যখন মানুষের সর্বোচ্চ জ্ঞানের দ্বারা ব্যক্ত সকল আদর্শ ও সকল সিদ্ধান্তকেই একযোগে দেখা যায়—এমন কি বিপরীত মতগুলিকেও নিয়ে—যেমন বৌদ্ধ মত, বৈদান্তিক মত, ক্রীশ্চান মত, নানাবিধ দার্শনিক মত, কোনো মানব-মন যখনই সত্যের কোনো এক কোণের সন্ধান পেয়েছে তখন তার বলা সেই মত। ঐ অবস্থা পেলে তুমি যে কেবল সবগুলিকেই দেখতে পাবে তাই নয়, সমস্তই তোমার কাছে আশ্চর্য রকমে সত্য ও সব কথা বোঝবার পক্ষে অপরিহার্য হবে। চেতনার সে এক বিশেষ অবস্থা আছে...কিন্তু যাক্ সে কথা এখন তোমরা ঠিক বুঝবেনা। বরং একটা সোজা দৃষ্টান্তের কথা বলি। আনাতোল ফ্রাঁস তাঁর একটি বইতে বলেছেন

"মানুষ যতদিন জগতের উন্নতি করা নিয়ে মাথা ঘামায়নি ততদিন সবই ঠিকভাবে চলছিল আর সকলেই তাতে খুশি ছিল"—অর্থাৎ তারা নিজেকে বা জগৎকে দোষমুক্ত করতে উঠেপড়ে লাগেনি বলেই কোনো গণ্ডগোল পাকায়নি। অন্য সবাইকার উন্নতি হোক এমন চেষ্টা করতে যাওয়াই ভুল, যেমন ভাবে তারা চলছে তেমনি ভাবে চলতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু অনেকে বলবে: "সত্যকে তো জানতে হবে; জগৎ রয়েছে অজ্ঞান হয়ে, যতই বাধা থাক তবু যেমন ক'রে হোক লোকের চেতনাকে আলো দিতে হবে, অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে তাদের টেনে তুলতে হবে।" কিন্তু আমি এখানে বলি যে এমন চেতনা আমাদের আসতে পারে যাতে দুইরকম দৃষ্টিকেই সমান সত্য বলে মনে হবে। অবশ্য দুটি মাত্র দিক দেখলেই সে দেখা সুস্পষ্ট হবেনা; সত্যের সমস্ত দিকগুলিকেই দেখতে হবে, মানুষের বুদ্ধিতে যতটা আসে, এবং...তার চেয়ে আরো বেশি কিছু। সে অবস্থা এলে

তখন দেখবে যে কোনো কিছুই মিথ্যা নয়, কোনো কিছুই পুরো মন্দ নয়। তখন আর কোনো সমস্যা নেই, কোনো কাটাকাটি নেই, সবই চমৎকার সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু যদি নকল করতে যাও, অর্থাৎ মনের মধ্যে তেমনি একটা মেকি অবস্থার সৃষ্টি করো, তাহলে তখন অনেক কাজই বোকার মতো ক'রে ফেলবে; তুমি তখন তাদের দলে চলে যাবে যাদের মাথার মধ্যে কিছু নেই, কোনো কিছুই না বুঝে উল্টোপাল্টা কথা বলে যেতে থাকে।

কিন্তু সেই খাঁটি অবস্থার মধ্যে বৈপরীত্য আদৌ নেই—সমস্ত অভিব্যক্ত সত্যেরই পূর্ণ চেতনা রয়েছে (যা সত্যকে সমগ্রভাবে প্রকাশ করতে পারেনি) এবং কোনটির কোথায় স্থান, কেন এবং কী জিনিসে এই বিশ্ব গড়া হয়েছে সবই সেখানে জানা।

তবে এ কথাও বলি যে নিজের চেষ্টাতে সেখানে পৌঁছনো যায়না; তুমি খুব চেষ্টা করছ বলেই যে তা এসে পড়বে এমন কথা নয়। আপনা থেকেই তা আসবে আর নিজেও তাই হয়ে দাঁড়াবে। মনের ঐকান্তিকতার এটি চরম অবস্থা, যখন তোমার পক্ষপাতিত্ব বলে কিছু নেই, পছন্দ অপছন্দও কিছু নেই, ধারণা আনার দিক দিয়েও নির্লিপ্ত, এমন কি সত্য জানবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই।

শুধুই তুমি আলোর দিকে উন্মীলিত হয়ে আছ, আর কিছুনা।

আজ সন্ধ্যায় এটা তোমাদের বলে রাখছি, কারণ একজনও যা করেছে এবং পেয়েছে অন্যেও তা পেতে পারে। একজনও—একটিমাত্র দেহী মানুষও—যদি সে উপলব্ধি পেয়ে থাকে, তাতেই সুনিশ্চিত প্রমাণ হয়ে যায় যে তা পাওয়া তাহলে সাধ্য। হয়তো তোমার কাছ থেকে এখনও তা বহুৎ দূরে, তবুও তুমি বলতে পারো যে বিজ্ঞানময় জীবন সুনিশ্চিত, কারণ তার শুরু হয়ে গেছে।

মার্চ ১, ১৯৫১

..."দিব্য চেতনার মধ্যে এমন একটা স্তর আছে যেখানে সব কিছুই সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত এবং সব কিছুরই পরিকল্পনা আগের থেকে ঠিক করা আছে। অতিমানসের সর্বোচ্চ চূড়াতে গেলে তার সমস্তই দেখা যায়, যেখানে পরব্রহ্মের নিজস্ব দৃষ্টিস্থান। কিন্তু আমাদের যখন সেই চেতনা নেই আর সেই দৃষ্টিতে যখন আমরা কিছু দেখতে ও বুঝতে পারিনা, তখন সেই স্তরের মতো কথা বলা আমাদের পক্ষে নিরর্থক। কারণ এই নিম্ন চেতনার স্তরে কোনো কিছুই আগের থেকে জানা ও ধারণা ক'রে নেওয়া যায়না: সব কিছুই গড়ে উঠতে দেখি ক্রমে ক্রমে। স্থিরসিদ্ধান্ত এখানে কিছুই থাকেনা, কেবল থাকে কতগুলি সম্ভাবনার ভিতর দিয়ে ক্রিয়া,

তারই ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর থেকে যেটা হবার সেটা হয়ে পড়ে। এ স্তরে আমরা পছন্দমত কিছু একটা বেছে নিতে পারি, এক সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে গ্রহণ করতে পারি, এক পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরতে পারি। যদিও বাস্তবে যা ঘটছে তা উপরে ঠিক করাই আছে তবু আমরা ঐরূপ ক'রে যাই।"

(Conversations VI)

এখানে "আগের থেকে ঠিক করা" না বলে "আগের থেকে হয়ে থাকা" বলাই সমুচিত। বাস্তবে তা একটা উন্মীলন চেতনা, কেবল দেখতে পাওয়া নয়।

জগৎকে একটা সম্পূর্ণ জিনিস বলে ধরে নাও যার সীমা সুনির্দিষ্ট, কিন্তু ওর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য সম্ভাবনার বীজ, এবং তার সমন্বয় এভাবকম ভাবে হতে পারে যা অনন্তেরই সামিল (আমার কথার অর্থটা বুঝেসুঝে নিও, কারণ শব্দ বড় গোলমেলে জিনিস, যা বলতে চাইছি তা ঠিকভাবে প্রকাশ হয়না)। তাহলে ভগবৎ-চেতনা হতে আকার নিয়েছে বিশ্ব কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ধরে যার কথা পরে বলব। বিশ্ব একটা সম্পূর্ণ জিনিস, এ স্বয়ং ভগবানই রূপ নিয়েছেন—যদিও সমগ্র ভগবান এর মধ্যে নেই, তিনি যেন নিজের থেকে নিজের খানিকটাকে প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন বাস্তবের রূপ নেবার জন্য ; বিশ্বের **অভিব্যক্তির** তাই হলো আদি কারণ। ভগবানের দিব্যচেতনা যেন নানা দিব্য সম্ভাবনার মধ্যে নির্দিষ্ট একটা পথ বেছে নিয়ে চলেছে। এখন ভেবে দেখ যে সম্ভাবনা কত অসংখ্য হতে পারে—আবার তারও সম্ভাব্য সকল রকম সমন্বয়ের কথা বলতে গেলে তা অনন্তই হয়ে দাঁড়ায়। দিব্যচেতনা তো মূলতঃ একেবারেই মুক্ত—সে ওরই মধ্যে নেমে গিয়ে বাস্তবে একটা রূপ নিচ্ছে। যে পথ সে নিয়েছে তাও সেই অনন্তগুণ অনন্তের মধ্যে মুক্ত, আবার তা ভগবানের মুক্ত ইচ্ছার ক্রিয়াতে একাধারে অনির্দিষ্ট ও পূর্বনির্দিষ্ট। অতএব এটা বোঝা যায় যে সেই মুক্ত ইচ্ছা তার উন্মীলনের পথটা হঠাৎ বদ্‌লে ফেলতেও পারে, যদিচ সব কিছুই পূর্বনির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট, পথ মুক্ত থাকায় তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব। পথ বদ্‌লে গেলে তখন সব কিছু জিনিসের ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কও বদ্‌লে যাবে, নিয়তির ধারাও বদ্‌লে যাবে। এমনি পরিবর্তন-চক্রকে বলা হয় "কৃপার ফল", কৃপার ইচ্ছা হলে তার সাহায্যে সব কিছুই উল্টেপাল্টে যেতে পারে, নিয়তির চলমান গতির ধারাও অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। সব কিছুরই স্থান-পরিবর্তন ঘটে, এক রাস্তা ছেড়ে তখন সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায় চলা শুরু হয়। নিয়তির গতি অনুযায়ী কোনো ঘটনা হয়তো আগে এসে পড়ার কথা, কিন্তু সে ঘটনা চলে গেল একেবারে পিছনে, এমনি কত কিছু। সমস্তই অদলবদল হয়ে যায়।

("আগের থেকে হয়ে আছে" কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটি ছাপবার সময় মা নিম্ন-লিখিত কথাগুলি যোগ করেন—"সৎ মানে পূর্ণ অস্তিত্ব, কিন্তু অভিব্যক্তিতে নয়, সে অস্তিত্ব অনভিব্যক্ত ; তৎ হলো তার অনস্তিত্বের অবস্থা, সৎ হলো অস্তিত্বের অবস্থা ; তৎ তো

অনভিব্যক্ত হবেই, সৎও অনভিব্যক্ত কেবল যখন চিৎ-তপস্ আসে অর্থাৎ চেতনা-শক্তি আপনাকে বিকাশ করে তখনই সৎ হয় অভিব্যক্ত।)

প্রশ্ন কালের সূত্রপাত কখন থেকে ? চেতনা কি নিজেকে প্রকাশ করার মুহূর্ত হতে কালের ধারাকে বেছে নিয়েছে ?

উত্তর : না, কাল এসেছে পরম্পরা থেকে এটা বুঝে নাও যে পরম চেতনা নিজেকে বস্তুরূপ দেবার পূর্বে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সামগ্রিক অনুভূতি জন্মায়, সেখানে কালের প্রশ্নই নেই। তেমনি একই কারণে তখন স্থানেরও প্রশ্ন নেই, সবই হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। আরো কিছু হয় ; চেতনার সেই অবস্থা ভাগবত, কারণ তার লক্ষ্য হলো রূপ-সৃষ্টি। কিন্তু সেই রূপায়ণের প্রথম ধাপে রয়েছে স্থান কালের অতীত সামগ্রিক পূর্ণ চেতনা, পরে যা হবে বিশ্ব বাস্তবের উপাদান : অস্তিত্ব ছিল তখন অনভিব্যক্ত, কেবল অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে কালের সূত্রপাত।

প্রশ্ন : এ কথা কি বলা চলে যে অতিমানসের স্তর থেকে কালের সূত্রপাত ?

উত্তর : তা ঠিক এই ধরনের কাল নয়। সেখানে শুধু কালের ও রূপের আরম্ভ মাত্র। কাল তার থেকে আলাদা জিনিস। অতিমানসের স্তরে পৌঁছবার আগে সামগ্রিক চেতনার স্বৈতিক অবস্থা, তখন সব কিছুই হচ্ছে একযোগে—তা যখন পরম্পরাক্রমে সাজানো হয় তখনই কাল জিনিসটা এসে পড়ে। কিন্তু অতিমানসের স্তরে যখন সমগ্রকে একযোগে দেখা যায় তখন তা আর স্বৈতিক সমগ্রতা নয়, তার পরিবর্তে অন্যরূপ সমগ্রতা, যাতে কালের ভাবটি এসে পড়েছে। অতিমানসের ভিতরকার যে আভ্যন্তরীণ সমগ্রতা অর্থাৎ মনে হয় না যে তার নিজের বাইরে কিছু হচ্ছে—যা কিছু হচ্ছে তারই অভ্যন্তরে, অথচ সেই আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের মধ্যে যে ইতরবিশেষটুকু থাকে তাতেই মেলে কালের প্রথম ইঙ্গিত।

প্রশ্ন : চেতনার সেই অবস্থাতে একটা কিছু জন্মাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এই সব জিনিস তো বোধই হয়না, তাই নয়কি ?

উত্তর : না, ও সব কিছুই থাকেনা।

মা আবার পড়া শুরু করলেন—"পরাৎপর চেতনাতে সব কিছুই আগের থেকে জানা, কারণ সব কিছুই সেখানে শাশ্বতভাবে রয়েছে। কিন্তু পরাশক্তি যখন এই বাস্তবের স্তরে নেমে এসে তাঁর ভিতরকার সেই পূর্ব নির্দিষ্ট জিনিসকেই আপন লীলাচ্ছলে পার্থিব রূপ দিতে চান, তখন তিনি এমনভাবে ক্রিয়া করেন যেন কিছুই জানতেন না ; যেন নতুন সূত্র ধরে নতুন কিছু বুনছেন..."

কোনো কাজটি করবার আগেই যদি তোমাকে জানানো হয় যে তোমার সে কাজ নিরর্থক হবে, তাহলে আর কি তুমি তা করতে চাও? নিশ্চয়ই তা করবেনা, নয় কি? ঠিক তাই এখানে হচ্ছে। তোমরা যা করো তার শতকরা নব্বুই ভাগই বৃথা হয়। যদি আগের থেকে বলা হতো যে, "ওটা করো কিন্তু ওর কিছু ফল হবেনা", তাহলে লাখের মধ্যে একজনও তা করতে যেতোনা। কিন্তু মহাশক্তির লীলার ক্ষেত্রে সনগ্রের ক্রিয়া চালু রাখতে সকলকেই কাজ ক'রে যেতে হবে, যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কোনো কর্মী তার কিছু ফল না পেতে পারে। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি জানে যে সে যতটুকু করছে তা সনগ্রের পক্ষে অণু পরিমাণ মাত্র, তাহলে সে কাজে সে হয়তো হাতই দেবেনা। কিন্তু যেমনি সে-স্তরের উপরে উঠে গিয়ে কোনো উদ্দেশ্যের দিকে না চেয়ে ফল যাই হোক তবু সে কাজ তোমার করা দরকার জেনে তাই করতে থাকো, তাহলে তোমার সেই অনাসক্তি থেকে জানতে পারবে যে উচ্চ চেতনাতেও তাই হচ্ছে, ফল যাই হোক যা করণীয় তাই করা হয়ে যাচ্ছে; তখন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তুমি জানবে, অন্ততপক্ষে আভাসে টের পাবে যে তোমার কাজের কি ফল হবে, এবং তা জানলেও তোমার কাজের কিছু ব্যতিক্রম হবেনা। নীচের দিক থেকে উপরের জিনিসের ব্যাখ্যা খোঁজার বদলে উপরের দিক থেকে নীচের জিনিসের ব্যাখ্যা খোঁজাই বুদ্ধিমানের কাজ, আর এটা বোঝা উচিত যে উপরকার চেতনা যতই নীচের দিকে নেমে আসে ততই তা ঘোলাটে হতে থাকে, তখন আর বোঝা যায়না যে কোন প্রণালীতে সব কাজ চলছে—একেই বলে যন্ত্রানের অবস্থা।

..."একটা ছবি আঁকতে হলে তারও একটা মোটামুটি আদল ছকে নিতে হয়, একটা সীমারেখা ধরে নিতে হয় যাতে তারই পরিধির মধ্যে সমস্ত জিনিসটা এঁটে যায়; কিন্তু সে সীমা ঠিক থাকেনা, কেবল প্রথমটায় ধরে নেওয়া হয়। সে ছবি নিত্যই বেড়ে চলেছে নির্দিষ্ট পরিধিকে ছাড়িয়ে। তার প্রত্যেক অংশকে আবার অনন্ত পর্যায়ের কাঠামোর মধ্যে একই ধরনে রচনা করা যেতে পারে। আমরা বলে থাকি যে আমাদের লক্ষ্য হলো এটা কিংবা ওটা, কিন্তু জানি যে ওর পিছনে রয়েছে আরো এক লক্ষ্য যার সূত্রপাত স্বরূপ এটা, আবার তারও পিছনে আছে অন্য লক্ষ্য, এইভাবে চলেছে।"

যদি আমাকে বলা হতো যে অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছলেই সব শেষ, তাহলে আমার এমন একঘেয়েমির ভাব এসে যেতো যে আমি আর নড়তেই চাইতাম না।

এ আমার পরম সান্ত্বনা যে সব কিছুই অশেষভাবে চিরদিন চলবে, সব সময়েই নতুন কিছু করার থাকবে। যে কোনো লক্ষ্যেই পৌঁছই, তাই হবে অন্য লক্ষ্যের আরম্ভ মাত্র।

প্রশ্ন: "চৈত্য" আর "অধ্যাত্ম" এই দুটি কথার মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর: দুই একই জিনিস নয়। চৈত্য হলো ভগবৎ-উপস্থিতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত

এক সত্তা যা পৃথিবীর জিনিস—বিশ্বের কথা বলছিনা, কেবল পৃথিবীরই ; এখানেই মিলবে চৈত্যকে। বিশ্বের অন্য সব অংশ অন্যভাবে তৈরি।

এই বস্তুরাজ্য ছাড়া আরো অন্যান্য উচ্চতর রাজ্য রয়েছে বিশ্বের মধ্যে ; মনের রাজ্য আছে, প্রাণের রাজ্য আছে ইত্যাদি, আর তারও উপরে আধ্যাত্মিকের রাজ্যগুলি যা আমাদের কাছে আত্মার রাজ্য, সেই "আত্মাই" অল্পে অল্পে জড়ে পরিণত হয় যা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু অতিমানস লোকের ও তারও উচ্চতর লোকের সত্তাদের মধ্যে কোনো চৈত্য নেই—এমন কি যাদের দেবদূত বলি তাদেরও নেই। কেবল এই পৃথিবীতেই চৈত্য-জীবনের শুরু, আর এই চৈত্যের প্রণালী দিয়েই ভগবান জড়-জীবনকে জাগিয়ে আবার তার মূল দিব্যাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চান। চৈত্য ছাড়া জড় কখনই তার নিশ্চেতনা হতে জাগেনা, মূল অধ্যাত্ম-জীবনের দিকে আস্পৃহা করেনা। সুতরাং মানুষের ভিতরকার চৈত্য হলো তার আধ্যাত্মিক আস্পৃহার উৎস ; তবে চৈত্য ছাড়াও একরূপ আধ্যাত্মিক জীবন হতে পারে।

প্রশ্ন : চৈত্য-জগতের সঙ্গে পৃথিবীর কিছু যোগ আছে ?

উত্তর এই তো বললাম, কেবল এখানেই চৈত্যের অনুভূতি বাড়তে বাড়তে ব্যক্তি-সত্তার উন্নতি ঘটে। সুতরাং চৈত্য-জগতের সঙ্গে পৃথিবীর পরস্পর-নির্ভরতা পুরোপুরি রয়েছে।

প্রশ্ন : চৈত্যকে জাগাতে সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কি ?

উত্তর কিন্তু সে তো জেগেই আছে। শুধু তাই নয়, সে তার কাজও করছে, শুধু তুমি সেটা জানোনা। মনে করছ সে বুঝি ঘুমিয়ে আছে, কারণ তার সম্বন্ধে তোমার কোনো জ্ঞানই নেই !

বস্তুত চৈত্যের আভ্যন্তরীণ ইচ্ছার বেগ যদি না থাকত তাহলে মানুষগুলো নিরুদ্যম হয়ে শুন্ হয়ে থেকে কেবল পশুত্বের জীবন যাপন করত। একটুও আস্পৃহা যেখানে রয়েছে সেখানে জানবে তা চৈত্যেরই ক্রিয়ার ফল। চৈত্য না থাকলে কোনো উন্নয়নও হয়না, কোনো চেষ্টাও আসেনা।

প্রশ্ন : সৌন্দর্যবোধও ওর থেকে আসে কি ?

উত্তর হাঁ। সর্বোচ্চ জিনিস হয়তো নয়, কিন্তু প্রাণসত্তার মধ্যে একটা সৌন্দর্য ও সঙ্গতির চেতনা রয়েছে। চরম ও চিরন্তন সৌন্দর্যবোধ কেবল চৈত্যেরই দখলে, কিন্তু মার্জিত ও শিক্ষিত মানুষের প্রাণসত্তায় রূপগত ও আকৃতিগত ও বর্ণগত সৌন্দর্যবোধ পুরোপুরিই আছে।

প্রশ্ন : আর প্রেম নেই কি ?

উত্তর : "প্রেম" কাকে বলো তারই উপর তা নির্ভর করছে, দিব্যপ্রেম অবশ্য থাকবেনা, কিন্তু প্রাণসত্তার মধ্যে সকল রকমই আকর্ষণ আবেগ ও কামনা লালসা রয়েছে। কেবল তার ধারা বদ্‌লে যায় জড়ের মধ্যে দিব্যচেতনার অবতরণ ও অনুপ্রবেশ হওয়াতে। প্রকৃত প্রেমের সম্ভাবনা তাতে জেগে ওঠে ; নতুবা প্রেম বলতে যা তোমরা বোঝো—কামনা লালসা আকর্ষণ প্রভৃতি, যার মানে গ্রাস করতে চাওয়া—এ জিনিস প্রাণসত্তার মধ্যে খুবই আছে। জড়ের মধ্যে প্রেমের প্রথম লক্ষণই হলো ধরে নিয়ে গিলে ফেলার ঝোঁক—যখন ক'রে হজম ক'রে নেওয়া, মুখে পুরে গিলে ফেলা। এমনি প্রেমেই বেড়াল তার বাচচাকে খেয়ে ফেলে, বাঘ খেয়ে ফেলে কচি নেষশাবককে।

প্রশ্ন ফুলের মধ্যে কি সৌন্দর্যবোধ থাকে ?

উত্তর : জৈব পদার্থ মাত্রেই প্রাণসত্তার উপাদান রয়েছে, তারই জন্য ফুলের মধ্যেও সৌন্দর্যবোধ আসে। তবে আমরা যেমন বুঝি তেমন ব্যক্তিগতভাবে নয়, কিন্তু সমগ্র ফুলের জাতটাই সেরূপ একটা উপলব্ধি চায়। উদ্ভিদ-জীবনের মধ্যে চৈত্যের আভাস ও স্পন্দন আমি লক্ষ্য করেছি, আর ফুলের ফুটে ওঠা ব্যাপারটিও বস্তুত চৈত্যবস্তুরই প্রথম অভিব্যক্তি। কেবল মানুষের মধ্যেই চৈত্য হয় ব্যক্তিগত, কিন্তু মানুষের পূর্বেও এ জিনিস ছিল ; ব্যক্তিগত ভাবে নয়, অনেকটা তরল ভাবে—শক্তি ও চেতনা রূপে। গোলাপের কথাই ধরো : ওর যা নিখুঁত রূপ ও বর্ণ ও সৌরভ, তা আত্মস্পৃহা ও চৈত্যেরই লক্ষণ। সকালে সূর্যের প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে গোলাপ যখন পাপড়ি মেলে ফুটে উঠছে তখন তার দিকে চেয়ে দেখো, আত্মনিবেদনের আস্পৃহার সে এক চূড়ান্ত ছবি।

প্রশ্ন প্রত্যেক ফুলেরই বিশেষ কিছু তাৎপর্য থাকে, নয় কি ?

উত্তর : আমরা মনের দ্বারা যে ভাবে বুঝি সে ভাবে নয়। কোনো ফুলকে যখনই কোনো নির্দিষ্ট অর্থ দিতে যাও তখনই তোমার মনের দিক থেকে সেটা প্রক্ষিপ্ত হয়, এবং ফুল তার খবর পেলেই স্পন্দনের মারফতে জবাব দিয়ে সে অর্থ মেনে নেয়, কিন্তু তার মধ্যে মনশ্চেতনার মতো কোনো জিনিস নেই। উদ্ভিদের রাজ্যে চৈত্যের একটুখানি সূত্রপাত মাত্র আছে বটে, কিন্তু মনশ্চেতনার কিছুই নেই। পশুদের কথা স্বতন্ত্র ; মনের জীবন সেখানে শুরু হয়ে গেছে, ওদের সব কিছুরই তাই একটা অর্থ আছে। কিন্তু ফুলের বেলাতে যেন সদ্যোজাত শাবকের অবস্থা—সংবেদনও নেই, অনুভবও নেই, অথচ দুইএরই একটু কিছু নিয়ে এক স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, বিশেষ একটি স্পন্দন। তার স্পর্শকে যদি অনুভব করো তাহলে তোমার চিন্তার মধ্যে তা তর্জমা হয়ে যেতে পারে। আমি সেই ভাবেই ফুলের ও গাছপালার অর্থ

ক'রে থাকি—ওর স্পন্দনের সঙ্গে একটা একাত্মবোধের দ্বারা, তার বিশেষ গুণগুলির অনুভূতির দ্বারা, এবং অল্পে অল্পে তার সঙ্গে একরকম মিল হয়ে যায় (কখনো বা তৎক্ষণাৎ কখনো বা বিলম্বে)। মনের চিন্তার স্পন্দনের সঙ্গে (প্রাণসত্তাগত আবেগধর্মী স্পন্দন) ওর স্পন্দনের যখন অনেকটাই মিল হয়, তখন তার ভিতরকার তাৎপর্যটুকু সরাসরি জানা যায়।

কোনো কোনো দেশে (বিশেষত এই দেশে) কোনো কোনো গাছকে পূজার প্রার্থনার ও নৈবেদ্য দানের উপলক্ষ করা হয়। বিশেষ বিশেষ পূজার অনুষ্ঠানে দেবতাকে গাছের পাতাও নিবেদন করা হয়। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে সেই সেই গাছের প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখেই এটা করা হয়ে থাকে। এ কথা বলার কারণ অনেকবারই এমন হয়েছে যে আগের থেকে কিছু খবর না জেনে আমি আপনা হতে বিশেষ কোনো গাছের একটা অর্ঘ্য ঠিক করেছি, এবং তার পরে জেনেছি যে প্রচলিত পূজা অনুষ্ঠানে ঠিক সেই অর্ঘই তাকে দেওয়া হয়েছে। সেই নিবেদিত ফুলে ও পাতায় ঠিক সেই রকমের স্পন্দনই ছিল...তা কি প্রচলনের ফলে এসেছে, অথবা বহু উপর থেকে বা ভিতর থেকে এসেছে? বলা কঠিন।

প্রশ্ন : এমন কি হয় যে কোনো চৈত্যসত্তা যেখানে জন্মাতে চেয়েছিল সেখানে নামতে পারলেনা?

উত্তর : চৈত্যের জগৎ থেকে পৃথিবীতে কোথাও আলো দেখেই যদি কিছু না জেনে সত্তাটি ঝপ্ ক'রে সেখানে নেমে পড়ে তাহলে তা হতে পারে। সব রকমই সম্ভব। কিন্তু যদি সে পুরোপুরি সচেতন হয়, তাহলে ঠিক জায়গাতেই তার আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত আলোর সন্ধান করবে, যেখানে তার দরকার মত শিক্ষা ও উৎকর্ষ মিলবে। এটা প্রায়ই হয়ে থাকে, বিশেষত শিক্ষিতদের স্তরে। যে মাতাটি বুদ্ধিমতী ও যার মধ্যে শিল্পরুচি ও কিছু দার্শনিকতা আছে, সে নিশ্চয় এমন আত্মপ্রকাশ করতে থাকবে যে এবার তার গর্ভে যে শিশু আসছে সে যেন তার প্রত্যাশা অনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্ট সন্তান হয়, কিংবা কোনো বইতে যেমন আদর্শ মানুষের কথা পড়েছে তেমনি হয়। এমন অবস্থায় সেই চৈত্যের উপযুক্ত স্থান খুঁজে পেতে কোনো গণ্ডগোল হয়না। কত চৈত্যসত্তা নিত্যই জন্মাচ্ছে তার সংখ্যা তো কম নয়, সে ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে প্রত্যেক বারেই আশানুরূপ পরিস্থিতি জুটিয়ে নিতে পারা যথেষ্ট কঠিন। এমন প্রায়ই হয়ে থাকে যে কোনো চৈত্যসত্তা হঠাৎ মাথা গুঁজে কোথাও নেমে পড়ে মহা বিভ্রমে পতিত হলো, কিন্তু সেটা তার দুর্ভাগ্য; সেখানে আবার ভালো ক'রে চেতনাতে জেগে উঠতে তার অনেক সময় লেগে যায়। দুর্ভাগ্য এইজন্য যে হয়তো ঐ সময়ে তার বিচারণা শক্তি লোপ পেয়েছিল, কিংবা কোনো বিরুদ্ধশক্তি তাকে ভুলিয়ে দিয়ে নিজে জিতে গিয়েছিল। সহস্র রকমের সম্ভাবনাই রয়েছে। পছন্দমত সব কাজ হয়না,—আর চৈত্যও প্রত্যেকে হয় বিভিন্ন প্রকার।

মার্চ ৩, ১৯৫১

প্রশ্ন ছিল : এই সব বিরুদ্ধশক্তি কি বাহির থেকে আসে না ভিতর থেকে ?

এর উত্তরে মা পড়লেন—"বিরুদ্ধশক্তিদেরও থাকার প্রয়োজন আছে। এরা তোমার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে দেয়, আশ্পৃহাকে আরো স্পষ্টতর ক'রে তোলে। তবে একথাও ঠিক যে তুমি তাদের থাকবার সুযোগ দিচ্ছ বলেই তারা রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত তোমার ভিতরকার কোনো অংশ ওদের আস্থানে সাড়া দেবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের নাক গলাবার হক্ থাকবে। যদি তোমার ভিতরকার কোনো কিছু অংশই তাদের দিকে সাড়া না দেয়, তোমার প্রকৃতির কোনোখানেই তাদের দখল না থাকে, তাহলে তারা তখন আপনা হতেই তোমাকে ছেড়ে যাবে।"

এই সব বিরুদ্ধশক্তিকে জয় করবার পক্ষে সব চেয়ে উত্তম উপায় হলো নিত্যকার আশ্পৃহা নিয়ে থাকা, নিত্যই ভগবানকে ডাকা। আর, ভয় কিছুতেই না করা।

"ওরা আসে চেতনার বা সত্তার বাহির থেকে।"

সত্তার সীমানা কী ?...ভিতরে বাহিরেই বা তফাৎ কি, চেতনাই তো সর্বত্র।

সাধকদের তাই এই কথাই বলে দেওয়া হয়, "যখন কোনো কিছুকে দূর ক'রে দিতে চাইবে তখন বলতে থাকবে যে এটা বাইরের জিনিস, আমার নয়।" এ একটা ধারণা করা মাত্র, কারণ নিজের বদলে বাইরের জিনিস বলে জানলে সেই বিপত্তিটাকে তাড়াতে পারা সহজ হয়। কিন্তু এখন আমি তোমাদের উল্টো কথাই বললাম যে, "তোমার ভিতরে" যদি বিরুদ্ধশক্তির দিকে কোনো সাড়া না দাও তাহলে সে তোমাকে আক্রমণ করতে পারবেনা। সুতরাং ভিতরেও যা আছে বাইরেও তাই, বাইরে যা আছে ভিতরেও তাই। আসল কথা হলো জানা, জায়গা বুঝে কোথায় কোপ মারতে হবে।

তোমার চরিত্রে যদি মস্ত একটা খুঁত থাকে, যেমন হঠাৎ খুব রেগে ওঠা, সেখানে "আমি আর কিছুতেই রাগবনা" এমন কথা ভেবে রাখলেও তাকে নিবারণ করা কঠিন হবে। কিন্তু যদি নিজেকে এইরকম বোঝাও যে, "এই রাগ জিনিসটা বাইরে সর্বত্র সারা জগতের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, এ কেবল আমারই নয়, সকলেরই হয় ; সর্বত্রই এটা ঘোরাঘুরি করে, আমার দরজাটা যদি বন্ধ করে রাখি তাহলে আর আমার মধ্যে ঢুকতে পারবেনা,"—এমন বলতে থাকলে কাজটা অনেক সহজ হবে। আর যদি ভাবো যে, "আমার স্বভাবটাই অমন, জন্ম থেকেই তাই", তাহলে তাকে তাড়াতে পারা অসম্ভব হবে। এ কথা ঠিক যে তোমার চরিত্রের মধ্যে এমন একটু কিছু আছে যা ঐ রাগের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। সকল জিনিসের স্পন্দনই অমন—সেগুলি এসে ঢোকে আবার বেরিয়ে যায়, সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তোমার নিজের দরজা যেমন খুলে রাখবে তারই অনুপাতে ওগুলি তোমার মধ্যে এসে ঢুকবে। আর যদি ঐ সব শক্তির দিকে তোমার কিছু টান থাকে, তাহলে কেন রাগছ তা না জেনেও হঠাৎ

রেগে ওঠো। সব জিনিসই সর্বত্র রয়েছে, তার সীমা থাকে তোমার নিজের মধ্যে।

কোনো উগ্র বাস্তববাদীর লেখা একটা বইতে পড়ছিলাম যে মানুষ জনে জনে এক এক চামড়ার থলির মধ্যে আঁটা রয়েছে, কারো সঙ্গে কারো প্রকৃত সংস্পর্শ হতে পারেনা। কথাটা যদিও নির্বোধের মতো, কিন্তু কারো কারো এতে উপকারই হয়; ঐ যে খোলসের মধ্যে আঁটা থাকাতে কারো সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটবেনা, এই ধারণা তাদের বাইরের সকল প্রভাব থেকে রক্ষা করে। বাজে কথা তো বটেই, কিন্তু বাজে কথাও কখনো কখনো কাজে লাগে! আমরা যে বলেছিলাম মন জিনিসটা জ্ঞানের যন্ত্র নয়, আর ভাবের রাজ্যে সব কিছুই আপেক্ষিক, এ সবই এক রকমের দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনধারণের ভঙ্গী। প্রত্যেক রকম বিজ্ঞানের একটা নিজস্ব ভাষা আছে, তেমনি প্রত্যেক রকম ধর্মেরও আছে, প্রত্যেক রকম দর্শনেরও আছে, বিভিন্ন কর্মধারারও আছে, সে সব ভাষা যতই তুমি আয়ত্ত করবে ততই মনে হবে যে অনেক কিছু জানলে। আসল কথা ভাষাগুলোই জানা চাই। তাতে এমন অবস্থা আসবে যখন মনে হবে যে তোমার মনের এই সব ক্রিয়া আপেক্ষিক লীলা মাত্র—সে লীলা ভালোও হতে পারে মন্দও হতে পারে। যারা ওগুলির প্রয়োগ ভালো ভাবে করতে পারে তাদের বলি "বুদ্ধিমান", যারা তা পারেনা তাদের বলি "নির্বোধ"।

প্রশ্ন: আমাদের ভিন্নপ্রকার জিনিস ততটাই যতটার সঙ্গে আমরা একাত্ম—যার সেই একাত্মতা যদি না রাখি তাহলেই কি তা বাইরের জিনিস হলো?

উত্তর: কথাটা ঘুরিয়ে বলা হলো। কাজের সময় তোমাকে শ্রেণীভাগ ক'রে নিতে হবে, আর তাতেই মনের সার্থকতা—মন তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নেবে, প্রত্যেকটিকে রাখবে তার যথাস্থানে, এই হলো তার লীলার ক্ষেত্র; তারই আইনকানুন বেঁধে সেই নিয়মে চলে সে নিজের বাজি জিতবে। কিন্তু আসল জ্ঞান আসে অন্যত্র থেকে।

মা অতঃপর অন্যরূপ প্রশ্নে গিয়ে পড়লেন—"...মনের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে থাকা চাই প্রাণের ও এমন কি দেহেরও বিশ্বাস। যদি সমগ্র সত্তা দিয়েই তুমি নিজের মধ্যে ওর একটা অখণ্ড শক্তি এনে দাঁড় করাতে পারো, তাহলে কোনো কিছুতেই তোমাকে হটাতে পারবেনা কিন্তু তার জন্য তোমার দেহের কোষগুলিতে পর্যন্ত সে বিশ্বাস লেগে থাকা চাই। যেমন ধরো, বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমশ এমন একটি জ্ঞানের অবতারণা হচ্ছে যার থেকে অতঃপর প্রমাণ হতে পারবে যে মৃত্যু নিতান্ত অবশ্যম্ভাবী জিনিস নয়। কিন্তু এখন সকল মানুষেরই এটা দৃঢ়বিশ্বাস যে মৃত্যু ঘটবেই ঘটবে। ঐ বিশ্বাসটিকে যদি হটানো যায়, প্রথমে মন থেকে তার পর প্রাণপ্রকৃতি থেকে তারপর অবচেতন থেকে পর্যন্ত, তাহলে মৃত্যু এমন অপরিহার্য হয়ে থাকবেনা।"

এটা হলো নেতিবাচক দিক থেকে বলা। এর বদলে যদি জোরের সঙ্গে এমন

বিশ্বাস থাকে যে অমর হওয়া সম্ভব, তবে তাই হবে সক্রিয় পন্থা ; তখন তা কেবল সম্ভবই নয় কিন্তু সত্যই তা হয়ে দাঁড়াতে পারবে, তাকে আর ঠেকানো যাবেনা।

মা আবার পড়লেন—"...দরকার ছিল একটা বাস্তবের কাঠামো যার মধ্যে ব্যক্তি-চেতনা একটা নির্দিষ্ট আশ্রয় পেতে পারে। আর তার একটা বাঁধা রকমের আকৃতি হয়ে থাকাতেই মৃত্যু হয়ে পড়ল অপরিহার্য।"

কে তোমরা বলতে পারো যে ব্যক্তি বলতে কি বোঝায়? কোন জিনিসটির দরুণ তুমি জানতে পারছ যে তুমি এমন একজন যার একটা নিজস্বতা আছে?

প্রশ্ন : দেকার্তের মতো কি বলা যায়না, "যেহেতু আমি ভাবি, তাই আমি হচ্ছি আমি"?

উত্তর : না না। ওতে তোমার ব্যক্তিত্বের প্রমাণ হয়না।

তোমার যে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, এ বোধটি এলো কোন জিনিস থেকে?...

যখন প্রথম জন্মালে সে সময়ে যেমন ছিলে, যখন দশ বছরের হলে তখন হয়ে গেলে তার থেকে আলাদা রকম, আবার এমন হয়েছে তার থেকেও আলাদা রকম, নয় কি? কাঠামোর একটা আদল রেখে ও মিল রেখে তোমার আকৃতিটা বেড়ে চলেছে, অথচ এরই মধ্যে জন্মের সময় থেকে এখন এতই তোমার তফাৎ হয়ে গেছে যে তুমি বলবে, "তখনকার সে মানুষটি আমি ছিলাম না।" এ তো গেল দেহের দিকের কথা। এবার ভিতরের চেতনার দিকে চেয়ে দেখ, পাঁচ বছরের চেতনা আর এখনকার চেতনাতে কত তফাৎ। কেউই বলবে না যে এ সেই একই জন। আর তোমার তখনকার চিন্তা ও এখনকার চিন্তা? একেবারেই আলাদা। তা সত্ত্বেও কী এমন একটা রয়েছে যার জন্যে তুমি নিশ্চয় ক'রে জানতে পারছ যে সেই একই ব্যক্তি এসব কথা ভাবছে?

একটা নদীপ্রবাহের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখ ; একই জল সেখানে বইছেনা। তাহলে তার কোনটাকে বলবে নদী? এক ফোঁটা জলও যেখানে একভাবে থাকেনা, কোনো স্থায়িত্বই তার নেই, তাহলে নদী হলো কোনটা? (অনেকে এই দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে যে ব্যক্তির বলেও স্থায়ী কিছু নেই, সেই কথাই তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত।) মানব-সত্তার বেলাও তেমনি কথা—তার চেতনা বদলায়, মনোভাব বদলায়, অনুভূতি বদলায়, তাহলে কোনটা সে? কেউ কেউ বলে যে স্মৃতির ভিত্তি নিয়ে যেটা গড়ে ওঠে সেটা ব্যক্তিত্ব ; তুমি পূর্বাপর স্মরণ ক'রে আসছ, অতএব সেই স্মৃতিধারী তুমি একজন ব্যক্তিসত্তা। এ খুবই ভুল কথা, কারণ স্মৃতি জিনিসটা না থাকলেও তুমি এক ব্যক্তিসত্তাই থাকবে।

প্রশ্ন : নদীর যেটা খাত বা যেটা নদীগর্ভ, সেটাই তো নদী ?

উত্তর খাতের মধ্যেই নদী রইছে বটে, কিন্তু সেই খাতটাও তো বদ্‌লে যায় : সবই যে অস্থায়ী, পরিবর্তনশীল, আর সেই কথাটাই সত্য। কিন্তু তা আংশিক সত্য মাত্র, পূর্ণ সত্য নয়। তুমি তো জানছ যে তোমার মধ্যে কিছু স্থায়ী বস্তু আছে, এ "অনুভব"টি হচ্ছে কোথায় ?

প্রশ্ন যদি দেহের দিকেই দৃষ্টি রাখি তাহলে বলব যে বুকের মধ্যে সেই অনুভব পাচ্চি। যখন বলি যে "আমি" অমুকটা করছি, তখন যে ঐ কথা বলছে সে প্রকৃত "আমি" নয়। যখন বলি যে "আমি" ভাবছি তখন প্রকৃত "আমি" তো ভাবছেনা—সে কেবল দেখতে পায় যে ভাবনাটা হচ্ছে, চিন্তাটা আসছে। কিন্তু বলবার সময় অমনিই বলে থাকি।

উত্তর : অধিকাংশ লোকই যখন বলে "আমি" তখন তা প্রকৃতই তাদের সত্তার একটা অংশ বটে, তাদের দেহের, অনুভবের, মনশ্চিন্তার অংশগুলোই জোট পাকিয়ে ঐরকম পরিচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু সে পরিচয় নিত্যই বদ্‌লে যায়। সুতরাং তাদের "আমি" হচ্ছে অসংখ্য। নিত্যই বদলাচ্ছে, একটা বদলে অন্যটা। কিন্তু ভিতরকার স্থায়ী জিনিসটা কী ?...

সেই হলো চৈত্যসত্তা। কোনো জিনিস স্থায়ী হতে গেলেই তাকে অমর হতে হবে, নতুবা তা স্থায়ী হতে পারেনা। আর তাহলে সে যত কিছু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে যাবে সেগুলোর উপর সে নির্ভর করবেনা, সে নিজে সেই অভিজ্ঞতাগুলো নয়। তেমনি নদীগর্ভটাই আসল নদী নয়, তার ঐ নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে প্রবাহিত হওয়া একটা ঘটনা মাত্র। এই তুলনাকে অনুসরণ ক'রে যদি আরো এগিয়ে যাই (যদিও তুলনা মাত্রই মূল্যহীন, লোকে যা বলতে চায় তারই সাফাই দিতে তুলনা খাড়া করে মাত্র) তাহলে বলব যে নদী হলো জীবনের একটা খাপ খাওয়ানোর মতো প্রতীক, আর তার মধ্যে যে জিনিস স্থায়ী তা "জল" নামক বস্তু। তার একই বিন্দুগুলি সর্বক্ষণ থাকেনা, কিন্তু জল জিনিসটা সর্বক্ষণই থাকে—জল ছাড়া নদী হয়না। তেমনি মানুষের মধ্যে যেটা ঐরূপ নিত্যস্থায়ী তা হলো চেতনা নামক বস্তু। চেতনা আছে বলেই সে আছে। তার আকৃতি সর্বদা একরকম থাকেনা, কিন্তু সব রকমের আকৃতিকে একত্রে বিধৃত রাখবার শক্তি নিয়ে এবং নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অতিক্রম ক'রে সেই চেতনাই থাকে, কেবল স্মৃতি নয় (যা বাহ্য মাত্র) কিন্তু চেতনারই স্পন্দন থাকে।

এই হলো সৃষ্টির মহা রহস্য, কারণ চেতনা এক, চেতনা অনন্য। কিন্তু সেই চেতনা নিজেকে বাইরে অভিব্যক্ত করতে যেমনি নিজেকে প্রসারিত ক'রে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, অমনি সর্বব্যাপ্ত হয়ে পড়বার জন্য নিজেকে অসংখ্যরূপে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলছে, আর সেই প্রত্যেক টুকরোটি নিয়ে এক এক ব্যক্তিসত্তা তৈরি হচ্ছে। এই নিয়ম বা এই সূত্র

অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তা এক এক আকার নিচ্ছে। এই সত্য বা এই নিয়ম যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে না থাকত তাহলে ব্যক্তিসত্তা সম্ভবই হতোনা। এমনি ব্যাপার চলতেই থাকবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেকগুলি একত্রে জড়ো হয়ে একটি কেন্দ্রীভূত জিনিস হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিচেতনা নয়। অতএব এখানে প্রত্যেক আধারের মধ্যে রয়েছে একেরই বহুধা বিভক্তির এক একটি টুকরো উপাদান। এই বহুধার মধ্যে আছে অসংখ্য নিয়ম, অসংখ্য চেতনার ও সত্যের টুকরো যা বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ নিচ্ছে। এরূপ হওয়াতে ব্যক্তিমাত্রেই তার আদি উৎস হতে অনেক দূরে সরে গেছে। কিন্তু তার ভিতরকার আসল সত্যটিকে জেনে সেই ব্যক্তিত্ব যখন থেকে তৈরি হয়ে উঠবে, তখন একটা আভ্যন্তরীণ একাত্মতা এসে সেই বহুধা-বিভক্তির মধ্যেও মূল ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বের অস্তিত্বের এই হলো আসল কারণ, যাতে ঐ সাফল্য ঘটতে পারে সেই ভাবেই বিশ্ব গঠিত হয়েছে। এখানে পরমব্রহ্ম নিজেকে নিজের কাছে অভিব্যক্ত করছেন নিজেকেই জানবার জন্য।

যাই হোক, সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো এই। অতএব আমরা যেন আমাদের এই বিশ্বকে নিয়েই খুশি থাকি, এই পৃথিবীতেই জীবনের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করি, বাকী যা হবার তা আপন সময়ে হবে।

ব্যক্তিত্ববোধের একটা দিক যে অহংবোধ, সে কথা ইচ্ছা করেই বললাম না। কারণ ঐ অহং জিনিসটা মিথ্যা এবং মায়া, সুতরাং ওকে নিয়ে ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়াবে মিথ্যা এবং মায়া (যে কথা বুদ্ধ ও শংকর দুজনেই বলেছেন)। ব্যক্তিত্বের মূল হলো স্বয়ং পরমব্রহ্ম, সেখানে অহং একটা অস্থায়ী বিকৃতি মাত্র যার প্রয়োজন মুহূর্তের জন্য, কাজ হয়ে গেলেই তা ফুরিয়ে সত্যচেতনা এসে পড়বে।

মার্চ ৮, ১৯৫১

মা পড়ে শোনালেন—"...পূর্বজন্মের যথার্থ স্মৃতি পূর্ণজ্ঞানের অবস্থার একটা অংশ হতে পারে, কিন্তু তা কল্পনার খুশিমতো মেলেনা। একদিকে যদিও তা একটা বাস্তব জ্ঞান, অন্যদিকে তা অনেকটা ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরেও নির্ভর করে, এবং সেখানেই কল্পনার নিজের আবিষ্কারের জোড়াতাড়া বা মিথ্যার বিকৃতি এসে ঢুকে পড়ার যথেষ্ট অবকাশ থাকে। পূর্বজন্মের সত্যকে জানতে হলে তোমার চেতনার অনুভূতি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও মননীয় থাকা চাই, এবং তা মনের ও প্রাণের তরফের প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত থাকা চাই; তোমার নিজের তরফের যা কিছু ধারণা ও মনোভাব রয়েছে এবং মনের দিক থেকে সব কিছুর অর্থ ক'রে নেবার যে অভ্যাসটি রয়েছে তা যেন ওর মধ্যে আদৌ স্থান না পায়।"

(Conversations v)

প্রশ্ন : মনের প্রভাব যাতে না থাকে তার জন্য কি করা উচিত ?

উত্তর মনকে শেখাতে হবে নীরব হতে – নিঃশব্দে যেন সে সুস্থির ও চিন্তাশূন্য থাকে। সরাসরি তা করতে পারা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব কারণ মনের বাহ্য অংশের ক্রিয়াগুলো কখনই থামবার নয়—রেকর্ড করার মেশিনের মতো অনবরতই চলতে থাকে। একবার যা রেকর্ড হয়ে যায় তারই বারবার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, তাকে বন্ধ করার মতো সুইচ্ টিপে না দিলে কিছুতেই থামেনা। কিন্তু নিজের চেতনাকে যদি তুমি সাধারণ থেকে উচ্চতর রাজ্যে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে সেখানকার আলোর দিকে উন্মীলন পেলেই তোমার মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, আর সে চাঞ্চল্য প্রকাশ করবেনা, সে নীরব হয়েই থাকবে। সে জগতে ঢুকে আর বেরিয়ে নাও আসতে পারো, বাহ্য মনও তাতে ঠাণ্ডা থাকবে।

অতএব উচ্চতর জগতের আলোর জন্যে আস্পৃহা করা, এই হলো প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রশ্ন : আমাদের প্রকৃতির অবাধ্য অংশগুলিকে কেমন ক'রে সমর্পণে রাজী করা যায় ?

উত্তর : অবোধ শিশুকে যেমন করে বোঝাও তেমনি ক'রে তাদের বোঝাতে হবে সকল রকম উপায়ে, নানারকম ব্যাখ্যা ক'রে, ছবি দেখিয়ে, দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, প্রতীক দেখিয়ে। সত্তার অন্য অংশের সঙ্গে তাদের মিল থাকার যে কত দরকার সে কথা বোঝাতে বিশেষ চেষ্টা করবে ; যুক্তি দিয়ে তারা যা করছে তার ফল কি হবে সে সম্বন্ধে চেতন ক'রে দেবে। আর সর্বোপরি তুমি ধৈর্য ধরে থাকবে, একই কথা বহুবার বুঝিয়ে বলতে হলেও তাতে কখনো ক্লান্ত হবেনা।

প্রশ্ন : সে কাজের পক্ষে মন কি সহায়ক হতে পারে ?

উত্তর হাঁ, যদি মনের এক অংশ সম্পূর্ণ আলোকদীপ্তি পেয়ে থাকে, যদি সেই অংশ চৈত্যের আলোর কাছে সমর্পিত হয়ে সত্যের আভাস পেয়ে থাকে, তাহলে সে মন খুবই সহায়ক হতে পারে, সঠিকভাবে সব কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারে।

প্রশ্ন পূর্বজন্মগুলির সম্বন্ধে কি সাধারণ রাস্তা বা নিয়ম ছকা থাকে, না সব রকমই সম্ভব ?

উত্তর : তা নির্ভর করে তুমি কেমন স্তরে রয়েছ, চৈত্য উন্নতির কোন ধাপে আছো তারই উপর। যদি পরিণতি লাভের কাছাকাছি পৌঁছে থাকো, তাহলে আগে যেমন বলেছি, মৃত্যুর ঠিক আগে যেমন পরজন্ম তুমি বেছে নেবে তা সফল হবে, তার মানে তখন সবই সম্ভব

হতে পারবে কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনর্জন্ম হয় প্রায় আপনাআপনি। সেখানে চৈত্য ভালোভাবে না গড়ে ওঠাতে সে নিজে কিছু বেছে নিতে পারেনা, সুতরাং সেখানে নিয়ম কিছু থাকেনা। অনেকটা নির্ভর করে ঘটনাচক্রের উপর, বিশেষত চৈত্য তার গঠনের পক্ষে কোন ধারা অনুসরণ করছে তার উপর, সুতরাং গোড়ায় যে রাস্তা ধরে শুরু হয়েছিল তারই উপর। এ সম্বন্ধে ঠিক ক'রে বলা কঠিন। কার কোন লিঙ্গে জন্ম হবে তাও অনেক-কাল পর্যন্ত ঠিক থাকেনা, বারবার অদলবদল হতে থাকে। চেতনা যখন বৃদ্ধি পায় তখন একটা সমতা আসে, এক ধারা ছেড়ে অন্য ধারা বেছে নিয়ে চলতে পারে, কিন্তু তেমনি বেছে নেবার মতো অবস্থা আসার আগে ইতিমধ্যে অসংখ্য জন্মের ভিতর দিয়ে কতবার লিঙ্গবদল হয়ে গেছে। হয়তো সেই কারণেই কত মেয়ের পুরুষের মতো চরিত্র হয়, কত পুরুষের মেয়ের মতো চরিত্র হয়, লিঙ্গ বৈপরীত্যের ভাবটা এসে পড়ে। কিন্তু "বাছাই" যখন করতে পারো তখন তুমি সৃষ্টিচেতনার কিংবা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীচেতনারও অন্তর্গত হতে পারো। সব নির্ভর করবে উৎপত্তির উপর।

প্রশ্ন : সকল চৈত্যের কি একই রূপ ভাবে উৎপত্তি হয়?

উত্তর : ব্যাপারটা এইরকম হয়। চৈত্য জীবনের প্রথম সূত্রপাতে জড়ের মধ্যে যে ভগবৎ-উপস্থিতি ঘটে তা একই প্রকার, এ কথা তো জানাই আছে; কিন্তু তা ছাড়া উপরের জগতের যে সকল সত্তা পৃথিবীতে নেমে এসে কখনো দেহধারণ করেনি তারা চায় এখানে এসে কিছু কাজ করতে। তারা অপেক্ষা ক'রে থাকে এখানকার কোনো চৈত্যসত্তা ভালো ভাবে পরিণত হয়ে ওঠা পর্যন্ত, তা হলেই তখন তারা ওর মধ্যে মিলে গিয়ে নিজেদের প্রকৃতি অনুসারে কাজ করতে থাকে। এইভাবে তাদের চেতনা পার্থিব চৈত্যের চেতনার সঙ্গে এসে যুক্ত হ সেই সব অজন্মিত সত্তারা সৃষ্টির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে নিজেদের সার্থক ক'রে তুলছে। তারাই হয়তো ভগবানের প্রথম বিভূতি বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে এই বিশ্বের মধ্যে প্রেরিত—মানুষ যাদের বলে দেবতা বা অধিদেবতা। এদেরই কেউ বিশেষ কিছু কারণে হয়তো একটি সুগঠিত চৈত্যসত্তাকে বেছে নিলে—এবং সে যথেষ্ট যোগ্য ও প্রস্তুত হয়ে উঠলে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পৃথিবীতে তার বিশেষ কাজটি শুরু ক'রে দিলে। যদিও ঘন ঘন এমন হয়না কিন্তু এইরকম কত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পুরানো কিংবদন্তীতে তোমরা দেবতাদের অবতার হয়ে এখানে আসার কথা অনেক শুনেছ, পুরাণেও এমন কথা আছে। কিন্তু বাস্তবেও এমন জিনিস হয়ে থাকে। তবে সকল চৈত্যের বেলাতে তা হতে পারেনা।

(মা অতঃপর প্রাণস্তরের সত্তাদের পৃথিবীতে এসে "ভর করা"র প্রসঙ্গে এসে পড়লেন।)

প্রশ্ন : ঐ সব প্রাণময় সত্তাদের কি চৈত্য থাকে ?

উত্তর : না। আমি আগেই বলেছি যে কোনো ব্যক্তির দেহের উপর ভর করতে হলে আগেই তারা তার চৈত্যকে সেখান থেকে হটিয়ে দেয়। এটা জন্মের সময় থেকেও হতে পারে। অনেক শিশু প্রায় মরার মতো অবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হয় ; প্রথমে মনে হয় সে মৃত, কিন্তু হঠাৎ তারা বেঁচে ওঠে—এর মানে কোনো প্রাণময় সত্তা তার উপরে ভর ক'রে ঢুকেছে। এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। আবার অসুখের অবস্থার মধ্যেও তা হতে পারে। কেউ হয়তো খুব অসুস্থ হয়ে পড়াতে তার চৈত্যের বন্ধন শিথিল হয়ে এলো, তারপর মূর্ছিত অবস্থার মধ্যে যেমনি সে বন্ধন কেটে গেল অমনি কোনো প্রাণময় সত্তা এসে দেহটিকে দখল করলে। এমন দৃষ্টান্ত আমি জানি। আবার ক্রমে ক্রমে এমন হতে পারে : প্রাণময় সত্তা এসে অপেক্ষা করতে থাকল কোনো ব্যক্তির আবহাওয়ার মধ্যে, অল্পে অল্পে তার প্রভাবে লোকটিকে অসুস্থ বা অজ্ঞান ক'রে ফেললে, বিশেষত কোনো মানসিক ব্যাধি এনে ফেললে ; তারপর চৈত্যের সম্পর্ক যেমনি কেটে গেল অমনি তার দেহটিকে সে অধিকার করলে। এমন হয়েছে যে কেউ শক্ত অসুখ থেকে সেরে ওঠার পরে আগে যেমন মানুষ ছিল তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে দাঁড়াল : এইরকম ভাবেই ওদের ভর করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন যে এরা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে আকৃষ্ট। তা কেন ?

উত্তর : আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু আকৃষ্ট হলেও যে সেটা গ্রহণ করবে এমন কথা নয়। এ সব সত্তাদের মধ্যে মিথ্যাবাদিতাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস—এদের প্রকৃতিটাই ছলে পড়া। মোহ জন্মাবার যথেষ্ট শক্তি আছে এদের ; তাই দেবতাদের মতো প্রচুর আলোর ছটা ছড়িয়ে এরা দেখা দিতে পারে, তবে ঐকান্তিক লোকেরা তাতে প্রতারিত হয়না, তখনই ভিতর থেকে ইঙ্গিত পায় সতর্ক হবার জন্য। কিন্তু কারো যদি অপূর্ব রকমের অলৌকিক জিনিস দেখার দিকে ঝোঁক থাকে, যদি কেউ নাটকীয় ধরনের জীবন পেতে চায়, তারাই সহজে ওদের দ্বারা প্রতারিত হয়।

এমনি ব্যাপার সম্প্রতিই ঘটে গেছে আধুনিক ঐতিহাসিক চরিত্র হিটলারের বেলাতে। সে এমনি এক সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল যাকে সে ভগবান বলেই মনে করতো ; সেই সত্তাই তাকে পরামর্শ দিত যখন যা করতে হবে। হিটলার তাই অনেক সময় নির্জনে থাকতো তার "উপদেষ্টা"র কাছ থেকে নির্দেশ পাবার জন্য, এবং সেই নির্দেশগুলি সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। সে সত্তাটি প্রকৃতপক্ষে ছিল একজন অসুর, গুহ্যবিদ্যায় যাকে বলে মিথ্যা-রাজ্যের রাজা, আর সে নিজেকে প্রচার করত সর্বদেশের রাজা বলে। চেহারাটা বেশ জমকালো হওয়াতে সকলকেই সে ঠকাতে, কেবল যারা গুহ্যবিদ্যা জানে আর চেহারার ভিতরের দিকটা দেখতে পায় তাদের পারতোনা। সুন্দর চেহারা দেখে অন্য সবাই তার

কাছে ঠকতো। হিটলারের কাছে সে দেখা দিত ঝল্‌মলে সাঁজোয়া আর ঝক্‌ঝকে মুকুট মাথায় দিয়ে, তার মাথার চতুর্দিক থেকে একটা আগুনের ছটা বেরিয়ে আসতো, তা এমনই তীব্র যে হিটলার সেদিকে চাইতে পারতনা। কখন কি করতে হবে সব কথাই সে হিটলারকে বলতো—একটা বাঁদরকে কিংবা ইঁদুরকে নিয়ে লোকে যেমন খেলায় তেমনি ক'রে সে ওকে খেলাতো। সে চেয়েছিল যে হিটলারকে সে যথাসম্ভব উঁচুতে উঠিয়ে দেবে, তার পর একদিন তার ঘাড় মটকাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। এমন দৃষ্টান্ত আরো অনেক আছে, তবে এর তুলনায় তা অনেক ছোটোখাটো।

হিটলার ছিল ভালো রকমেরই এক নাধাম, কিন্তু তার বুদ্ধি ও বিচারণশক্তি ততটা ছিলনা। ঐ প্রাণময় সত্তাটির সব কথাই সে বিশ্বাস ক'রে নেনে নিতো। সেই সত্তাই ওকে ঠেলে ঠুলে ক্রমে ক্রমে খুব উপরে ওঠালে, এটা কেবল খেলার ছলেই সে করেছিল, ওজন্বের সঙ্গে নয়। মানুষ ওদের কাছে অতি তুচ্ছ প্রাণী, বেড়ালে যেমন ইঁদুর ধরে প্রথমে খানিকটা খেলায় তার পর খেয়ে ফেলে, ওরাও মানুষকে নিয়ে তাই করে।

প্রশ্ন যারা মনোবিকারগ্রস্ত তাদের উপরে কি ওদের এমনি ভর হয়?

উত্তর হাঁ, কেবল যাদের মস্তিষ্কযন্ত্রে কিছু দোষ ঘটেছে কিংবা বিগ্‌ড়ে গেছে কিংবা কোনো চোট্ খেয়েছে, তাদের বেলাতে ছাড়া অন্যান্য প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাই হয়ে থাকে। প্রমাণ এই যে মন যাদের রোগে বিগ্‌ড়েছে তাদের সেই রোগটি আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা সুস্থ হয়না। কিন্তু যাদের উপর ভর হয়েছে তাদের শীঘ্রই সারানো যায়। দুঃখের বিষয় যারা ওটা চায় তাদেরই অমন হয়ে থাকে। যাদের সত্তার মধ্যে প্রচুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে দম্ভও এসে যোগ দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল আত্মানুরাগ—এই সব লোককে নিয়েই ওদের খেলা চলে। এমন জনকয়েক লোককে আমি জানতাম যাদের উপর আধা-আধি রকমের ভর হয়েছিল, আমি চেয়েছিলাম তাদের সেই সব সত্তাদের কবল থেকে মুক্ত করতে। যদিও তাতে তারা তখনকার মতো কিছু নিষ্কৃতি পেলে, কিন্তু বেশিদিন তা টিকলনা; ভরটা যেমনি ছেড়ে গেল অমনি তারা ভাবতে শুরু করলে, "এ তো নেহাৎ সাধারণ মানুষ হয়ে গেলাম, আগের মতো অসাধারণ আর কই থাকলাম।" অর্থাৎ তারা একটা অসাধারণ রকমের ক্ষমতা পেয়েছে বলে বোধ করত, যদিও তা অনিষ্টকর জিনিস, তবু তাইই তারা পছন্দ করত। তখন আর কি করে, তারা চাইতে লাগল যে সেই ক্ষমতা আবার ফিরে আসুক। অবশ্য যে সত্তাকে তাড়ানো হয়েছে সে আর ফিরে আসতে পারেনা, কিন্তু অমন সত্তা তো হাজার হাজার আছে, একটার জায়গাতে অন্যটা এলো। একজনের বেলাতে আমি তিনবার এমনি হতে দেখলাম, শেষে আমাকে বলতে হলো, "আমি আর পারছিনা বাপু, এবার তুমি নিজেকে নিজে সামলাও।"

প্রশ্ন : এ সব ক্ষেত্রে চৈতোর কি অবস্থা হয় ?

উত্তর : সাধারণত তা আর থাকেইনা।

এ কথা জেনে রেখো যে ঐ সব প্রাণময় সত্তারা হলো অমর—কখনো ওরা মরেনা। ওদের নষ্ট করা যায় কেবল বিশুদ্ধ অধ্যাত্মশক্তির জোরে। প্রাণশক্তি নিয়ে যদি লড়তে যাও (অনেকের থাকে তেমন শক্তি) তাতে ফল একই রকম হয় : তাকে প্রাণের জগতে তুমি পিষে ফেলতে পারো, নেরে ফেলতেও পারো, কিন্তু আবার সে বেঁচে উঠবে নিজমূর্তিতে। বোধ করি এর থেকেই রক্তবীজের ঝাড়ের কথা বা বহুমুণ্ড রাক্ষসের কথা কিংবদন্তীতে বলে থাকে।

জগতে কেবল একমাত্র শক্তিই তাদের সমূলে বিনাশ করতে পারে, সে হলো পরমতম স্রষ্টার শক্তি...যা আসে অতিমানস জগতের ওপার থেকে—সকলের আয়ত্তে তা আসেনা। সে শক্তির স্বরূপ হলো শ্বেতশুভ্র সমুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়, তা এতই তীব্র যে সহজ চোখে সেদিকে চাওয়া যায়না, চাইলে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। সে আলোকের স্পর্শমাত্রই প্রাণময় সত্তা মিলিয়ে যায়—জলের ভিতরকার শামুকবিশেষের মুখে নুন পড়লেই যেমন তারা গলে যায় তেমনি।

প্রশ্ন : রাসপুটিন কি ছিল কেনো প্রাণময় সত্তা ?

উত্তর : তার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা শুনেছি—কেউ কেউ বলতো দেবতার অবতার, আবার কেউ বলতো শয়তানের অবতার। বলতে পারিনা, তার সঙ্গে আমার সংস্পর্শ ঘটেনি।

প্রশ্ন হিটলার মরে গেলে কি নিথ্যারাজ্যের রাজা ষ্ট্যালিনের উপর গিয়ে ভর করলে ?

উত্তর : ব্যাপারটা ঠিক ওরকম হয়না, তবে কাছাকাছি একটা কিছু হয় বটে। সেই প্রাণসত্তাকে হিটলারের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, এইখানে তোমার ভুল হলো। এরা কেবল একটিমাত্র স্থূলদেহতেই আবদ্ধ থাকেনা। সে সত্তা হিটলারকে অধিকার ক'রে থেকেও অন্যের উপর ক্রিয়া করতে পারে। হিটলারকে সরিয়ে দেওয়া হলো এই কারণে যে তার পিছনে ছিল বিরাট একজাতি ও তাদের বিপুল শক্তি, তার সাফল্য ঘটলে সেটা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একটা দারুণ দুর্দশার ব্যাপার হতো ; কিন্তু হিটলারকে সরালেই যে তার পিছনকার শক্তিটাও সরে যাবে এমন ভুল কেউ করেনি—জিনিসটা অত সহজ নয়। এটা জেনে রেখো যে দেবতাদের সৃষ্টির আগে ওদের উদ্ভব হয়েছিল ; ওরাই হলো প্রথম বিভূতি, বিশ্বের প্রথম ব্যক্তিসত্তা ; সুতরাং একটিমাত্র লড়াই জিতেই যে ওদের তাড়ানো যাবে এত

সহজ নয়। বিশ্ব-বিবর্তনের প্রয়োজনে যতকাল ওদের থাকা দরকার ততকালই ওরা থাকবে। ওদের সে দরকার যখন ফুরিয়ে যাবে তখন হয় ওরা বদ্‌লে যাবে নতুবা একেবারে লোপ পাবে।

তা ছাড়া ওরা এখন জানছে যে ওদের শেষ অবস্থা হয়ে এসেছে, তখন ওরা যতদূর পর্যন্ত অনিষ্ট করতে পারে তা করছে।

ছিল ওরা চারজন। প্রথম জন বদ্‌লে গেছে, দ্বিতীয় জন তার মূল উৎপত্তির মধ্যে মিলিয়ে গেছে। বাকী আছে দুজন, তারা আগের দুজনের চেয়ে আরো বেশি দুর্ধর্ষ। গুহ্যবিদ্যাতে ওদের একজনকে বলা হয় "নিধ্যারাজ্যের রাজা", আর অন্যজন হলো মৃত্যুর রাজা। এরা যতকাল রয়েছে ততকাল দুর্গতিগুলো থাকবেই।

---

* S. A. I. C. E. Bulletin থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী" Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে)

১০৮

"জনক রাজার কাজকর্ম দেখে দেবর্ষি নারদও তাঁকে একজন বিষয়াসক্ত সুখান্বেষী ব্যক্তি ও লম্পট বলে ভেবেছিলেন। ভিতরের আত্মাকে না জেনে কেমন ক'রে জানা যাবে যে একজন কেউ মুক্ত অথবা আবদ্ধ?"

এর থেকে অনেক প্রশ্নই আসতে পারে। যেমন নারদ কেন আত্মাটিকে দেখলেন না?

আমার কাছে এর জবাব খুব সহজ। নারদ ছিলেন দেবর্ষি, আংশিক রকমের দেবতা, নয় কি? অতিমানস লোকের অন্তর্গত বলে তিনি সূক্ষ্মদেহও নিতে পারতেন, কিন্তু এদের কোনো চৈত্য থাকেনা। দেবতাদের মধ্যেও চৈত্যের কেন্দ্রস্বরূপ স্ফুলিঙ্গটুকু নেই যা আছে কেবল পৃথিবীর মধ্যে (এমন কি বিশ্বের মধ্যেও নয়), অর্থাৎ এখানেই কেবল জড়ের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমের অবতরণ ঘটাতে তার অন্তরে অন্তরে ভগবৎ-উপস্থিতির সূত্রপাত হয়েছে। কিন্তু দেবতাদের মধ্যে চৈত্য না থাকায় তার সম্বন্ধে কিছু জানেইনা। কেউ কেউ ওর অনুভূতি পেতে এখানে আসতে চায়—কিন্তু অধিকাংশই নয়।

তারা আংশিকভাবে যা পেয়েছে তা "বিভূতি"রূপে, সেটা সামগ্রিক জিনিস নয়। যেমন বিবেকানন্দকে বলা হয় শিবের বিভূতি; কিন্তু শিব অতিমানস জগৎকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছিলেন। পৃথিবী যখন অতিমানস জীবনের উপযোগী হবে তখন তিনি সেই ভাবে আসবেন। ওঁরা প্রায় সকলেই তখন দেখা দেবেন—এখন শুধু অপেক্ষা করছেন। বর্তমান কালের সংগ্রাম সংঘর্ষ ও গণ্ডগোলের মধ্যে তাঁরা নামতে চাননা।

নারদ এসেছিলেন...আস্বাদ পাবার জন্য। তিনি ঘটনাচক্রকে নিয়ে লীলা করতে ভালোবাসতেন। কিন্তু চৈত্য সম্বন্ধে কিছু জানা ছিলনা বলে জনককে চিনতে পারেননি।

তবে এ সব জিনিসের সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়না; এ হলো ব্যক্তিগত ধারণা ও অনুভূতির ব্যাপার, যা বিষয়গত করে অন্যকে শেখানো যায়না। ব্যক্তিগত অনুভূতির দাম শুধু তারই কাছে।

শ্রীঅরবিন্দ পূর্বোক্ত যে কথাটি বলেছেন তা এ দেশের প্রবাদ হতে, তার সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভূতিও মিলে গেছে।

প্রশ্ন: আত্মাকে জানতে তাহলে আপন চৈত্যকে জানা দরকার?

উত্তর: হাঁ, আত্মার অর্থাৎ চৈত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হতে হলে নিজের মধ্যে চৈত্য থাকা দরকার—আর বিবর্তনের কারণে পৃথিবীর মানুষ যারা তাদের মধ্যে চৈত্য আছে।*

১২।১।১৯৬৫

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পতগতি ভট্টাচার্য

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

It's *Spencer's*

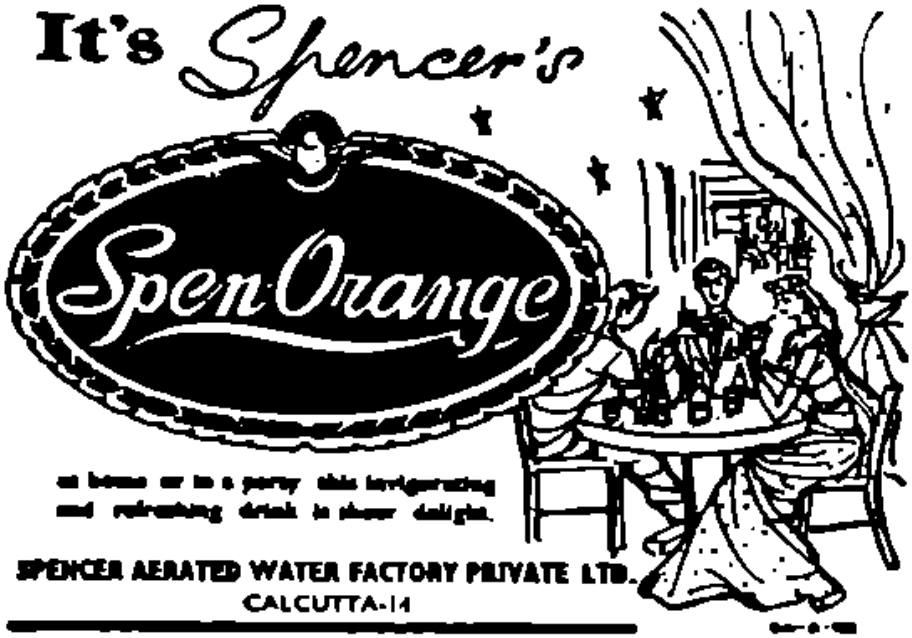

at home or in a party this invigorating and refreshing drink is sheer delight.

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14

Troubled by insects ? ?

If so, please do not hesitate to make use of our up-to-date scientific and efficient servicing arrangements by specially trained staff for completely disinfecting your premises with :

I.C.I.'s " GAMMEXANE " FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

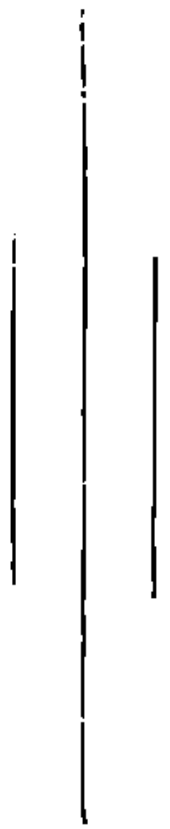

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

Bokaro, Barauni, Bandel...Durgapur, Delhi, Dhuvaran...and Satpura—these are the milestones along the path of Kuljian's progress in India. Together, these projects mean 1.8 million kilowatts of thermal power for the nation's grid.

THE FIRST INDIAN POWER CONSULTANTS

Fourteen years ago, Kuljian arrived on the Indian scene to build the Bokaro power plant in the best tradition of American power engineering. In its Indian journey through over a decade, American 'know-how' has become Indian 'know-how' and The Kuljian Corporation of America is today The Kuljian Corporation (India) Private Ltd., in which a majority of shares is held by Indian engineers of the Company. In its design office in Calcutta, an able team of Indian engineering and construction talent spells out Kuljian 'know-how' in thousands of blue-prints and data-sheets, making it possible for projects of all types to be built in India, with the minimum amount of foreign exchange, under the expert supervision of Indian power and industrial consultants.

your partner in progress

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

ENGINEERS • CONSTRUCTORS

24-B, PARK STREET, CALCUTTA-16

U.S.A. OFFICE 1200 NORTH BROAD STREET, PHILADELPHIA

SURVEYS ■ REPORTS ■ DESIGN
ENGINEERING ■ PROCUREMENT
CONSTRUCTION ■ INSPECTION ■ INITIAL OPERATION

"We do not belong to the past dawns,
but to the noons of the future."

ZENITH RUBBER WORKS

INDIA'S FOREMOST MANUFACTURERS
OF
HIGH GRADE RUBBER SOLES & HEELS

Office & Factory :— **15, South Tangra Road,**
CALCUTTA-15

Telegrams: **'Vessel' Cal**
Codes { Scotts 10th. Ed.,
A. B. C. 5th. Ed.,
Bentley's

Telephones { Office : 23-1393
Dock Office:
Residence: { 55-6464
55-3724
55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS
3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:
AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:
LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

-The Mother

BENGAL IMMUNITY

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALGUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

বর্ষ—২৫ সংখ্যা—৩

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগষ্ট, ১৯৬৫)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

১। মায়ের বাণী		৫
২। ইন্দ্র-বিরোচন এবং প্রজাপতি	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৮
৩। সাবিত্রী	শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	১১
৪। ভারত কি সত্য	শ্রীঅরবিন্দ	১৯
৫। কালিদাসের তাৎপর্য	শ্রীঅরবিন্দ	২৯
৬। মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	৩৬
৭। প্রশ্নোত্তর	শ্রীমা	৫০
৮। কঠিন ডানার ওড়া	বীরবাহু	৫১

বর্ত্তিকার নিয়মাবলি

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৭শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা-শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য—১৷৷০ টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Edited by: NOLINI KANTA GUPTA

Printed by: AMIYO RANJAN GANGULI
at Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

PRINTED IN INDIA

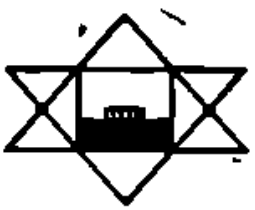

১৫ আগস্ট, ১৯৬৫

একদিন নিশ্চয় জগৎও মুক্তি পাবে মৃত্যু থেকে
প্রেমের কল্যাণে।

—শ্রীঅরবিন্দ

মায়ের বাণী

ছোটদের উদ্দেশে

(১)

"কি করলে সবচেয়ে ভাল সেবা তোমার হয়?"

—তোমার সত্যকার সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হলে, তার সঙ্গে এক হ'য়ে গেলে।

"ভগবানের কাছে কি রকমে নিজেকে দিয়ে দেওয়া যায়?"

—মন দিয়ে দেবে তার সব চিন্তা
হৃদয় দিয়ে দেবে তার সব আবেগ
শরীর দিয়ে দেবে তার সব কর্ম্ম।

"মানুষকে দেহত্যাগ করতে হয় কেন?"

—কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সমান দ্রুতবেগে সে চলতে পারে না ক্রমোন্নতির পথে।

"মৃতের দেহকে কি সম্মান দেখাতে হয়? কি রকমে তবে?"

—সব জিনিষকেই সম্মান করতে হয়, মৃত হোক আর জীবিত হোক—জানা দরকার সবই জীবিত ভগবানের চেতনার মধ্যে।
সম্মান অনুভব করবে হৃদয়ে, অন্তরের ভাবে।

"মৃতের দেহেও কি ভগবান রয়েছেন?"

—ভগবান সর্ব্বত্র—আমি আবার বলি ভগবানের কাছে মৃত বা জীবিত কিছু নাই, সবই চিরকালের জন্য বাস করে তাঁর মধ্যে।

"মৃতের অন্তরাত্মাকে সুখী রাখবার জন্যে কি করা উচিত, কি করলে তার পুনর্জ্জন্ম হবে ভাল পরিবেশের মধ্যে, এই যেমন আধ্যাত্মিক পরিবেশ?"

—কখনও ক্ষুব্ধ হবে না, থাকবে ধীর শান্ত, যে গিয়েছে তার রাখবে প্রীতিময় স্মৃতি।

"অন্তরাত্মা কি কখনও কাঁদে?"

—কাঁদে যখন কোন-কিছু তাকে ভগবানের কাছে থেকে দূরে নিয়ে যায়।

"কারো কান্না থামাতে হলে কি করতে হয়?"

—তাকে আন্তরিকভাবে গভীরভাবে ভালবাসতে হয়, তার কান্না থামাবার কোন চেষ্টা না করে।

"মিথ্যার হাত থেকে কি করে মুক্তি হয়?"

—সত্যকে দেবীরূপে আরাধনা কর, মিথ্যা থেকে তিনিই তোমাকে মুক্ত করবেন।

(বাহ্য) হৃদয় হ'ল মানুষী পৃথিবীর জিনিষ,
অন্তরাত্মা হ'ল আধ্যাত্মিক বিশ্বজগতের বস্তু।

তোমার কাজ করে যাও, সহজ শান্ত প্রাণে, স্থির মনে—প্রেরণা আপনা থেকেই আসবে, প্রয়োজন অনুসারে।

ভগবান সদা-সর্ব্বদাই জয়ী—তবে নিজের ধারায়, নিজের ইচ্ছাক্রমে—মানুষের ধারায় নয়, মানুষী ইচ্ছাক্রমে নয়।

ভগবান কাছেই রয়েছেন সদা-সর্ব্বদা, তবু আমরা তা অনুভব করি না।

(২)

যা কিছু ঘটে সবই ভগবানের ইচ্ছার ফল এবং তাঁর উপর যার বিশ্বাস আছে, ঘটে তার পরম শ্রেয়ের জন্য।

সত্যকার বল ও রক্ষা আসে অন্তরস্থ ভগবান থেকে।

এই ভগবৎ-সান্নিধ্য যদি নিরন্তর তোমার মধ্যে ধরে রাখতে চাও, তবে বাক্যে ব্যবহারে কর্ম্মে সকল রকম হেয়তা সযত্নে বর্জ্জন করবে।

উচ্ছৃঙ্খলতাকে মুক্তি বলে, হীন আচরণকে স্বাধীনতা বলে ভুল করবে না। চিন্তা হবে নির্ম্মল, আত্মা হবে প্রসন্নতর।

তুমি বলছ আনন্দের কথা—জড়-জগতে আনন্দ বলে কিছু নাই। তবুও আনন্দকে সরিয়ে নাও, জগৎ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাবে।

জীবন ত এই রকম। জগৎ হল মিথ্যার ক্ষেত্র—কেবল ভগবানের নীরব গভীরতার মধ্যেই রয়েছে সত্যের শান্তি।

নিজের তুষ্টি চাইবে না, অপরের তুষ্টিও চাইবে না। চাও শুধু ভগবানের তুষ্টি—একমাত্র তিনি হলেন সত্য।

আমাদের প্রত্যেকে—শরীরধারী প্রত্যেক মানুষই—হ'ল ভগবানের উপর মিথ্যার আবরণ—তাঁকে ঢেকে রাখবার জন্য।

একমাত্র তিনিই নিজের কাছে নিজে সত্য—তাঁর উপর একাগ্র হতে হবে, এই মিথ্যার আবরণের উপর নয়। *

* অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ইন্দ্র-বিরোচন এবং প্রজাপতি

(ছান্দোগ্য উপনিষদ)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি একদিন বললেন—

আত্মা হল অপাপ অজর অমর অশোক ক্ষুৎপিপাসামুক্ত, সত্যকাম, সত্য-সঙ্কল্প, এ আত্মাকে খুঁজতে হবে জানতে হবে—এ আত্মাকে যে খোঁজে ও জানে সে লাভ করে যাবতীয় লোক, যাবতীয় কাম্য।

ভগবানের এই বাণী পৌঁছিল গিয়ে দেবতাদের কাছে, অসুরদের কাছে। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলে—আত্মা যখন এমন জিনিষ যাতে সব লোক লাভ হয়, সকল কাম্য লাভ হয়, তবে এস আমরা আত্মার অনুসন্ধানে যাই। দেবতারা তাদের প্রতিনিধি করে পাঠালেন ইন্দ্রকে আর অসুরদের প্রতিনিধি বিরোচন। তারা পরস্পরের অজ্ঞাতে পৃথকভাবে গিয়ে উপস্থিত হল সৃষ্টিকর্তার কাছে—সমিধ-পাণি হয়ে—অর্থাৎ অগ্নি জ্বালাবার জন্য কাঠ অর্ঘ্যরূপে সংগ্রহ করে—দুজনেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করলেন—এবং প্রজাপতির কাছে এইভাবে দিন অর্থাৎ কাল কাটালেন ৩২ বৎসর। ৩২ বৎসর ধরে হ'ল প্রথম পরীক্ষা। তারপর সৃষ্টিকর্তা দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা যে ৩২ বৎসর ধরে এখানে বাস করলে, কি উদ্দেশ্যে? তখন দুজনেই বললে—আমরা শুনেছি ভগবানের এই বাণী—আত্মা হল পাপহীন, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুৎপিপাসাহীন। তার কাম্য সত্য, সত্যই সঙ্কল্পনীয় তার, তাকে অন্বেষণ করতে হবে, জিজ্ঞাসা তারই সম্বন্ধে করতে হবে। আর যে আত্মাকে অনুসরণ করে জানতে পারে, সে সকল লোক অধিকার করে, সকল কাম্য অধিকার করে। এই আত্মাকে জানবার জন্যেই আমরা উভয়ে এখানে বাস করেছি।

সৃষ্টিকর্তা তখন বললেন, "দেখ চক্ষুর মধ্যে রয়েছে আত্মা, সেখানেই তাকে দেখা যায় —সেই আত্মাই অমৃতনভয়হ, যার তাই হল ব্রহ্ম—তারা দুজনে জিজ্ঞাসা করলে—জলের মধ্যে দর্পণের মধ্যে চক্ষু দেখে প্রতিবিম্বিত পুরুষ, সে কে?—সৃষ্টিকর্তা উত্তরে বললেন, "এ সকলেরই মধ্যে আত্মা প্রকাশ পেয়েছে।"

প্রজাপতির একটু হেঁয়ালী অর্থাৎ প্রতীকের বা রূপকের ভাষা। তিনি বলতে চান আত্মা (ব্রহ্ম বা ভগবান) রয়েছেন চক্ষের মধ্যে, কারণ তাকে চক্ষে দেখা যায়, তবে এই চক্ষু দিয়ে নয়, আর এক চক্ষু দিয়ে। ইন্দ্র বিরোচন দুজনেই বুঝলেন, চোখে যখন আত্মা রয়েছে—নিজেরই চোখে—আর নিজের চোখ নিজের চক্ষু দিয়ে যখন নিজে দেখা যায় না, তখন তাঁরা ভাবলেন প্রতিবিম্বের কথা—তাঁরা মনে করলেন তাঁরা খুব চতুর—প্রজাপতির কথার অর্থ সুন্দর আবিষ্কার করেছেন—প্রজাপতি তাদের প্রশ্নের উত্তরে আরো হেঁয়ালি করে বললেন, হাঁ, সকলের মধ্যেই ত এই আত্মা রয়েছে।

প্রজাপতি তাঁদের আরো বললেন—"জলপূর্ণ পাত্রে দেখ নিজেকে—তারপর যদি কিছু বুঝতে না পার আত্মা সম্বন্ধে তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।" জলের মধ্যে তাঁরা নিজের নিজের স্বরূপকে দেখলেন এবং পুনরায় প্রজাপতির নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখলে তোমরা—দুজনেই যুগপৎ উত্তর দিলেন সাগ্রহে—ভগবন্, আমরা দেখলাম সমগ্র আত্মাকে মাথার কেশাগ্র থেকে পায়ের নখাগ্র পর্যন্ত—দেখলাম আত্মার স্বরূপ। প্রজাপতি তাঁদের বললেন, "বেশ—এখন তবে তোমরা সুন্দর বসনে-ভূষণে সুসজ্জিত হয়ে দেখ ত' জলের মধ্যে"—তাঁরা তাই করলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সুন্দর বসনে ভূষণে অলঙ্কৃত হয়ে দেখলেন নিজেদের আকৃতি জলের মধ্যে। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দেখলে এবার?" তারা দুজনেই তেমনি সোৎসাহে উত্তর দিলেন—আত্মাকে, এবার দেখলাম সুন্দর সুসজ্জিত আত্মাকে। প্রজাপতি তুষ্ট হয়ে বললেন, "বেশ তাই, তোমরা আত্মাকেই দেখেছ, যে আত্মা হল অমৃতম্ অভয়ম্ ব্রহ্ম।"

দুজনে বিদায় নিয়ে চলে গেলে প্রজাপতি ভাবলেন—দুর্ভাগ্য এদের—আত্মাকে না জেনেই এরা চলে গেল—ওদের কেউ যদি মনে করে এই হল উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান—শরীরই ব্রহ্ম—তবে ত তার বিনষ্টি নিশ্চিত।

বিরোচন তৃপ্ত তুষ্ট হয়ে সত্য সত্যই ফিরে গেল—অসুরদের কাছে গিয়ে শিক্ষা দিল এই উপনিষৎ—এই যে দেহ দেখছ এই হ'ল আত্মা—আত্মারূপী দেহকেই মহীয়ান করবে, দেহেরই পরিচর্য্যা করবে—দেহ-আত্মাকে মহান করে তুললে, তার সেবা করলে উভয় লোকই জয় হয়—এ-লোক আর ও-লোক।

এই জন্যই শ্রদ্ধাহীন যে মানুষ দান করে না, যজ্ঞ করে না—তাদের বলা হয় অসুর—অসুরদের হ'ল এই উপনিষৎ—ভোগের দ্বারা, বসন-ভূষণের দ্বারা শরীরকে সাজাতে হয়, তবেই এ লোক জয় করা যায়, অসুরদের এই ধারণা।

ইন্দ্র কিন্তু ফিরে যেতে যেতে ভাবতে সুরু করলেন—এই দেহ সুন্দর করলে, প্রতিবিম্ব দেহও সুন্দর হয়, একে সাজালে অন্যটিও সজ্জিত হয়, একে পরিষ্কৃত করলে দ্বিতীয়টিও পরিষ্কৃত হয়,—আবার এইটি যদি অন্ধ হয়, অপরটিও হবে অন্ধ, এটি যদি হয় খঞ্জ অপরটিও হবে তাই—এর অঙ্গহানি হলে ওরও হবে অঙ্গহানি, শরীরের যাই হয় শরীরের প্রতিবিম্ব তাই হবে—তা যদি হয় তবে এতে সার্থকতা ত কিছু আমি দেখি না।

ইন্দ্র প্রত্যাবর্তন করলেন পুনরায় সমিধপাণি হয়ে। তাকে দেখে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি ত তুষ্ট হয়ে শান্ত মনে বিরোচনের সঙ্গে প্রস্থান করেছিলে—ফিরে এলে কি উদ্দেশ্যে?" ইন্দ্র উত্তর করলেন "ভগবন্। দেখলাম ত এই শরীর সজ্জিত হলে, প্রতিবিম্ব শরীরও সজ্জিত হয়, এ অলঙ্কৃত হলে ওটিও অলংকৃত হয়...শুধু তাই নয় এ অন্ধ হলে ওটিও অন্ধ হয়, এটি খঞ্জ হলে ওটিও খঞ্জ হয়, এটির অঙ্গহানি হলে ওটিরও অঙ্গহানি হয়—এর মধ্যে লাভের কিছু ত দেখছি না।" প্রজাপতি বললেন—"এ রকমই হয়ে থাকে—

তবে তোমাকে আবার আরো বুঝিয়ে বলব—আরো ৩২ বৎসর বাস কর আমার এখানে।" ইন্দ্র আরো ৩২ বৎসর বাস করলেন। তারপর আবার প্রজাপতির কাছে উপস্থিত হলেন—প্রজাপতি এখন আরো ব্যাখ্যা দিলেন—জাগ্রতের কথা তোমাদের পূর্ব্বে বলেছি। স্বপ্নের মধ্যে যে পুরুষ বিচরণ করেন তিনিই মহনীয়, তিনিই আত্মা—তিনিই অমৃতং অভয়ং ব্রহ্ম —ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে শান্ত চিত্তে আবার ফিরলেন—কিন্তু পথে আবার তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হল—বেশ, অবশ্য জাগ্রতের দেহের কোন ক্ষতি হলে স্বপ্নে দেহে কোন ক্ষতি হয় না, জাগ্রতের দেহের দোষ এতে প্রফলিত হয় না—কিন্তু নিদ্রায় স্বপ্নের মধ্যে এ সকল ত অনুভব হয় যে কে যেন আক্রমণ করতে আসছে, কে যেন এর পিছনে ছুটছে—এর দুঃখ হয়, শোক হয়—তবে এতে লাভ কি, সার্থকতা কি?

ইন্দ্র পুনরায় ফিরে গেলেন প্রজাপতির কাছে—প্রজাপতির কাছে বললেন তাঁর অভিজ্ঞতা। প্রজাপতি শুনে এবারও বললেন তুমি ঠিক বলেছ—তোমায় আরো আগে বলব, তুমি এবারো আর ৩২ বৎসর অপেক্ষা কর।

বত্রিশ বৎসর পরে প্রজাপতি বললেন, এবার আরো আগের কথা—স্বপ্নের পরে সুপ্ত অবস্থা, সমস্ত চেতনা শান্ত স্তব্ধ হয় সেখানে, কোন বিকার অনুভব থাকে না। এই সুপ্ত পুরুষ আত্মা, ব্রহ্ম অমৃতম্ অভয়ম্। এবারও ইন্দ্র পূর্ব্বের মত তুষ্ট হয়ে ফিরলেন কিন্তু আবার তাঁর সন্দেহ দেখা দিল। তিনি চিন্তা করলেন—এই সুপ্ত অবস্থায় কোন জ্ঞান কোন চিন্তা থাকে না, "আমি" জ্ঞান থাকে না; আমি যদি থাকে, বিশ্ব থাকে না—কিছুই থাকে না—সব অনন্তি—এ বোধের সার্থকতা আমি বুঝি না। আবার তিনি ফিরলেন প্রজাপতির কাছে। আগের মত এবারেও প্রজাপতি বললেন "তোমার অনুভূতি ঠিক, তবে আরো ৫ বৎসর আমার কাছে থাক, তোমাকে শেষ উপদেশ ও সিদ্ধি দেব।" আরো পাঁচ বৎসর ইন্দ্র প্রজাপতির কাছে রইলেন, অর্থাৎ মোট তিনি রইলেন ৩২×৩+৫=১০১ বৎসর।

এর পরে ইন্দ্রকে প্রজাপতি শেষ দীক্ষা দিলেন। জাগ্রত-স্বপ্ন-সুপ্তির ওপরে রয়েছে যে চিদ্‌ঘন কূটস্থ আত্মা বা ব্রহ্ম বললেন তার কথা। এই চতুর্থ বা তুরীয় পদের আত্মাই হল সেই পরম ব্রহ্ম যিনি রয়েছেন তমসাপারে—অন্ধকারের ওপারে—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুপ্তি ত অজ্ঞান অন্ধকারই। সেই তুরীয় অবস্থাই সত্য-সত্য অমৃতং অভয়ং।

অসুর সত্যের প্রথম পাদ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে রইল। তার বল, শারীরিক বল—বলং বলং বাহুবলং,তাদের লাভ ও বিজয় আছে। দেবতাদের প্রবর সুদীর্ঘ; তাদের কাম্য সত্যকার সত্য, পূর্ণ সত্য—অর্দ্ধ সত্য বা সত্যাভাস নয়। তাদের বিজয় পরিশেষে, তাদের অপেক্ষা করতে হয় অনেক, তাদের অর্জন করতে হয় শারীর বল নয়—পূর্ণাত্মার বল। ১০১ বৎসর কেন? ১০০ পূর্ণতাদ্যোতক,তার উপর এক অর্থবা পূর্ণ পূর্ণতা। অন্য সংখ্যাগুলির রহস্য রহস্যাবৃতই রইল।

সাবিত্রী

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

বিদ্যা ও বহুদর্শিতার যে গভীরতা থাকলে কাব্যালোচনা করা যায় তার পরিমাণ বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে নতুন করে বলার প্রয়োজন দেখছি না। একথা সবাই জানেন যে সহৃদয় না হলে কাব্যামৃতরসাস্বাদ নিজেও করা যায় না, অন্যকেও সে রসের আস্বাদ দেওয়া যায় না। সহৃদয় শব্দের অলংকারশাস্ত্রসঙ্গত অর্থ না দেখেও এর সামান্য অর্থ আমরা পাই যা হচ্ছে 'সমানহৃদয়'—অর্থাৎ কিনা এমন হৃদয় যে কবিহৃদয়ের সঙ্গে সমরসতার অনুভব করে। এই সমরসতার অনুভব না হলে কবিকল্পিত বাণীচিত্র পরের মাপে তৈরী জামা কাপড়ের মত পাঠকের বেমানান লাগে, পাঠক কাব্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই কবির কাব্যকে আপন হৃদয়েরই উচ্ছ্বাস বলে অনুভব করতে পারে না। কবি যে ভাবের ব্যঞ্জনার জন্য শব্দরাশির সুনিপুণ প্রয়োগ করে থাকেন ভাবগ্রাহী চিত্তে ছাড়া তার প্রকাশ হতেই পারে না। সুতরাং কাব্যসমালোচনার জন্য রসবোধপরিমার্জিত অনুশীলন সংস্কৃত চিত্তের প্রয়োজন হয়। সাধারণতম কবিসৃষ্টির জন্যই এগুলির প্রয়োজন হয়, যোগিশ্রেষ্ঠের চিন্ময় অনুভূতির বাঙ্ময় রূপ যে কাব্য তার রসাস্বাদনের জন্য যে এ যোগ্যতার প্রয়োজন আরও কতখানি তা বলাই বেশি।

এই কথা কটি বলার প্রয়োজন হল এই জন্যে যে যে-মহাকাব্যের মর্যাদানিরূপণ করার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছি, তার মর্ম, ভাবব্যঞ্জনা যে আমি নিঃশেষে উপলব্ধি করতে পেরেছি একথা বলার সাহস আমার নেই, তবে নিঃসঙ্কোচে বলব এই কাব্যের ভাবগভীরতা, ধ্বনি-সুষমা, প্রসাদগুণ সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ করেছে আমার মতো প্রাকৃতজনকেও, করবেও সবাইকে, তা তিনি যেই হোন না কেন। তাই আমার বক্তব্যের মধ্যে সুনিপুণ সমালোচকের সূক্ষ্মবিচারশক্তির অভাব থাকতেও পারে, কিন্তু আমার অনুভবের সততার মধ্য দিয়ে একথা প্রমাণিত হবেই যে সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন অধিকারীই এ থেকে পরমানন্দ অনুভব করবেন নিঃসন্দেহে।

কাব্যের মধ্যে মানুষ কোন অর্থটি খোঁজে—তার আপাতবোধ্য শব্দার্থ না অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গার্থ? এই অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গার্থ অর্থাৎ ধ্বনিই যে উত্তমকাব্যের মহত্বসূচক একথা ভারতীয় রসিকসমাজ ধ্বনিবাদগুরু বিদ্বান আনন্দবর্ধনের নির্দেশ—'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ' অনুসারে সুপ্রাচীন যুগ থেকে স্বীকার করে এসেছেন এবং পরীক্ষা করে স্থাপন করেছেন। কাব্যের

এই ধ্বনিপ্রাণতা শব্দকে অস্বীকার করে মানতে হয় না শব্দার্থের আশ্রয়েই ধ্বনির স্ফুরণ। ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম শব্দ, কিন্তু সেই শব্দ ব্যবহারিক জগতের ভাবকেও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারেনা এটা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন। অতএব ভাব যেখানে গগনচুম্বী, গুহানিহিত দুরধিগম্য তত্ত্বকে আশ্রয় করেছে সেখানে শব্দ কত অকিঞ্চিৎকর। তাই অধ্যাত্ম পথের কথা অনিবার্যভাবেই হয়ে পড়ে সংকেতময়, রহস্যঘন। চিন্তার শান-বাঁধানো রাজপথে চলতেই শব্দ স্খলিতগতি হয়ে পড়ে, ব্যবহারিক চিন্তার উর্ধ্বে অলোকসামান্য পথে যখন সে চলে তখন শব্দ আরও অসহায় হয়ে পড়ে। তাই এমন কাব্যে কবির সচেতনতাকে আরও সজাগ, আরও ক্রিয়াশীল রাখতে হয়। যে কবি এমন তত্ত্বকে কাব্যের বিষয় করেন তিনি অসামান্যকর্মী, তাঁর কাব্যও অনন্যসাধারণ।

এমনি অসামান্যকর্মী মহাকবি শ্রীঅরবিন্দ, এমনি অনন্যসাধারণ মহাকাব্য 'সাবিত্রী'। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দপ্রশস্তিতে তাঁকে সম্বোধন করেছেন—"স্বদেশআত্মার বাণীমূর্তি" বলে। এই বিশেষণ যে কত সার্থক তা তাঁর যোগজীবনের পর্যালোচনা না করলেও কেবল 'সাবিত্রী' পাঠের দ্বারাই অনুভব করা যায়। ভারতআত্মার উৎকাঙ্ক্ষা, তাঁর জীবনবোধ, জন্মমৃত্যুরহস্যের অজ্ঞানবিজয়—এ সবের এক ঐতিহ্য স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ভারতীয় কবি সেই তত্ত্বের সেই ভারতআত্মার স্বরূপের উপলব্ধিতে আর তার প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেছেন যুগে যুগে—তারই ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রকাশ দেখা গেছে বেদে, উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণকাহিনীতে, সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, বাংলায়—সর্বভাষায়। শুধু ভারতবর্ষে নয় আত্মা তাঁর রহস্যের দ্যুতহাসিতে ডেকেছেন সর্বদেশের সর্বকালের চিন্তাশীলদের—আজও তাঁর সে ডাক তো শেষ হয়নি। আমাদের যুগে শ্রীঅরবিন্দ সেই ডাকেরই প্রত্যুত্তর রচনা করেছেন মহাকাব্য 'সাবিত্রী'তে।

সাবিত্রীর উপাখ্যানভাগ মহাভারতের বনপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কাহিনী সতীত্বের মহোজ্জ্বল আদর্শপ্রতিতে ভারতীয় সমাজে চিরকাল পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক সাধ্বী নারীর ব্যক্তিগত পরমলক্ষ্য হল সাবিত্রীপদ—নারী যে শুধু পুরুষের নর্ম-সখীমাত্রই নয়, নয় কেবল "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—তার সর্বোত্তম পরিচয় সে শক্তিমতী, সে মৃত্যুকে জয় করতে পারে—এ সত্যকে প্রকাশ করেছেন মহাভারতের স্রষ্টাকবি। তারই ভিত্তিতে মহাকবি শ্রীঅরবিন্দ দেখেছেন সাবিত্রীকে জগন্মাতার প্রতিরূপ হিসেবে—যার কাজ তনুর পৃথিবীকে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত করা অপূর্ণ, বিমূঢ় দুঃখশোকজীর্ণ, মৃত্যুত্রস্ত এই পার্থিব সৃষ্টিকে আত্মস্বরূপের উপলব্ধিতে এগিয়ে দেওয়া, আর তাকে বোঝানো যে মৃত্যুতে আত্মার শেষ নয়, শক্তি তার অসীম আর সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত হলেই জগন্মাতার কৃপা আসবে নেমে, ধন্য করবে এই বসুন্ধরাকে মৃত্যুকে পরাজিত করে।

সাবিত্রী-সত্যবানের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনকথাকে কবি রূপকের আশ্রয়ে বিশ্বমানবের

কথায় পরিণত করেছেন। মৃত্যুর আঘাতে একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগ একমাত্র সাবিত্রীর জীবনেই ঘটেনি—তা ঘটেছে আর ঘটে আসছে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জীবনে। মহাকাল যার অদৃষ্ট মানবজীবনকে অনুক্ষণ টেনে রাখে অন্ধকারের মধ্যেই। আত্মার অসীম শক্তি, জড় জগতের বন্ধন যে তার কিছুই নয় এ বোধ মানুষের মধ্যে জাগাতে দেয়না সেই অচেতন জড়শক্তি। তাই নিরন্তর আমরা দেখি মানুষকে দ্বন্দ্বভারে প্রপীড়িত। একদিকে তার চিন্ময় সত্তা আর একদিকে তার মৃন্ময় দেহ—উদ্ভ্রান্তি থেকে উদ্ভ্রান্তিতে তদ্গতাভিভূতের মতো ঘুরে মরাই যেন তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

A riddle of opposites is made his field;
Freedom he asks but needs to live in bonds,
He has need of darkness to perceive some light
And need of grief to feel a little bliss;
He has need of death to find a greater life.
All sides he sees and turns to every call;
He has no certain light by which to walk;
His life is a blind-man's buff, a hide and seek;
He seeks himself and from himself he runs;
Meeting himself, he thinks it other than he.

পর্ব ৩, সর্গ—৪

মানবজীবনের এই অন্তহীন গতি, যার একমাত্র ফল কেবল মানুষের গলদ্ঘর্ম পরিশ্রম আর নৈরাশ্য তার একটা মানে চাই। এই পরমরহস্যময়ী পৃথিবীর সকল জটিলতার মূলে যে মহাশক্তির লীলা চলছে তাকে তো জানতে হবে কেননা কবি বুঝেছেন—

A high and black negation is not all,
A huge Extinction is not God's last word,
Life's ultimate sense, the close of being's course,
The meaning of this great mysterious world.

পর্ব ৩, সর্গ—২

সাবিত্রী মহাকাব্যে শ্রীঅরবিন্দ এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করেছেন যে মর্ত্যতী বিনষ্টিতেই মানবজীবনের শেষ নয়। যার যার বাঁচা যায় সেই জীবন জীবাতে অনেন—সে বাঁচবার

উপায়টি কি? এ দেহ তো নয়, প্রতিদিনই তার নাশ হয়ে চলেছে। যার বিনাশ অপচয় নেই, যা পূর্ণ থেকেও পূর্ণতর সেই অচলনহিমায় বিরাজ করেন আত্মা তাঁকে ধরতে হবে, তাঁরই অনুসরণে অগ্রসর হতে হবে পরমাত্মার অভিমুখে তবেই মানুষের সার্থকতা। সেই আত্মাই জীবন। আবার যা বেঁচে থাকে তাকেই যদি জীবন বলি—জীব্যতে যদ্—তাহলেও পাওয়া যায় সেই আত্মাকেই, দেহের বিনাশের পরও যা অবিনাশী থেকে যায়। আমাদের জীবনলাভ করতে হবে বললেই তাই মানে দাঁড়ায় আমাদের আত্ম-উপলব্ধি করতে হবে। আত্মবস্তু ছাড়া বাকি সব কিছুই নিরর্থক—

"A good is this immense material world."

প: ১, স:—২

কাব্যের প্রারম্ভ হয়েছে এই immense material world-এর উৎপত্তি দিয়ে। সেই মহাশূন্য, ঘোর অন্ধকার unlit temple of eternity থেকে কী করে ক্রমশ: পৃথিবী ও পার্থিবপ্রাণের আবির্ভাব হল তা গভীর গম্ভীর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে প্রথম পর্বের ১ম সর্গে। সৃষ্টিপ্রারম্ভের এই বর্ণনা শুধু কাব্যিক দৃষ্টিতেই অপূর্ব নয়, তা যথার্থ। সমালোচক আম্বলাল পুরাণী মহাশয় ঋগ্বেদ এবং উপনিষদ থেকে তুলনীয় পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে শ্রীঅরবিন্দের কবিকল্পনা কত দৃঢ়ভিত্তিক। সে চেষ্টা না করেও আমরা বলব যে শ্রীঅরবিন্দের বর্ণিত সৃষ্টিপ্রারম্ভ যথার্থ কেননা তিনি কবি, আর কবি যা উপলব্ধি করেন তাই সত্য।

কবি শব্দটা নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনা থাকে। কবি কাকে বলি? ছন্দ অলংকার আর গুণ এ সবের মিশ্রণে যে কবিকর্ম প্রকাশ পায় তাই তো কবিতা, কিন্তু কবিতা লিখলেই কি কবি হওয়া যায়? সাধারণ অর্থে হয়ত হওয়া যায় কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে কবি কেবল ছন্দোনিপুণ কাব্যরচয়িতাই নয়—তিনি মনীষী, তিনি সব বস্তুকে তার যাথাতথ্য অর্থাৎ যথার্থ রূপে সৃষ্টি করেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও আত্মাকে বোঝাতে সংস্কৃত সাহিত্যে কবি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। এ সম্পর্কে ভট্টতৌত যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য—

নানৃষি: কবিরিত্যুক্ত: কবিশ্চ কিল দর্শনাৎ।
বিচিত্রভাবধর্মাংশতত্ত্বপ্রখ্যা চ দর্শনম্।
স তত্ত্বদর্শনাদেব শাস্ত্রেষু পঠিত: কবি:।
দর্শনাদ্বর্ণনাচ্চাপি ক্রান্তালোকে কবিশ্রুতি:।
তথা হি দর্শনে স্বচ্ছে নিত্যোঽপ্যাদ্যিকবের্মুনে:
নোদিতা কবিতা লোকে যাবদ্ভ্রাতা ন বর্ণনা॥

মানে হল, ঋষি যিনি নন তিনি কবি নন আর কবি হতে হলে দর্শন চাই। দর্শন বলতে বুঝি বিচিত্রভাবরাশি, ধর্ম এবং তত্ত্বের জ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান থাকলেই শাস্ত্র তাকে কবি বলেছেন,

কিন্তু লৌকিক জগতে কেবল দর্শন নয় তার সঙ্গে বর্ণনও থাকলে তবেই কবিপ্রতিভা হয়। উদাহরণ—আদিকবি বাল্মীকিমুনি। দর্শন তাঁর স্বচ্ছ ছিলই কিন্তু বর্ণনা যতদিন না তার সঙ্গে যুক্ত হল, ততদিন কবিতার উদ্ভব হয়নি। এ থেকে কবির দুটি দিক আমরা পাই —এক তাঁর দর্শন, তাঁর তত্ত্বোপলব্ধি, আর একটি দিক তাঁর বর্ণনা, তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ। শ্রীঅরবিন্দ আজীবন যোগসাধনের মধ্যে দিয়ে যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন তার যথার্থ প্রকাশ হয়েছে, ধরা যাক্ Life Divine-এ। আর তাঁর সেই দিব্যজীবনতত্ত্বই যখন বর্ণনাকে আশ্রয় করেছে তখন তাই রূপ নিয়েছে মহাকাব্য সাবিত্রীর। Life Divine-এরই কাব্যিক বর্ণনা সাবিত্রী—আখ্যান ও রূপক।

আগের সূত্রে ফিরে এসে তাই বলব শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টিপ্রারম্ভ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল। এ তিনি দেখেছেন দ্রষ্টারূপে, প্রকাশ করেছেন কবিরূপে।

সাবিত্রী মহাকাব্যের প্রথম খণ্ডখানিই আমি দেখেছি। এর মধ্যে এমন সব উপলব্ধির বর্ণনা আছে যা আমাদের সামান্য ধারণার বাইরের জিনিস। কিন্তু আমাদের মন তাকে গ্রহণ না করেও পারে না, তার কারণ কেবল এই নয় যে এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু আমরাই, আমাদেরই মর্ত্যজীবন—যাকে তিনি দিব্যজীবনের মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার আর এক কারণ এও বটে যে তাঁর সত্য-উপলব্ধি সর্ববিধ জটিলতামুক্ত একটি শুভ্রসরল প্রকাশ লাভ করেছে। তিনি যে তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তা দুরূহ হতে পারে কিন্তু তার আবেদন সার্বভৌম। ধরাছোঁয়ার বাইরের সুদূর নীলাকাশ যেমন আমাদের মনপ্রাণকে টানে, তেমনি মহাকাব্য সাবিত্রী আমাদের আকর্ষণ করে সেই অমরত্বের উপলব্ধির দিকে। পঙ্কক্লিন্ন পার্থিবজীবনের বাঁধাজলে সাবিত্রী যেন একটি অপূর্ব শতদল, চারিদিকের মালিন্যকে সে জানে কিন্তু তার স্পর্শে সে মলিন নয়, সে তার শুভ্রশুচি শ্রীকে উদ্ঘাটিত করে রেখেছে ঊর্ধ্ব দিকে মধ্যগগনের প্রদীপ্ত সূর্যের দিকে। তার প্রার্থনা "হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ সরিয়ে দাও হে পূষণ, আমরা লাভ করি সত্যকে, ধর্মকে আর লাভ করি দৃষ্টিশক্তি।"

সাবিত্রীকে কবি নাম দিয়েছেন—A Legend and a Symbol, আখ্যান ও রূপক। এর আখ্যানে আমরা পাই মদ্রদেশের রাজা অশ্বপতিকে, যিনি আঠার বছর কঠিন তপশ্চরণ করেছিলেন, সন্তানকামনায়। সাবিত্রীর বরে তিনি যে কন্যা লাভ করেন, তারই নাম রেখেছিলেন সাবিত্রী; অপরূপ সুন্দরী সে সাবিত্রী মর্ত্যজীবনের চরম অভিশাপে—

মৃত্যুর অভিশাপে—হারালো নিজের প্রিয়তম সত্তাবানকে। মৃত সত্তাবানকে সে আবার মনকে সন্তুষ্ট করে ফিরে পেয়েছিল। এই আখ্যানকেই রূপক করে ব্যবহার করেছেন শ্রীঅরবিন্দ —মূল আখ্যানকে যথাযথ রেখেই। এই রূপকটির সামান্য আলোচনা করব।

রাজা অশ্বপতির সন্তানকামনাকে শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তিগত কামনা হিসেবে নেননি। অশ্বপতি পীড়িত মানুষের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিয়েছেন কাব্যে। প্রথম খণ্ডের প্রথম পর্বের ৩য় সর্গ থেকে তৃতীয় পর্বের ৩য় সর্গ পর্যন্ত অশ্বপতির তপস্যার বর্ণনা করা হয়েছে। পুঞ্জে দ্বিতীয় পর্বে অশ্বপতির ক্রম ঊর্ধ্বগতি বর্ণিত হয়েছে অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অশ্বপতি উঠেছেন উপরে। অজ্ঞেয়ের অনুসরণে যেখানে এসে তিনি পৌঁছলেন সে এক অপূর্ব ক্ষেত্র—সচ্চিদানন্দের নিরত প্রকাশে সে স্থান সদাসমুজ্জ্বল। কিন্তু এই কি তার কাম্য ছিল? তাই তার অন্তরে প্রশ্ন জাগে। যদিও

The ego is dead; we are free from being and care,
We have done with birth and death and work and fate.

তবু—

O Soul, it is too early to rejoice !
Thou hast reached the boundless silence of the Self,
Thou hast leaped into a glad divine abyss;
But where hast thou thrown Self's mission and Self's power ?
On what dead bank on the Eternal's road ?
One was within thee who was self and world,
What hast thou done for his purpose in the stars ?

Only the everlasting No has neared
And stared into thy eyes and killed thy heart;
But where is the lover's everlasting Yes,...

নিজের মুক্তি ত অশ্বপতির কাম্য নয়, তিনি চান জগন্মাতার সেই মহাশক্তির অবতরণ যার স্পর্শে জীবনের সীমানির্ধারক মৃত্যু হবে নির্বাসিত। তাই তিনি জাগাতে চান সেই মহাশক্তিকে—

In absolute silence sleeps an absolute Power.
Awaking it can wake the trance-bound soul
And in the ray reveal the parent Sun :
It can make the world a vessel of Spirit's force,
It can fashion in the clay God's perfect shape.

ঈশ্বরের পূর্ণমূর্তিকে এই মাটির পৃথিবীতেই রূপ দেওয়াতে হবে সেই সাধনা অশ্বপতির, তাই তিনি উপাসনা করেন জগন্মাতার। মায়ের কৃপা ছাড়া সেই পরম সত্যের কল্যাণমূর্তি দেখা যেতে পারেনা। অবশেষে মায়ের দেখা পেলেন তিনি। আশীর্বাদও পেলেন। মহাশূন্যের মধ্যে মায়ের বাণী তাঁর কানে এসে বাজল· তিনি বললেন, অশ্বপতির সাধনা তার নিজস্ব থাকুক, সে যেন আরও বেশি না আশা করে, অসময়ে ঐশ্বরিক শক্তির অবতরণ হলে পৃথিবী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে—

What thou hast won is thine, but ask no more.

Awake not the immeasurable descent,
Speak not my secret name to hostile time;
Man is too weak to bear the Infinite's weight.
Truth born too soon might break the imperfect earth.

জগন্মাতার উপদেশ হলো—

Leave the all-seeing Power to hew its way,

অনেক যুক্তি থাকলেও এ উপদেশ অশ্বপতির তৃপ্তিকর নয়, তাই মায়ের এই কথার তিনি খণ্ডন করেন—প্রার্থনা করেন কাতরকণ্ঠে তাঁর মহাশক্তির, যাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। পৃথিবীর অপূর্ণতাকে দূর করার জন্য তাঁর কাতর আবেদন বিশ্বজননীর পায়ে অপূর্ব হয়ে উঠেছে—

"O radiant fountain of the world's delight
World-free and unattainable above,
O bliss who ever dwellest deep hid within.
While men seek thee outside and never find,
Mystery and muse with hieratic tongue,
Incarnate the white passion of thy force,
Mission to earth some living form of thee.
One moment fill with thy eternity,
Let thy infinity in one body live,
All knowledge wrap one mind in seas of light,
All love throb single in one human heart.

অশ্বপতির এই কাতর প্রার্থনায় জগন্মাতা প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর স্বীকৃতিতেই তৃতীয় পর্ব্বের শেষ। তিনি রাজি হলেন পৃথিবীতে নামতে—যে তাঁরই শক্তি নিয়ে আসবে একজন,

যে মর্ত্যের বন্ধন থেকে মুক্ত করবে, প্রকৃতিকে অদৃষ্টের গ্রন্থিকে পরিবর্তিত করবে অপরিবর্তনীয় শক্তিতে। তাঁর রূপ আর কাজ বর্ণনা করেছেন কবি—

All mights and greatnesses shall join in her;
Beauty shall walk celestial on the earth
Delight shall sleep in the cloud-net of her hair
And in her body as on his homing tree
Immortal love shall beat his glorious wings.

Fate shall be changed by an unchanging will

সাবিত্রী মহাকাব্যের বিষয়বস্তুর সৌন্দর্য ও মহত্বের সামান্য ইঙ্গিত মাত্র করা গেল। কবিত্বসিদ্ধির যে অসংখ্য নিদর্শন, উপমা ও রূপকল্পনা প্রকাশ পেয়েছে, ভাষার সুন্দর স্বচ্ছতায় প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় বৃহত্তর আলোচনাসাপেক্ষ। মহাকাব্য সাবিত্রীর সামান্য পরিচয় প্রদান করেই আমার বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার করলাম।

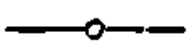

ভারত কি সভ্য ?

প্রথম অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ

এরকম বেশ চমকপ্রদ নাম নিয়ে কয়েক বছর আগে মিঃ উইলিয়ম আর্চারের রাশহীন বাচালতার উত্তরে তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সুলেখক স্যার জন উড্রফ একখানি বই প্রকাশ করেছিলেন। এই সুপরিচিত নাচাপ্রবণ নিন্দুকটি নিজের স্বাভাবিক নিরাপদ বিচরণ-ক্ষেত্র ছেড়ে—যেখানে তাঁর প্রধান দাবি চমৎকার এবং নির্বিকার মিথ্যাভাষণের—ভারতবর্ষের গোটা জীবন এবং সংস্কৃতিকে আক্রমণ করলেন আর, এমন কি, তার মহত্তম কীর্তি সব—দর্শন, ধর্ম, কাব্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ—নির্বিশেষে এক অবর্ণনীয় বর্বরতার জঘন্য স্তূপ বলে অভিহিত করলেন। সে সময়ে অনেকে বলেছিলেন এরূপ সমালোচকের উত্তর দেওয়া নেহাৎই চাকার উপর প্রজাপতি, এক্ষেত্রে ভীমরুল, পিষে মারা। কিন্তু স্যার জন উড্রফ ধরে বসলেন এমনধারা অজ্ঞানপ্রসূত আক্রমণকেও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; সাধারণ দলের মধ্যে এটিকে একটি বিশেষ কার্যকরী নমুনা বলে নিলেন, যেহেতু এতে ফুটে উঠল খৃষ্টীয় এবং মিশনারী দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে যুক্তিবাদীর ভঙ্গি, যেহেতু উপরন্তু এতে নগ্ন করে দেখা গেল এসব আক্রমণের তলায় কোন প্রাকৃত মংলব। তবে তাঁর বইখানি গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক বিশিষ্ট একজন সমালোচকের দেওয়া উত্তর হিসাবে নয়, বরং এই জন্য যে এতে তীক্ষ্ণ ও তীব্রভাবে তুলে ধরা হল ভারতীয় সভ্যতার বাঁচবার সমস্ত প্রশ্নটি এবং সেই সঙ্গে অনিবার্য সংস্কৃতি-সংঘর্ষ।

ভারতে কোনো সভ্যতা ছিল কিম্বা আছে এনিয়ে আজ আর সংশয় নেই, কারণ যাঁদের মতামতের দাম তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন এই এক বিশেষত্বমণ্ডিত অপূর্বচরিত্র সভ্যতার অস্তিত্ব। স্যার জন উড্রফের লক্ষ্য হল এশীয় ও য়ুরোপীয় সভ্যতার তফাৎটি খুলে দেখান এবং তার চেয়েও বড় করে দেখান ভারতীয় সভ্যতার মূল্য ও মর্যাদা, কী বিপদের মধ্যে সে, তার বিনাশে জগতের কী ক্ষতি। লেখক বললেন যে এই সভ্যতার সংরক্ষণ বিশ্ব-মানবের কাছে দরকারী এবং এর সম্মুখে মহাবিপদ। মানব-জগতে বর্তমান ঘূর্ণী-বিপর্যয়ের ফলে যে দারুণ পরিবর্তনের স্রোত ধেয়ে আসছে তাতে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, য়ুরোপীয় আধুনিকতার দ্বারা আক্রান্ত, বাস্তবজগতে অধিনত, আপন সন্তানের হাতে ঔদাসীন্যের কৃতঘ্নতার ঘাতে জর্জর, তার আধার জাতির অন্তরাত্মা সহ চিরদিনের মতো হয়ত বিনাশ পাবে।

বইখানি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে এই পবিত্র সম্পদের মর্যাদা আরো বোঝা চাই, তার আশু বিপদটি দেখা চাই, এই সংকটমুহূর্তে অটল অচলভাবে তার সহায়তা করা চাই। একান্ত জরুরী এই সমস্যাটির ভূমিকা হিসাবে বইটির সারমর্ম সংক্ষেপে বলা কাজের হবে।

এই পৃথিবীতে সভ্যতার সুখই হল মানুষের যথার্থ পার্থিব লক্ষ্য, আর সভ্যতার সুখ নিহিত চিৎ মন এবং দেহের এক স্বাভাবিক সৌমনস্য আবিষ্কার এবং ধারণের মধ্যে। একটি সংস্কৃতির মূল্য নির্ভর করে কতখানি সে আবিষ্কার করেছে এই সুসঙ্গতির ঠিক চাবিকাঠি, কতখানি তার প্রকাশের ধারা ও প্রেরণাকে সুশৃঙ্খল করতে পেরেছে তার উপর। একটা সভ্যতার বিচার হবে কী রকমে তার সকল মূলসূত্র, ভাব, রূপ, জীবনধারা তৎপর হয়ে এই সৌমনস্যটি ফুটিয়ে তোলে, তার ছন্দময় লীলাকে চালায়, তার প্রাণধারা অব্যাহত রাখে কিংবা তার বহুবৃত্তিকে পরিস্ফূর্ত করে তার উপর। এমন লক্ষ্যের দিকে চলে যে সভ্যতা সে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মতো উগ্র জড়াশ্রয়ী হতে পারে, প্রাচীন গ্রীক-রোমকের মতো একান্ত মানসসর্বস্ব এবং বুদ্ধিপ্রধান কিংবা অদ্যাবধি জীবন্ত ভারতের সভ্যতার মতো আধ্যাত্মিকও হতে পারে। ভারতের মূল ভাবটি হল শাশ্বত, চিতের এই জড়াধার গ্রহণ, এরই মধ্যে জড়িত এবং নিহিত থেকে আবার পার্থিব স্তরে আবির্ভাবের ক্রমপর্যায় ধরে ব্যক্তিসত্তার জন্ম জন্ম অতিক্রমের পরে শেষে মানুষী মানসে এসে ভাবধারণার জগতে, সচেতন নৈতিকের জগতে— ধর্মে—প্রবেশ। এই সিদ্ধি, অচেতন জড়ের উপর এই বিজয় তার আপন লীলার ধারা মেলে চলে, প্রসারিত করে ধরে স্বরাজ্য, টেনে তোলে তার ভূমি—তখনই মানসযন্ত্রটির সাত্ত্বিক অথবা আধ্যাত্মিক অংশটুকুর ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রকাশ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত মনোময় পুরুষকে মনের ঊর্ধ্বে নির্বাবিল অধ্যাত্ম-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হতে সক্ষম করে তোলে। এই ভাবের উপর ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত; তার দর্শন এরই বিশ্লেষণ; তার ধর্ম অধ্যাত্ম-চেতনাও এই ফলাকাঙ্ক্ষী; তার শিল্প সাহিত্যেরও এই একই ঊর্ধ্বদৃষ্টি; তার গোটা ধর্ম বা জীবন-বেদই এর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রগতি সে মানে, তবে এই আধ্যাত্মিক প্রগতি, অন্তর্লীন ক্রমসমৃদ্ধ ও সুপুষ্ট আত্মিক সভ্যতার বহিরঙ্গে আত্মপ্রকাশের পদ্ধতিটি নয়। এই সমুচ্চ ভাবের উপরে তার জীবনসৌধের প্রতিষ্ঠা এবং শাশ্বত ও অধ্যাত্মের দিকে টানই তার সভ্যতার বিশেষ মূল্য ধরে দিয়েছে। সব মানুষী ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এই মহত্তম আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা তার দেশকে দিয়েছে বিশ্বসভার এক অনন্যতা।

অন্য ধারণা এবং এমন কি বিপরীত মনোবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত অন্য রকমের আরো সভ্যতা আছে। আর জড়বিশ্বে জীবনের প্রখর নিয়ম দ্বন্দ্বনীতির পরিণামে এসব বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষ অনিবার্য। প্রকৃতির নিভৃতচারী প্রবৃত্তির চেষ্টা প্রত্যেককে প্রসারিত হয়ে বিপরীত বা বিরোধীকে নাশ, স্বীকৃত বা স্থানচ্যুত করা। সংঘর্ষ কখনই শেষ বা আদর্শ অবস্থা নয়; সে অবস্থা আসে তখনই যখন নানা সভ্যতা অবাধে, বিনা হিংসায়, বিনা ভুল-বোঝাবুঝি কিংবা আক্রমণে পরিস্ফূর্ত হয়ে চলে, চলে এমন কি একটা নিভৃত ঐক্যের বোধ

নিয়ে, নিজস্ব বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তবে যতক্ষণ দ্বন্দ্বনীতির প্রভুত্ব ততক্ষণ নিরুত্তর নীতিটির সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই হয়; যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র হওয়া মারাত্মক। যে-সংস্কৃতি তার জীবন্ত স্বতন্ত্রতা ত্যাগ করে, যে-সভ্যতা তার সকর্মক আত্মরক্ষা অবহেলা করে তাকে অপরে গ্রাস করে আর যে-রাষ্ট্র এই নির্বীর্যতাকে জীবনে জড়িয়ে ধরে সে তার অস্তরাত্মা হারিয়ে নিজেই লুপ্ত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র মানবসত্তার মধ্যে ক্রমবিকাশমান শক্তি, অন্তরের এই সত্য নিয়েই সে বাঁচে। আমাদের হল ভারতশক্তি, এক মহান আধ্যাত্মিক ভাবের জাগ্রত শক্তি, এরই প্রতি আনুগত্য তার জীবনের মূলনীতি।

দ্বন্দ্বনীতি এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে যুগান্তব্যাপী সংঘর্ষ এবং বৈরিতার চাপের একটা বৃহৎ ঐতিহাসিক রূপই ধারণ করে বসেছে। এই সংঘর্ষ, এই পারস্পরিক প্রভাবন ও আকর্ষণের একটা স্থূল দিকও আছে, যেমন রয়েছে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক। স্থূলভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে য়ুরোপ বারংবার এসে পড়েছে এশিয়ার উপর, এশিয়াও তেমনি পড়েছে য়ুরোপের উপর—লক্ষ্য জয়, আত্মসমর্পণ, আধিপত্য। এই দুই শক্তি-সমুদ্রের বরাবর চলে এসেছে টানা-হেঁচড়া, একবার এর দাপট আর একবার ওর। ন্যূনাধিক মাত্রায় প্রখর ও প্রস্ফুটভাবে সমস্ত এশিয়াই দেখিয়েছে আধ্যাত্মিক প্রবণতা তবে এই আসল ব্যাপারে এশিয়ার জীবনবেদের মূলধ্বনিটি বেজেছে ভারতবর্ষে। মধ্যযুগে য়ুরোপও এনেছিল এক সভ্যতা যেখানে খৃষ্টীয় ভাবের আধিপত্যে—খৃষ্টধর্মের উৎস আবার এশিয়াখণ্ডে—অধ্যাত্ম প্রবৃত্তি পেয়েছিল প্রধান স্থান; একটা মূলগত মিল যেমন এখানে ছিল তেমন খানিকটা পার্থক্যও। তবে উভয়ের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বরাবরই থেকে গিয়েছে। বিগত কত যুগ ধরে য়ুরোপ হয়েছে বস্তুতান্ত্রিক, শিকারী, আক্রমণাত্মক এবং হারিয়ে ফেলেছে মানুষের অন্তরের সঙ্গে বাহিরের সেই মিল যা সভ্যতার আসল সত্য এবং যথার্থ প্রগতির প্রকৃত শর্ত। তার উপাস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কায়িক আরাম, স্থূল উন্নতি, বস্তুতান্ত্রিক বিষয়ে দক্ষতা। আধুনিক যে য়ুরোপীয় সভ্যতা এশিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং যার স্বরূপ ফুটে উঠেছে ভারতীয় নানা আদর্শের উপর বেপরোয়া আক্রমণে—এই জড়বাদী সংস্কৃতির তা-ই কর্কঠ রূপ। আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির যথার্থ অনুসারী ভারতবর্ষ এশিয়ার য়ুরোপের উপর আক্রমণে কখনো অংশীদার হয় নি; তার পথ চিরদিন ভাবের সূত্রে বিশ্বজয়, যেমন আবার ঘটতে চলেছে দেখছি। কিন্তু যাহাত ভারত এখন য়ুরোপের অধীন এবং এই স্থূল বিষয়ের সঙ্গে অবশ্য রয়েছে সাংস্কৃতিক জয়ের চেষ্টা; এই অভিযানও খানিকটা সফলতার পথে। অন্যদিকে, ইংরেজ-শাসন ভারতকে অদ্যাপি রাখতে দিয়েছে তার নিজস্ব এবং নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থা; তাকে করে তুলেছে আত্মসচেতন এবং এ পর্যন্ত—নিজের শক্তির পরিচয় না জানা পর্যন্ত—এটিই এক সর্বধ্বংসী সর্বপ্লাবী উত্তাল জলধির কবল থেকে তার সভ্যতাকে রক্ষা

করেছে।* এবার সময় হয়েছে তার আবার নিজেকে ফিরে পাবার, নিজের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে বিদেশীর হামলা থেকে রক্ষা করবার, নিজের মুক্তি এবং সারা মানবজাতির একান্ত কল্যাণের জন্য নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র, নূল নীতি এবং স্বকীয় নানা অনুষ্ঠান বজায় রাখবার।

কিন্তু প্রশ্ন অনেক উঠতে পারে,—প্রধানত, এরকম আত্মরক্ষার ও আক্রমণের ভাবটাই ঠিক কিনা, বিলন সৌমনস্য আদান-প্রদান ভবিষ্যতে মানব-উন্নতির পক্ষে আমাদের উপযোগী মনোবৃত্তি কি না। একতাবদ্ধ বিশ্ব-সংস্কৃতিই ভবিষ্যতের প্রসারিত সরণী নয় কি? একটা অত্যুগ্র আধ্যাত্মিক কিম্বা অতিমাত্র ক্ষণিক সত্যতাই কি মানব প্রগতি অথবা মানুষী সম্পূর্ণতার শর্ত? চিৎ মন দেহ—এদের একটা সুসঙ্গতিতে ধরবার প্রকৃষ্টতর পথ হল সন্তোষজনক ও ন্যায়সঙ্গত মিলনের পথ। তারপর আরো প্রশ্ন, অস্ত্রশস্ত্রের মতো ভারতীয় সংস্কৃতির নানা বাহ্যরূপও কি অক্ষত রাখতে হবে? এসব জিজ্ঞাসার উত্তর পাব লেখকের এই ক্রমিক সূত্রের মধ্যে—মানবজাতি ক্রমেই অধ্যাত্মের পথে এগিয়ে চলেছে, তার প্রয়োজন তিনটি স্তরের পারম্পর্য অতিক্রম করে ওঠা।

প্রথম স্তর হল দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার যুগ—অতীতে তার যেমন আধিপত্য, মানুষের বর্তমানেও তার চেয়ে খুব বেশি কম নয়। কারণ প্রত্যক্ষ প্রকট দ্বন্দ্বের রূঢ় চেহারা ঢাকা পড়লেও দ্বন্দ্বটি থেকেই যায় এবং প্রধান হয়ে সামনে ওঠে সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় ধাপে ঐকতানের যুগ। তৃতীয় ও শেষ স্তরে প্রস্ফুট স্বার্থত্যাগের ভাব—যেহেতু বহু সেখানে গ্রাহ্য একের অচ্ছেদ্য অংশ রূপে—সেখানে এক পরহিতার্থে উদার দাতা। সাধারণের জন্য দ্বিতীয় যুগ এখনো আরম্ভ হয়নি বলা চলে; তৃতীয় তো অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। ব্যক্তিহিসাবে একক মানুষ উচ্চতর স্তরে উঠেছে: সিদ্ধ সন্ন্যাসী, মুক্ত মানুষ, ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠ জীবন্মুক্ত সব জীবকে জানে আপনার বলে—আত্মরক্ষা আর আক্রমণ তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তাঁর দৃষ্টির বিধানে দ্বন্দ্বের স্থান নেই; ত্যাগ আর আত্মদান তাঁর কর্মের সর্বসূত্র। তবে এই স্তরে কেউ এসে পৌঁছায় নি, এবং কোনো নিয়ম বা ধর্ম অনিচ্ছায়, অজ্ঞতায় অথবা স্বধর্মের বিপরীত হিসাবে পালন করতে গেলে করা হয় ব্যভিচার, তার অর্থ আত্মবিনষ্টি। নিজেকে নিহত হতে দেওয়া—নেকড়ের আক্রমণে ভেড়ার মতো—এতে সমৃদ্ধি আনে না, উন্নতি ঘটায় না, দেয় না কোনো নিশ্চিত আধ্যাত্মিক যোগ্যতা। সমাবেশ বা একতা হয়ত আসবে অদূরে একদিন, কিন্তু তার অর্থ হওয়া চাই ভিতরে অন্তঃসলিলা ঐক্যের উপর বাহিরে অবাধ বৈচিত্র্য, একের দ্বারা অন্যের গ্রাস নয়, একটা বারোয়ারি

---

* এই মত আর নিঃসংশয়ে সমর্থন করা যায় না। ইংরেজ-শাসন কর্মনীতি হিসাবে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে সকল প্রত্যক্ষ ও রূঢ় স্পর্শ, সকল সমস্যাকে ও দ্বন্দ্বমূলক চাপ এড়িয়ে চলেছিল, তবে ভারতীয় সমাজ-জীবনের চলিত সব কেন্দ্র ও অঙ্গকে বিজীব নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল এবং অন্যদিকে এক ধরণের ক্রমসঙ্কুচনের দ্বারা এর শক্তিকে খেলোয়াড়ি ছেড়ে দিয়েছিল—সেখানে আর আত্মপ্রসারের কোন জীবনীশক্তি থাকল না, থাকল না আত্মরক্ষার জন্য জড়তা ছাড়া অন্যতর শক্তি।

দ্রব্যবল মিশ্রণ নয়। অবশ্য এসব বৃহৎ জিনিসের জন্য দুনিয়া প্রস্তুত হবার আগে এমনটি ঘটাও অসম্ভব। যুদ্ধের অবস্থায় নিরস্ত্র হওয়া অর্থ সর্বনাশ ডেকে আনা, আর তাতে কোনো আধ্যাত্মিক কল্যাণও সাধিত হয় না।

আত্মিক আর সাময়িককে এক সুসম্পূর্ণ সমন্বয়ে গ্রথিত করে তুলতে হবে, যেহেতু আত্মার কাজ মন আর দেহ ধরেই। তবে য়ুরোপের বর্তমান আদুরে একান্ত বুদ্ধিগত কিম্বা জড়াশ্রয়ী সংস্কৃতি নিজের হৃদয়ে মৃত্যুর বীজ বহন করছে; কে না জানে সংস্কৃতির জীবন্ত উদ্দেশ্য পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনা। ভারতবর্ষ তার শাশ্বত-পিপাসার মধ্যে দিয়ে—তাই তো চির সমুর্ধ্ব ও সর্বাঙ্গ সত্য—নিজের সংস্কৃতি এবং দর্শনে এক মহামিলন ঘটিয়েছে অনন্ত আর সান্তে, এর জন্য তার আর বাহিরে খুঁজে মরবার দরকার নেই। এই একই সূত্রে এক সুসঙ্গত সংস্কৃতিতে দেহ মন আত্মার পরস্পরনির্ভর রূপটি নিরালম্ব আত্মার মতোই জরুরী; রূপ বা আকার হল আত্মারই ছন্দ। তাহলে আকারটি ভেঙে ফেলা অর্থ আত্মার প্রকাশকেই পঙ্গু করা, অন্ততপক্ষে তার সমূহ বিপত্তি ডেকে আনা। আকার বদলাতে পারে, কি বদলাবেই, কিন্তু নব রূপ হওয়া চাই নূতন আত্মপ্রকাশ অথবা ভিতর থেকে অভিনব আত্মসৃজনা; আত্মার বৈশিষ্ট্য বয়ে আনবে সে, পরপ্রকৃতির রূপ অনুকরণ করবে না পরভূত্যের মতো।

প্রয়োজনের এই সংকটমুহূর্তে ভারতবর্ষ তাহলে কোথায় দাঁড়িয়ে, কতখানিই বা বলা যায় সে রয়েছে তার শাশ্বত প্রতিষ্ঠার উপরে এখনো নিবিষ্টে আসীন? ইতিমধ্যে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির দ্বারা সংক্রামিত সে, আর বিপদ পার হয়েও যায়নি আদৌ; বরং অদূর ভবিষ্যতে তা আরো প্রবল আরো দুর্বার আরো দুর্নিবার্যভাবে দুর্দম হয়ে উঠবে। এশিয়া আবার উঠছে; এই পুনরুত্থানই তীব্রতর করবে, বস্তুত ইতিমধ্যেই তীব্রতর করে তুলেছে, প্রতিযোগিতার নিয়মানুসারে এশিয়াকে আত্মস্থ করবার জন্য য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বাভাবিক এবং সঙ্গত প্রয়াস। তার সংস্কৃতি পরিবর্তিত এবং বিজীত হলেই বিশ্বের বস্তুতান্ত্রিক আসরে সে মূল্য পাবে, তখন এশিয়ার আদর্শ দিয়ে য়ুরোপ গ্রাসের বিপদ দূর হল। এটি রাজনীতিক সমস্যা দিয়ে জটিল একটি সাংস্কৃতিক কলহ। এশিয়াকে হতেই হবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এক প্রদেশ, রাজনীতি-ক্ষেত্রে য়ুরোপ-মেলার যদি বা না-ই হয় অন্তত য়ুরোপীভাবাপন্নের এক অংশ: নতুবা য়ুরোপই সংস্কৃতিক্ষেত্রে এশিয়ার এক প্রদেশ হয়ে পড়তে পারে, নূতন বিশ্বব্যবস্থায় সমৃদ্ধ বিরাট প্রবল এশিয়ার দেশগুলির প্রভাবে এশীয়-ভাবাপন্ন হয়ে যেতে পারে। নিঃ আর্চারের উদ্দেশ্য স্পষ্টত রাজনীতিক। তাঁর আদ্যোপান্ত গানের ধুয়া হল—বিশ্বের পুনর্গঠন হওয়া চাই যুক্তিবাদী জড়বাদী য়ুরোপীয় সভ্যতার রূপরেখা ও ভাবরেখা নির্ভর করে। তাঁর যুক্তিমতে ভারত যদি তার আপন সংস্কৃতি ধরে থাকে, যদি নিজস্ব আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিকে বরেণ্য বলে গ্রহণ করে, যদি রূপায়ণের আধ্যাত্মিক সূত্রটি একান্তগ্রাহ্য হিসাবে নেয় তাহলে এই সুন্দর জ্যোতির্ময় বুদ্ধিবাদী ভবনে সে হবে এক কুৎসিত

"কুলাঙ্গার", জীবন্ত মৃত্যু। হয় তাকে সর্বাঙ্গে হয়ে উঠতে হবে সাহেব যুক্তিসার জড়বাদী এবং স্বাধীনতা সে পাবে এই পরিবর্তনের পরে নতুবা পরাধীন হয়ে থাকতেই হবে তাকে এবং সংস্কৃতিবান বড়কর্তাদের অধীনে তার ত্রিশ কোটি ধর্মান্ধ বর্বর লোককে চেপে দাবিয়ে রাখতে হবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দেবার দায় নেবে খৃষ্টিয়-নাস্তিক য়ুরোপীয় মহানুভব রক্ষীপ্রহরী এবং মাষ্টারের দল। বলবার ভাষাটা একটু রূঢ় কিন্তু ব্যাপারটির আসল সত্য নিহিত এরই মধ্যে। এই আক্রমণের বিরুদ্ধে—আক্রমণ সাধিক নয়, যেহেতু ভারতীয় সংস্কৃতির সবজ-দারি এবং কদর আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে—ভারত জেগে উঠেছে এবং আত্মরক্ষায় তৎপর, তবে যথোচিত মাত্রায় এবং পূর্ণোদ্যমে নয়, যে স্বচ্ছদৃষ্টি এবং দৃঢ়সংকল্প বিপদ থেকে তাকে বাঁচাতে পারে তা সহযোগে নয়। আজ সময় আসন্ন বেছে নিতে হবে তাকে,—এ-নির্বাচন এড়াবার উপায় নেই,—হয় জীবন নয় মৃত্যু।

এ-সাবধানবাণী অবহেলা করা যায় না; য়ুরোপীয় প্রচারক এবং রাষ্ট্রবিদ্‌দের হাল আমলের কথাবার্তা, ভারতের বিরুদ্ধে আজকালকার বই এবং নানা রচনা পাশ্চাত্যদেশে জনসাধারণের কাছে যে উল্লসিত সাদর পেয়েছে তা এই বিপদেরই ইঙ্গিতবাহক। এখন একটা বিরাট পরিবর্তনের মুখে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মানুষের সাংস্কৃতিক প্রবৃত্তি থেকেই অনিবার্যভাবে এর উদ্ভব। বইটিতে লেখক যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা সবই দেখবার প্রয়োজন নেই। তাঁর মধ্যযুগীয় য়ুরোপ-সভ্যতার প্রশস্তিও সর্বাংশে আমি গ্রহণ করতে পারছি না। এর আকর্ষণ, এর শিল্প-সন্নিবেশের মাধুর্য, এর গভীর এবং আন্তরিক আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তিতে অনেকখানি মালিন্য ঢেলেছে এর অজ্ঞতা ও গোড়ামির এক মস্ত প্রবাহ, এর নিজের পরমত-অসহিষ্ণুতা, এর অসহ্য প্রাণান্তিক টিউটনীয় কঠোরতা, নৃশংসতা, হিংস্রতা এবং ক্রূরতা। আমার মনে হয়েছে তিনি পরবর্তীকালের য়ুরোপীয় সংস্কৃতির উপর যে আক্রমণ চালিয়েছেন তা একটু মাত্রাতিরিক্ত। এই মুখ্যত অর্থাগ্রয়ী সভ্যতা লাভজনক জড়বাদের আসন পেতে দিয়ে বেশ কৃপ্রীই হয়ে পড়েছে, এর অনুকরণ করলে আমরা ভুল করব; তথাপি একে তুলে ধরেছে যে কয়েকটি মহত্তর আদর্শ মানবহিতার্থে তাদের দাম অনেক। অবশ্য এগুলিও এদের বাস্তব অবয়বে বেশ অমার্জিত এবং অসংস্কৃত, ভারতীয় মনের কাছে সর্বতোভাবে গ্রাহ্য হতে হলে এদের ধারণ করতে হবে এক আধ্যাত্মিক অর্থ। আরো মনে হয় যে, ভারতীয় পুনর্জাগরণের তাৎপর্যবোধে লেখকের কিছু দৈন্য আছে। আমি বলছি না তার আত্মসামর্থ্য—সেখানে ঘাটতি তো আছেই—তবে তার ধারার অনিবার্যতা, তার আধ্যাত্মিক ও অন্তর্নিহিত শক্তি অভ্রান্ত। তিনি বেশি ফলাও করেছেন সেই সাহেবপূজক ভারতীয়দের যারা এই কদাকার ভাবের বাগাড়ম্বর প্রতিধ্বনি করে বলে —"য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলিই ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার আদর্শ।" যে-দলে এই বাক্য-বাগীশ সেই অতকীয়রাণ দলে ছাড়া কথাটির এখন একটি মাত্র ক্ষেত্রে—রাজনীতিক ক্ষেত্রে —কিছু মানমর্যাদা; স্বীকার করি, ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রটি গুরুত্বপূর্ণ এবং দারুণ বিপত্তির বান

ডেকে আনতে পারে। তবে এখানেও মনোভাবে গভীর পরিবর্তনের একটা লক্ষণ ফুটে উঠেছে—যদিও পূর্ণবিজয় লাভ করতে তার দেরী আছে, এবং রণং দেহি ভাবে মাথানুখো শ্রমিক রাশিয়ার নেতৃত্বে উগ্র প্রখর য়ুরোপীয়ানার এদিকে অভিযানের সঙ্গে মোকাবিলা বাকি। আবার আমাদের লেখকটি য়ুরোপে ও আমেরিকায় ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রবেশের উপর গুরুত্ব দিতে চান না,—এটিই তবু য়ুরোপীয় অভিযানের বিরুদ্ধে ভারতের স্বকীয় যোগ্য প্রত্যুত্তর। এইভাবে দেখলে সমস্ত প্রশ্নটির চেহারা বদলে যায়।

সার জন উডরফ আমাদের সামনে এক সবল আত্মরক্ষার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে আজকালকার যুদ্ধে নিছক আত্মরক্ষা শুধুই পরাজয় এনে দেয়, আর যুদ্ধই যদি করতে হয় তবে মোক্ষম রণকৌশল হবে সবল, জীবন্ত এবং সচল স্বরক্ষার ভিত্তিতে সতেজ আক্রমণ; এই আক্রমণাত্মক শক্তিই স্বরক্ষাকে কার্যকরী করে তুলতে পারে। একদল ভারতীয় এখনো কেন সর্বক্ষেত্রে য়ুরোপীয় সংস্কৃতি দ্বারা মোহগ্রস্ত, আমরা সকলে এখনো কেন রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রভাবে আচ্ছন্ন? কারণ বরাবর দেখা গেছে য়ুরোপের দিকে ক্ষমতা, সৃজনশক্তি, কর্মতৎপরতা, আর ভারতের দিকে চরম আলস্য কিম্বা অক্ষম অচল স্বরক্ষার দুর্বলতা। কিন্তু যেখানেই ভারতের অন্তঃশক্তি নিজেকে সবলে তুলে ধরেছে, সতেজে আক্রমণ এবং সোৎসাহে সৃষ্টি করতে পেরেছে সেখানেই তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় মৌলুসের মোহ কমতে শুরু করেছে। প্রথমকার সেই য়ুরোপীয় ধর্মাক্রমণের দারুণ ভার এখন আর নেই, কারণ হিন্দু পুনরুত্থানের নানা সৃজনাত্মক কর্ম হিন্দুধর্মকে একটা জীবন্ত, ক্রমবর্ধনশীল, সুদৃঢ়, জয়ী ও সপ্রতিভ শক্তিতে পরিণত করেছে। একালে অমর স্বাক্ষর রাখল দুটি জিনিস—থিওসফিক্যাল আন্দোলন এবং চিকাগোয় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। এদুটি দেখিয়েছে কোন সব আধ্যাত্মিক ভাব আদর্শের বিগ্রহ ভারত,—আত্মরক্ষারত নয়, বরং আক্রমণাত্মক যে ভারত পাশ্চাত্যের জড়সেবী মনে রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। ইংরেজী শিক্ষা এবং প্রভাব তার রূপবোধের ভাবনা দিয়ে গোটা ভারতবর্ষকে একদা সাহেবীয়ানা ও নিম্নরুচিতে টেনে নামিয়েছিল, তার শেষ সূচিত হল এক অকস্মাৎ প্রদীপ্ত প্রভাতে যখন বাংলার চারু শিল্পীদলের প্রতিভারশ্মি দেখা গেল টোকিওতে, লণ্ডনে, প্যারিসে। এই বিশেষ সাংস্কৃতিক ঘটনা ইতিমধ্যেই দেশের রূপবোধে একটা বিপ্লব এনেছে—তা অবশ্য পূর্ণতায় পৌঁছে নি, তবে অনিবার্য ও নিশ্চিত তার ভবিষ্যৎ। অন্য ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। রাজনীতির রাজ্যে স্বদেশী আন্দোলনে চরমপন্থীদলের মূলনীতির নিহিতার্থেও তাই এ আন্দোলন চেয়েছিল পূর্বেকার ধারণা যে রাজনীতিক সৃষ্টি এখানে কিছু সম্ভব মাত্র য়ুরোপের ধরণে, তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে। সাময়িকভাবে এ যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে—নিজের অনুপ্রেরণায় কোনো ত্রুটিতে নয়, বিরুদ্ধ-শক্তির পাকেচক্রে এবং অতীত অবনতিজনিত দুর্বলতার জন্য—এর প্রারম্ভিক সৃজনোদ্যম যদি বিপর্যস্ত নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়ে থাকে, হারিয়ে ফেলে থাকে আদি স্বর্গ, তাহলেও এ পথনির্দেশক সঙ্কেতরূপে দাঁড়িয়ে থাকবে। অনুকূল অবস্থায় প্রশস্ততর অবকাশের আশ্রয়ে এ প্রচেষ্টা

আবার একদিন শুরু হবেই। যতদিন তা না হচ্ছে, সাফল্য না আসছে, ভারতাত্মার সম্মুখে বিপদের শেষ নেই রাজনীতিক য়ুরোপীকরণের পরে দেখা দেবে একই প্রথায় সমাজগ্রাস —যার পরিণতি সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মৃত্যু। আক্রমণ সফল করে তোলা চাই, স্বজনধর্মী করা চাই, তবেই আত্মরক্ষা হতে পারে ফলপ্রসূ।

এই প্রশ্নকে দিতে হবে বৃহত্তর বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব, তবেই এর যথার্থ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারব। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ প্রতিযোগিতার নীতি এখনো বলবৎ এবং আরো বেশ কিছুকাল আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করবে ; অদূর ভবিষ্যতে মানুষের অসম্ভাব্য কপালগুণে যুদ্ধ যদিই বা লোপ পেয়ে যায়, তবু সংঘর্ষ দেখা দেবে আর এক রূপ নিয়ে। এই সঙ্গে আজকের জগতে সর্বদেশের মানুষের একটা বর্ধিষ্ণু পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা এক বিশেষ ব্যাপার। যুদ্ধই একে প্রকট করে দেখিয়েছে ; যুদ্ধান্ত এর সম্ভাবনা সব ও বাধাবিপত্তির রাশি এনে ধরল। একে প্রকৃত সম্মিলন বলা যায় না, সত্তাকার একত্ব তো বলা চলেই না,—বলা যায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং আধুনিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা জোর করে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে একটা বাধ্যতামূলক স্থূল ঐক্য। তবে এই স্থূল ঐক্যের ফল ফলবে মনে সংস্কৃতিতে এবং অন্তরবৃত্তিতেও। প্রথম প্রথম কমানোর পরিবর্তে অনেক দিকে বাড়িয়ে তুলবে সংঘর্ষ, নানা রকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব তীব্রতর করে দেবে, একটা সাংস্কৃতিক সংঘর্ষও ত্বরান্বিত হবে। পরিণামে আসবে হয়ত এক সর্বগ্রাসী ঐক্যবন্ধন এবং সমরলিপ্সু য়ুরোপার এক সভ্যতার হাতে অন্য সকল সভ্যতার মৃত্যু। এখনই বলা যায় না এ-সভ্যতা বুর্জোয়া অর্থকরী, শ্রমিক জড়বাদী কিম্বা যুক্তিসার বুদ্ধিবাদী হবে, তবে আপাতত এদেরই যে কোনো একটির সম্ভাবনা সম্মুখে। অন্যথা, আসতে পারে একটা অন্তঃপ্রবাহী ঐক্যের উপর স্বেচ্ছাবৃত সম্মিলন। কিন্তু যে আদর্শ চায় প্রত্যেক দেশ একান্ত বিচ্ছিন্ন থেকে নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতির সমৃদ্ধি এবং অন্য ভাবধারার সংস্পর্শ ত্যাগ—এ-আদর্শ কিছুকাল থেকে চালু এবং জোরালো হয়ে উঠেছে বটে—তার সাফল্যের তেমন আশা নেই। তা যদি থাকে তাহলে প্রকৃতির অন্তরে ঐক্যের জন্য প্রস্তুতির গোটা উদ্দেশ্যটিই ধূলিসাৎ হয়ে যায়, এটি খুব সম্ভব না হলেও একেবারে অসম্ভব দুর্বিপাক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। য়ুরোপ দুনিয়ার রাজা এবং স্বভাবতই কল্পনা করা যায় সামনে একটি য়ুরোপী জগৎ—সেখানে এমন একটু আধটু খিটিমিটি চলে যা আমল দেওয়া যায় এক য়ুরোপী গোষ্ঠির মধ্যে যারা নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করছে বিজ্ঞানের ধারা এবং জড়জীবন সংগঠন। এই সম্ভাবনার উপর এসে পড়েছে ভারতের ছায়া।

স্যার জন উড্রফ অধ্যাপক লোজ ডিকিনসনের সূত্র আবৃত্তি করেছেন—এশিয়া ও য়ুরোপের মধ্যে বিরোধ ততো নয় যতো ভারত এবং বিশ্বের মধ্যে। কথাটার মধ্যে সত্য আছে ; কিন্তু য়ুরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিরোধও অলীক ব্যাপার নয়। আধ্যাত্মিকতা ভারতের একচেটিয়া নয় ; যতোই তা খাক বুদ্ধির কচকচির নীচে চাপা কিম্বা অন্য পর্দার আড়ালে ঢাকা, এ সম্পত্তি সকল মানুষের। তবে পার্থক্য এই—এক ক্ষেত্রে

আধ্যাত্মিকতা হয়েছে আন্তর ও বাহ্য জীবনে প্রধান প্রবৃত্তি ও নিয়ন্ত্রণশক্তি ; অন্যত্র নিন্দিষ্ট, ভণ্ডামিরূপে পরিচিত, গৌণ হীনবৃত্তি বলে গৃহীত, অস্বীকৃত কিম্বা প্রত্যাঘাত, তার পরিবর্তে বৃত বুদ্ধি অথবা এক তীব্র জড়বাদী প্রাণচর্যা। প্রথম ধারা হল সকল সভ্য দেশে একদা সর্বত্রদৃষ্ট প্রাচীন প্রজ্ঞার ধারা—যথার্থই চীন থেকে পেরু সর্বত্র। তবে সব দেশই ক্রমে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং হারিয়েছে তার বিস্তৃত প্রভাব, কিম্বা য়ুরোপের মতো তা থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হয়ে উঠেছে। নয়ত এশিয়ার মতো তারা প্রাচীন আদর্শ ত্যাগ করে অর্থকরী, বাণিজ্যসার, যন্ত্রনির্ভর, বুদ্ধিনির্ভর, কার্যকরী আধুনিক আদর্শ গ্রহণে উদ্যত। অন্তরের আলো ও বীর্যে যতোই ভাঁটা পড়ুক তা সত্ত্বেও ভারতই আধ্যাত্মিক আদর্শের মূল লক্ষ্য হারায়নি। এ-বিষয়ে ভারতই বেয়াড়া রকমের গোঁড়া তার বিরুদ্ধ-সমালোচকরা তো বলছেন যে তুরস্ক চীন জাপান এই বোকামি কাটিয়ে উঠেছে—অর্থাৎ এরা বেশ যুক্তি-সিদ্ধ জড়বাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে কি ছোটখাট দল হিসাবে ছাড়া দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ তার উপাস্য দেবতাকে ত্যাগ করতে রাজী নয়, পশ্চিমের সৌভাগ্যবান অন্যত্র পূজিত দারুণ যুক্তিদেবতা বাণিজ্যদেবতা ও অর্থদেবতার কাছে নত হতে বিরূপ। ছোঁয়াচ লেগেছে তার গায়ে কিন্তু পরাজয় মানেনি। অক্ষত গভীর বিবেকের উপরে, বহির্মানসটি তার পশ্চিমী ভাব কিছু কিছু নিতে বাধ্য হয়েছে—মুক্তি, সমতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি এবং নিজস্ব বৈদান্তিক সত্যের সঙ্গে তাদের মিশিয়ে দিতে হয়েছে ; কিন্তু ঐ পশ্চিমী ভাব পশ্চিমী আকারে নিয়ে সে স্বস্তি পায় না, তাই নিরন্তর তার প্রয়াস তাদের ভারতীয় আকার দিতে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক রূপায়ণ দিতে। ইংরেজী ভাব ও সংস্কৃতি অনুকরণ করবার দিকে প্রয়াসের প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গিয়েছে ; কিন্তু তার পরিবর্তে আর একটি সম্প্রতি দেখা দিয়েছে সাধারণভাবে কন্টিনেন্টাল য়ুরোপী সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী রাশিয়ার কঠিন কঠোর ধারাটির অনুকরণস্পৃহা। আর এক দিকে দেখা দিয়েছে প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, আধ্যাত্মিক জাগৃতির এবং তার অর্থপূর্ণ আন্দোলনের বিপুল বিস্তার। এই দ্বিবিধ সম্ভাবনার একটিই সফল হতে পারে। হয় ভারতবর্ষ যুক্তিবাদ ও যন্ত্রবাদের পথে সম্পূর্ণ বদলে ফেলবে নিজেকে এবং ভারতবর্ষও আর থাকবে না, কিম্বা এক নূতন বিশ্ব-সূচনার নেতা হয়ে দাঁড়াবে, আপন দৃষ্টান্ত ও সাংস্কৃতিক সংক্রমণ দ্বারা পাশ্চাত্যের নূতন প্রবণতাদের সাহায্য করবে এবং মানবজাতিকে আধ্যাত্মিকতায় দীক্ষা দেবে। এই প্রশ্নই জীবন-মরণের প্রশ্ন। যে আধ্যাত্মিকতার প্রতীক ও প্রতিনিধি ভারতবর্ষ তা য়ুরোপের সম্মুখে টিকবে কি না, পাশ্চাত্যের অনুকূল নূতন আকার আয়তন গড়ে তুলতে পারবে কি না ; অথবা য়ুরোপের যুক্তিবাদ ও বৈশ্যবৃত্তি ভারতীয় সংস্কৃতিকে চিরদিনের মতো ডুবিয়ে দেবে,—জিজ্ঞাস্য এই।

এখন তাহলে প্রশ্ন নয় ভারত সত্য কি অসত্য, প্রশ্ন—যে-প্রেরণা তার সভ্যতার প্রাণ সেটি না প্রাচীন য়ুরোপী বুদ্ধিমত্তা কিম্বা নব-য়ুরোপীয় জড়বাদী প্রবৃত্তি নায়ক হবে মানব-সংস্কৃতির ? দেহ-মন-চিত্তের সৌমনস্য যে আসন পেতেছে যুক্তিসিদ্ধ কিম্বা অক্ষম আধ্যাত্মিক

খদ্যোতলোকস্থাত আমাদের জড় প্রকৃতির স্থূল নিয়মের উপর সে না সর্বজয়ী আত্মশক্তি করবে নেতৃত্ব, নিম্নতর দেহ মন বুদ্ধির শক্তিকে চালিয়ে নেবে বৃহত্তর সৌষম্যের দিকে, এক সর্বজয়ী চিরবর্ধিষ্ণু সমতার মধ্যে। ভারতকে আত্মরক্ষা করতেই হবে—তার সাংস্কৃতিক আয়তন সব নূতন রূপে ফেলে গড়ে আর প্রাচীন আদর্শে সতেজে নিষ্ঠাভরে নির্দোষভাবে প্রকট করে। তার সকল আত্মপূর্তা চিত্তপ্রসারের সর্বব্যাপী জ্যোতির্বলয় দিকে দিকে নিয়ে ছড়িয়ে দেবে—এ বিশ্ব তারই একদিন ছিল, সুদূর অতীতে তারই আলোয় ছিল ভাস্বর। সাময়িকভাবে সংঘর্ষের স্থান হতে পারে, বিরুদ্ধ সংস্কৃতির আক্রমণ যতকাল রয়েছে ততদিন। কিন্তু যেহেতু তা হবে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষাসম্মত সেরা সম্পদের সহায় তাই তার পরিণতি উর্ধ্বতর এক স্তরে মিলনের সূত্রপাত এবং ঐক্যের প্রস্তুতি।

[redacted]

কবিতার তাৎপর্য*

শ্রীঅরবিন্দ

কাব্যসাধনার অতীত ও ভবিষ্যৎ যথার্থভাবে অনুধাবন করতে গেলে যে নির্দিষ্ট সূত্র ধরে এগোবার প্রয়োজন, তার খাতিরে কবিতার আত্মা থেকে কী পরম শক্তি আমরা আশা করি, সে অনুসন্ধান অসঙ্গত হবে না। বক্তব্যকে আরো প্রাঞ্জল করলে প্রশ্ন দাঁড়ায়—কবিতার স্বভাবধর্ম কী, কী তার রীতিপদ্ধতি এবং কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় কবিতাকে real বা চূড়ান্ত সত্যের যন্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। একথা স্বীকার্য যে "কাব্যের প্রাণস্পন্দ"-এর মত একটা গভীর ব্যাপক এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়কে কোন একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় ধরে রাখার প্রচেষ্টা প্রায় অসম্ভব এবং কাব্যসরস্বতীর বহুতন্ত্রী বীণাকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ভেঙে টুকরো করে দেখার মধ্যে রসবোধের স্বল্পতাই প্রকট হয়ে উঠে। তবুও কাব্য-নিহিত পরমাশক্তির অনুসন্ধানের পথে বিশেষ কয়েকটি বোধ ও বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না এবং সেই বোধ ও বিশ্বাসের সাহায্যে কাব্যের স্বভাবধর্মের আলোচনা নেহাত অসম্ভব ও অসার্থক হবে না।

এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রায়ই দুটি ভুলের সম্মুখীন হতে হয়—একটা ভুল তাঁরাই করেন যাঁদের কাব্যবোধ পাকা হয়নি, এবং অন্যটি বিশেষকরে বোদ্ধা সমালোচক এবং অতিমাত্রায় সচেতন শিল্পীর মধ্যেই দেখা যায়। সাধারণ পাঠক যিনি কবিতার রসসত্তা অনুধাবন না করেই তার বিচার করেন, তাঁর কাছে কবিতা কল্পনার লীলা বা বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তি বা কর্ণসুখ ছাড়া আর কিছুই নয়—কাব্যপাঠ তাঁর কাছে অবসর বিনোদনের একটা উচ্চস্তর মাধ্যম মাত্র। তাই যদি হতো তবে এতকাল ধরে কবিতার প্রাণসত্য, তার গভীর তাৎপর্য এবং তার রীতি প্রযুক্তির আলোচনায় সময়ের অপব্যবহার করা হতো না। তা হ'লে একটি চমৎকার ভাবসম্বলিত যা কিছু সুদর্শন বা মনোরম বা মধুর তাই আমাদের প্রয়োজন মেটাতো। সে ক্ষেত্রে অ্যানাক্রেয়ন-এর একটা সংগীত অথবা রিমনেরমাস্-এর একটি আস্তি এডি-পাস, আগামেমনন অথবা ওডেসি-র সমপর্যায়ের হয়ে দাঁড়াবে, কারণ রমণীয়তার দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে তারা তাদের অগভীর অথচ মনোরম ঐক্য ও সংহতির

---

* শ্রীঅরবিন্দের The Future Poetry গ্রন্থের 'The Essence of Poetry' পরিচ্ছেদের অনুবাদ। অনুবাদক—সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সাহায্য আমাদের মনোভাবেই অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক বেশীই চমৎকৃত করেছে। অন্য সমস্ত শিল্পের মত কাব্যেও মনোহারিতা আমরা আশা অবশ্যই করি, কিন্তু একথা স্মরণীয় যে বহিরিন্দ্রিয়ের এমন কি অন্তঃস্থ কল্পনাবৃত্তির তৃপ্তি কাব্যের রসাস্বাদনের প্রথম স্তর মাত্র। বুদ্ধি কল্পনা ও ইন্দ্রিয়ের উচ্চগামী দাবীকে মেটাবার জন্য এই "মনোহারিতা"কে শুধুমাত্র পরিশীলিত হলেই চলবে না, ইন্দ্রিয়গত এবং কল্পনাগত এই মনোহারিতাকে ভাবের তুঙ্গে লাভ করতে হবে।

এর কারণ হচ্ছে এই যে বুদ্ধি, কল্পনা অথবা বহিরিন্দ্রিয় যেমন কবিতার যথার্থ উৎস নয়, তেমনি কাব্যানন্দের যথার্থ বোদ্ধাও এরা নয়। এ সব হলো শুধুমাত্র মাধ্যম বা উপকরণ। কবিতার আসল স্রষ্টা যেমন আত্মা, কাব্যানন্দের পরিপূর্ণ উপলব্ধিও আত্মানির্ভর। ওই সব উপকরণ যতো সহজে এবং স্বচ্ছভাবে কাব্যানন্দকে বিচ্ছুরিত করে, ততই তাদের আপেক্ষিক প্রয়োজন সার্থক হয় এবং বক্তব্য যতো নিবিড়ভাবে আত্মার সান্নীপ্য লাভ করে, কাব্য ততোই মহৎ হয়ে ওঠে। অতএব একথা স্বীকার্য্য যে কবিতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার মাধ্যম বা উপকরণজাত তৃপ্তিকে উচ্চগ্রামে নিয়ে এসে তাকে আত্মার আনন্দে রূপান্তরিত করতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কবিতা তার স্বধর্ম্মপালন করেনি। একটি স্বর্গীয় আনন্দ, সৃষ্টি-ধর্ম্মী স্বতঃপ্রকাশ এবং ব্যাপক গভীর আনন্দ বিশ্বের ছন্দায়িত রূপের মধ্যে অপ্রাকৃত সত্যকে বিভাসিত করার সময় বিশ্বাত্মা যে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে তার সর্ব্বাত্মক প্রাণশক্তিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল সেই স্বর্গীয় আনন্দই কবির আত্মাকে আলোড়িত করে এবং প্রকৃত বাধাকে অতিক্রম করে কবি সেই আনন্দেই সহৃদয় রসিকের রসাকাঙ্ক্ষাকে পরিস্নাত করেন। তাই আনন্দ উচ্চাঙ্গের অবসর যাপন মাত্র নয়। এ হলো একটা উদ্ভাসন এবং ক্রিয়াশীল শক্তি। সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ এবং বুদ্ধিসর্ব্বস্ব শিল্পীসম্প্রদায় অবশ্য বলে থাকেন যে কবিতার প্রাণই হলো ত্রুটিবিহীন সুনিবদ্ধ একটি রীতি বা technique। একথা সত্যি যে সব শিল্পেই সার্থকতার প্রথম উপকরণ হলো একটা সুঠাম রীতি। কিন্তু যথার্থ কাব্যাখ্যা লাভের পথে এ জাতীয় উপকরণের পরিমাণ এত বেশী এবং এদের গুরুত্ব এতো আপেক্ষিক যে রীতিগত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও প্রতিভাসম্পন্ন কবি এমন বহৎ কাব্য রচনা করতে পারেন যার প্রভাব যুগাতিগ, তাছাড়া রীতি বা আঙ্গিক যতোই আবশ্যিক হোক না কেন অন্যান্য শিল্পের তুলনায় কবিতার ক্ষেত্রে তা হয়তো অনেক কম স্থান অধিকার করে। তার কারণ প্রথমতঃ কবিতার যা মাধ্যম সেই ছন্দোময় বাক্যে সূক্ষ্ম বস্তু এবং তা ছাপিয়ে যাওয়াই বেশী; এবং দ্বিতীয়তঃ শিল্পস্রষ্টার আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে কবিতাই সর্ব্বাপেক্ষা জটিল, নমনীয় এবং বহুধা ইংগিতপূর্ণ হওয়ার ফলে অন্য যে কোন শিল্পকার্য্যের তুলনায় কবিতারই বিভিন্ন দিকে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। ছন্দোময়-বাক্যে যেমন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদান "ধ্বনি সম্পদ" রয়েছে, তেমনি রয়েছে অতীন্দ্রিয় উপাদান "ভাব"-সম্পদ, এবং এই ধ্বনি ও ভাবের মধ্যে আবার একত্রে ও যুগ্মভাবে রয়েছে

"আত্মা" সম্পদ বা নির্বাধ আধ্যাত্মিক এক শক্তি যা হলো কবিতার প্রাণ। যদিও এই "আত্মা" সম্পদ সৃষ্টির জন্য কবিতার প্রথমিক ধাপে technique বা রীতির নিয়মাবলী কিছু মেনে চলতে হয়, কিন্তু প্রায় সেই প্রাথমিক স্তরেই ধ্বনি ও ভাবের অন্তঃস্থ আত্মার প্রবর্তনায় কাব্য যান্ত্রিক কারুকৃতির সব গণ্ডী অতিক্রম করে।

আসলে এই আত্মাই কাব্যের বহিরঙ্গ নির্দ্ধারিত করে। যিনি যথার্থ কবি, রসসৃষ্টির জন্য শিল্পের গঠনপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর অতিমাত্রায় সচেতনতার কোন প্রয়োজন হয় না। technique বা আঙ্গিকের প্রয়োজন অবশ্য আছে, কিন্তু সৃষ্টির উত্তেজনায় তার বোধ গৌণ হয়ে যায় এবং সৃষ্টিকর্ম্মের সমুন্নত মুহূর্ত্তগুলিতে প্রয়োগ-চিন্তা কবি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে পারেন। কারণ, তখন তাঁর কাব্যধ্বনি এবং শিল্পন প্রয়াস তার আত্মারই স্বতঃস্ফূর্ত উপাচার-রূপে দেখা দেয়। এই আত্মার প্রকাশ হয় অনুপ্রাণিত ছন্দস্পন্দে, একটা দ্যোতনাময় ধ্বনিরূপে, ঠিক যেমন বিশ্বাত্মা শব্দের অমিতশক্তি এবং আপন চিরন্তনত্বের সাহায্যে বিশ্ববিস্তারী ঐকতান সৃষ্টি করছেন এবং তার ফলে বহিরাঙ্গিক কারুকৃতির ভার পড়ে কবির অবচেতনের উপর। আত্মার এই সমুন্নত বাণীই হলো চূড়ান্ত কাব্যবাণী এতেই কবির কাব্যের অমৃতত্ব এবং এর অল্পও তার কাব্যকে বিস্মৃতির গ্লানি থেকে চিরমুক্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ—"স্বল্পম্ অপ্যস্য ধর্ম্মস্য"।

কবির ছন্দোময় বাক্যের অন্তঃস্থ এই মহতী শক্তিই তাকে মানুষের কাছে তার আত্মদর্শন অথবা ভূয়োদর্শন প্রকাশের উপযোগী সর্ব্বোত্তম বাণীর মর্য্যাদা দিয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে যা মানুষের জীবনের মহত্তম অভিজ্ঞতা, সেই বিশুদ্ধ অলৌকিকতা যাকে কখনই সম্যকভাবে প্রকাশ করা যায় না, সেও যখন প্রকাশ চায় তখন সে এমন একটি ছন্দাঙ্গ এবং বাকভংগীর আশ্রয় নেয় যা বিশিষ্টভাবে কাব্যেরই। কবিতা অবশ্য জীবনজাত সব অভিজ্ঞতার প্রকাশেই—এমনকি তা নিতান্ত বস্তুগত হলেও—এই বোধ এবং বাণীর সাহায্য নেয় এবং তারই ফলে বস্তুর বাহ্য আবরণ সরিয়ে তার অন্তঃস্থ পৃথক কোন সত্তার প্রকাশে কাব্যের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে।

এবারে কবিতার 'ছন্দোময় বাক্যের' মহনীয়তা ও গভীরত্বের প্রাথমিক উপাদানগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণ বাক্যে যে ভাষা ব্যবহার হয়—তা কেবল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনের ব্যবহারিক প্রয়োজনকেই মেটায়, এ বাক্য প্রকাশ করে সেই সব ভাব ও অনুভূতি যা আমাদের লৌকিক জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বা উপযোগী। এই প্রকার ব্যবহারের ফলে, যেমনিভাবে আমরা একটা মামুলি যন্ত্র বা কল-কব্জাকে দেখি, ঠিক তেমনিভাবেই শব্দকে আমরা ভাবের একটি প্রথাসম্মত প্রতীকরূপেই গ্রহণ করি—মনে করি, যদিও এরা জীবনের প্রয়োজন মেটায় তথাপি এরা প্রাণহীন। তাই এই শব্দের মধ্যে যখন আমরা প্রবল কোন শক্তি অর্পণ করতে চাই, তখন তা আমাদের প্রাণশক্তি থেকেই দিতে হয়। তখন কণ্ঠস্বরের বিশিষ্ট বিন্যাসের সাহায্যে, তীব্র আবেগ

বা জীবনবেগের স্পর্শ দিয়ে ঐ প্রথাসম্মত শব্দ-প্রতীকের মধ্যে একটি অপূর্ব শক্তি আমরা সৃষ্টি করতে চাই। কিন্তু ভাষার ইতিহাস এবং বিশেষ করে মানুষের বলা কথার প্রাথমিক পর্যায়গুলি যদি আমরা পর্যালোচনা করি তবে দেখবো সে চিত্র স্বতন্ত্র। তখন শব্দের যে শুধুমাত্র নিজস্ব প্রাণশক্তি ছিল তাই নয়, এ যুগের যান্ত্রিক এবং উন্নাসিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের তুলনায় যে যুগের মানুষ শব্দের এই প্রাণশক্তি সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন ছিল। সে যুগে ভাষা তার আদিম স্বভাবের প্রবর্তনায় চিত্রাপ্রসূত স্পষ্ট কোন ভাবের বাহক না হয়ে আবেগ, অনুভূতি এবং মনের অস্পষ্ট অভিজ্ঞতাই প্রকাশ করতো বেশী, এতে অবশ্য বিষয় বা ভাব সমৃদ্ধির অনেক সূক্ষ্ম ছাপ থাকতো,—সে-সব খুঁজে দেখবার আগ্রহ আজ আর আমাদের নেই। ভাষা যতোই পরিণত হতে থাকলো, ততোই তার মধ্যে পূর্বেকার গৌণ বুদ্ধিবৃত্তিটি সুস্পষ্টভাবে প্রাধান্য লাভ করলো।

ভাষার পরিণতিকালে শব্দধ্বনি যে নির্দিষ্ট একটা ভাব বা চিন্তার অভিব্যঞ্জক হয়ে দাঁড়ালো তার জন্য এ দুয়ের মধ্যে কোন স্বাভাবিক ও সহজাত সমার্থতা দায়ী নয়—কারণ কোন সমার্থতাই এদের মধ্যে নেই এবং বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে যেকোন ধ্বনি যে কোন ভাবকেই প্রকাশ করতে পারে যদি মানুষ এদের মধ্যে একটা প্রথাগত সমার্থতা স্বীকার করে নেয়। যে শব্দধ্বনি একটা বিশেষ ভাবের ব্যঞ্জনা দেয় তার মূল কারণ হলো এই যে সেই ধ্বনির মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা মানুষের প্রাণকেন্দ্রে স্পন্দন তোলে এবং সে স্পন্দন তার ইন্দ্রিয়ময় আবেগময় এবং মনোময় অস্তিত্বে ছড়িয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। "নেকড়ে বাঘ", এই শব্দটি যার উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের ধারণা আজ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের কাছে একটা প্রাণীর পরিচয় দেয় মাত্র—অন্য পরিচয় আমাদের সন্ধান করে নিতে হয়। সংস্কৃত শব্দ "বৃক", অর্থাৎ "যে ছিঁড়ে ফেলে" শেষে ঐ একই অর্থ বহন করে চলল। কিন্তু অতীতে ঐ শব্দটি মানুষের সঙ্গে নেকড়ে বাঘের যে ভয়ংকর সম্পর্ক তাই প্রকাশ করতো এবং তার কারণ 'বৃক' এই শব্দটি উচ্চারণ করলে এমন একটি গুরু গম্ভীর ধ্বনির সৃষ্টি হয় যার সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলার ভয়ংকরত্বের সহজ মিল রয়েছে। এই ধ্বনিগৌরব অতীতের ভাষাকে এমন একটা জীবন্ত শক্তি ও তেজ দিয়েছিল যা অনায়াসেই তাকে কাব্যগুণান্বিত করেছে, এবং আজকের ভাষা পরিমিতি স্বচ্ছতা এবং উপযোগিতার দিক থেকে যতোই সমৃদ্ধ হোক না কেন, অতীতের সেই জীবন্ত আবেগ যে সে অনেকটা হারিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

কবিতা অবশ্য বর্তমানে তার সেই আদি উপাদান অনেকখানি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, যদিও অন্যভাবে। তার জন্য অতীতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার পরিবর্তে কবিতায় দেখা দিয়েছে 'চিত্রকল্পের' প্রাধান্য এবং ধ্বনির ব্যঞ্জনা, তার জীবন-স্পন্দন, তার দীপ্তি এবং তার মধ্যে মানসিক আবেগ। চিত্রবৈভব এবং ধ্বনিবৈভবের সংগে মনপ্রসূত স্পষ্টগ্রাহ্য ভাববৈভবের সম্মেলন ঘটিয়ে কবিতা এই দুই বৈভবকেই

বিপুলতর করেছে। এই প্রক্রিয়ায় কবিতা তার ভাষার প্রকাশক্ষমতাকে শুধুমাত্র অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় জীবনাভিজ্ঞতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ না রেখে মহত্তর ও বৃহত্তর অভিজ্ঞতা বর্ণনার উপযোগী করে তুলেছে। তার প্রমাণ, কাব্যবাণীর এই নবলব্ধশক্তি অন্য সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গেই শব্দধ্বনির অন্তরস্থ "আত্ম-ব্যঞ্জনা" তার রসসত্তাকেও প্রকাশ করে। এবং তারই ফলে শব্দের বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থকে ছাপিয়ে যে সীমাহীন ব্যঞ্জনা প্রকাশব্যাকুল হয়ে ওঠে, কবিতা তার সংকেত দেয়, কবিতার ভাষার এই বিবর্তনের ফলে শব্দধ্বনি আজ আগের মতো শুধুমাত্র মানুষের প্রাণময় অস্তিত্বকেই প্রকাশ করে না বা শুধুমাত্র তার মানসিকতারই পরিচয়বাহী নয়, এ সবকে ছাপিয়েও সেই শব্দধ্বনি আজ মানুষের অন্তঃস্থ বৃহত্তর ও ব্যাপকতর আত্মার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তার অনুভূতি ও তার প্রেরণাকেও ব্যক্তিত করে। এই ভাবে কবিতা মানুষের প্রাণময় ও মনোময় অস্তিত্বে সত্য হয়ে ওঠে, আনন্দময় অস্তিত্বের বা রসলোকের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

দৈনন্দিন ব্যবহারে শব্দের যে শক্তি প্রকাশ পায়, গদ্যরীতি তাকে বহুগুণিত করে তোলে, কিন্তু তথাপি কাব্যের মহনীয়তা তাতে নেই। এর কারণ, গদ্যে শুধুমাত্র শব্দের বুদ্ধিগ্রাহ্য সম্পদই প্রকাশ পায়। গদ্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি, সাধারণ বাক্ প্রয়োগে যে ধ্বনি অনুপস্থিত, গদ্য শব্দবিন্যাসে সেই ধ্বনিগুণ নিয়ে আসে এবং প্রকাশের মধ্যে একটি সরল সুসমঞ্জস গতি চিহ্নিত করে। গদ্যে শব্দ-যোজনা এমন স্বাভাবিক এবং পরিশীলিত যে তা একই সংগে বোধশক্তির কাছে তৃপ্তি ও স্পষ্টতা আনে। সাধারণ স্থূল বাক্-রীতির সংগে পরিশীলিত গদ্যের প্রভেদ এখানেই যে পরিশীলিত গদ্যে বক্তব্য অনেক বেশী ঋজু, নমনীয় এবং রমণীয় হয়ে ওঠে। গদ্যের মূল লক্ষ্যই হলো বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা। এই যাথাতাথ্য ছাড়াও গদ্য বক্তব্যের বুদ্ধিগত আবেদনকে অনিবার্য করে তোলার জন্য বাক্-রীতির মধ্যে ধ্বনি-সৌকর্য এনে প্রকাশকে আরো বেশী শক্তিমান এবং সহজগ্রাহ্য করার প্রয়াস পায়। এর বাইরে গদ্যের আর যদি কোন প্রকৃতি নির্ণয় করতে হয়, তাহলে বলতে হয় এই যে গদ্য কোথাওবা একটি বিশিষ্ট ধ্বনিপ্রবণ হয়ে ওঠে, কোথাওবা আবেগকে সঞ্চারিত করার প্রয়াস পায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটি রসবোধই তার উপজীব্য। এমনও হতে পারে যে গদ্য প্রকাশের স্বাভাবিক আনন্দে এমন সব সম্পন্ন চিত্রভার ব্যবহার করেছে, যার ফলে তাকে কাব্যের সমধর্মী বলে মনে হয়; কিন্তু সেক্ষেত্রে একথা স্মরণীয় যে গদ্য সে-চিত্রকল্প হয় বহিরঙ্গের অলংকার রূপেই ব্যবহার করেছে নতুবা প্রকাশকে মনোগ্রাহী করে তুলে তার আবেদনকে নিঃসন্দেহ করাই তার উদ্দেশ্য। কবি যে গভীরতর প্রাণ-প্রবর্তনায় চিত্রকল্প ব্যবহার করে, সেই প্রবর্তনা গদ্যশিল্পীর নেই। বুদ্ধিগ্রাহ্যতাই গদ্যের আসল উপাদান; অন্য যা-কিছু সে জড়ো করে তা নিছক প্রকাশকে শক্তিশালী ও রমণীয় করার জন্যই। বুদ্ধির যে-দুটি শক্তি—রুচিবোধ এবং বিচারবোধ—গদ্যশিল্পীর কাছে এরাই হ'লো পরমপূজনীয়, কিন্তু কবির দেউলে এরা উল্লেখযোগ্য নয়। আপন

নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে, গদ্য যখন তীব্রতর কোন ধ্বনিসৌষ্ঠব লাভের চেষ্টা করে, অথবা কেবল মাত্র ভাবাবেগের তাগিদেই চিত্রকল্প ব্যবহার করে, কিংবা বাক্-রীতির মধ্যে উদ্ভূগ কোন ক্ষমতা বিন্যস্ত করে দেয়, তখন সে গদ্য প্রকৃতপক্ষে কাব্যেরই সামিল। সে গদ্য তখন 'কাব্যিক গদ্য'; অথবা বলা যেতে পারে যে কবিতা সেক্ষেত্রে গদ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। গদ্যে একটি উচ্চাঙ্গের যাথাতথ্য, বক্তব্যের অনিবার্যতা, বুদ্ধির সৌকর্য এবং একটি সুসম রমণীয়তা থাকলেই যথেষ্ট। কিন্তু কবির লক্ষ্য আরো গভীরে,—সে শব্দের অন্তর্গত গূঢ়তম ভাবসম্পদকে আবিষ্কার করে, খুঁজে আনে সেই সর্বব্যাপক ধ্বনি, যার মধ্যে অপার্থিব ঐশ্বর্য এবং সীমাহীন ভাবসংকেত সমন্বিত এবং যা কবির আত্মার সত্তারই স্বতোৎসারিত প্রকাশ। কবির পক্ষে এই অপার্থিব ধ্বনি আবিষ্কার করা যে সর্বদাই সম্ভব তা নয়, তবে এই 'ধ্বনি'র অন্বেষণই কবির প্রকাশের আসল প্রেরণা এবং সে যখন এই অপার্থিব ধ্বনির মধ্যে আত্মিক সত্যকে উচ্চারিত করে, তখন তা হলো মন্ত্রোচ্চারণ।

এই আত্মিক সত্যের অন্বেষণই হোক, অথবা তার আবিষ্কারই হোক, কবিতা একটি ছন্দঃস্ফূর্ত প্রকাশ—যে-প্রকাশ-ব্যাকুলতার মূলে আছে আত্মিক এক উন্মাদনা এবং এই উন্মাদনার জন্ম হলো সত্যদর্শনে। এই সত্যদর্শন জড় বা জীব জগতের যে-কোন স্তর নিয়েই হতে পারে এবং ঈশ্বরও তার বিষয়বস্তু হতে পারেন। এই সত্যদর্শন বা অলোকদৃষ্টি কোথাও বা শক্তি ও কর্মের, কোথাও বা পার্থিব সৌন্দর্যের, অথবা ভাবনাগত সত্যের। কবির এই কল্পনা বা সত্যানুভূতি যেমন এই নশ্বর জীবনের সুখ দুঃখের আবেগজাত হতে পারে, তেমনি আবার এই জীবনোত্তীর্ণ হতে পারে। কবিতার ক্ষেত্রে এই কথাটিই সর্বথা স্মরণীয় যে সেই সত্যদর্শন বা দৃষ্টি যেন আত্মার হয় এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়, মন এবং এমন কি কবির যন্ত্র পর্যন্ত সেই আত্মার অনুগত সহায়মাত্র থাকে। কবিতার জনক যেখানে এই আত্মা, সেখানেই সে সত্য, মহান্। কিন্তু 'আত্মিক' না হয়ে কবিতা যদি মনের, কল্পনার, আবেগানুভূতির বা বাহ্যজীবনের একটি বেগবান উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত হয় এবং তাতে যদি স্বর্গীয় আকুলতার সুর না মেলে, [অর্থাৎ 'অনাত্মিক' এই শব্দ উচ্ছ্বাস যদি আত্মার গভীরে নিস্নাত হয়ে পরিশুদ্ধ না হয় এবং প্রকাশভঙ্গী একটি সম্যক্ রূপান্তর লাভ না করে, তবে সে কবিতা নিম্নস্তরের হয়ে পড়ে এবং তার স্বীকৃতি দীর্ঘস্থায়ী হয়না। কবিতার আবেদন যখন মানুষের নিম্নতর বৃত্তির কাছে, তখন তা আর কবিতা থাকেনা এবং তখন গদ্যের সংগে কবিতার পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে গদ্যের তুলনায় কবিতার প্রকাশভংগীতে একটি ছন্দোরূপ বা একটি নিটোলভাব থাকে। কিন্তু তাতে কবিতার যথার্থ রসতত্ত্ব নেই।

এর কারণ, ভাষার যা-কিছু প্রকাশযোগ্য, তার দুটি দিক—একটি বাহ্য, অন্যটি অন্তরের; একটি আঙ্গিক, অন্যটি আত্মিক। যেমন চিন্তার ক্ষেত্রে একদিকে রয়েছে মননশীলতা, অন্যদিকে তন্ময়তা এবং এই তন্ময়তাই মননকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রকাশিত বিষয়ের আন্তর সত্যের সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। ঠিক একই ভাবে, শুধুমাত্র

আবেগই কবির ঈপ্সিত নয়, সেই আবেগ-নিহিত সত্যই তার কাম্য। এবং একথা যেন আমরা ভুলে না যাই যে এই সত্যান্বেষণই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সংগে আমাদের ভাবগত সম্পর্কের মূল প্রেরণা। কবি তাই তাঁর রচনায় জড় ও জীবজগতের সত্যকে প্রতিফলিত করতে চান। রচনার মধ্যে কবির নিরন্তর প্রয়াস এই বৃহত্তর সত্যকে খুঁজে পাওয়া, খুঁজে পাওয়া সেই সত্যের আনন্দ ও তার সৌন্দর্যকে—যে সৌন্দর্যই সত্য এবং সত্যই সুন্দর এবং যা চির আনন্দবাহী—এবং এই সত্যান্বেষণের পিছনে যেহেতু আত্মারই প্রবর্তনা রয়েছে, অতএব কবিতার গঠন ও প্রকৃতিতে আত্মার সহজ আনন্দই উদ্বেলিত। আত্মিক সত্য এবং আত্মিক আনন্দের গভীরতা ও ব্যাপ্তি পদের সহজ সুগম পথে হয়তো আভাসিত করা চলে, কিন্তু কাব্যের মুক্ত-বিহঙ্গী ছন্দোস্পন্দেই সেই সত্য এবং সেই আনন্দ আমাদের কাছে জীবন্ত করে তোলে। বিষয়বস্তুর মর্মনিহিত সত্য যখন কবির উপলব্ধিতে ধরা পড়ে, তখনই তাঁর রচনায় গভীরতা আসে। শব্দকে ছাড়িয়ে আত্মাকে প্রকাশ করার আবেগ থেকেই এই গভীরতার জন্ম বিশ্ববিসারী রূপ ও রসের নিকটে এসে তারই মধ্য দিয়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার তাগিদের মধ্যে যে এক অপার্থিব উত্তেজনা থাকে, আত্মসন্ধানের সেই অপার্থিব উত্তেজনাই কাব্যে এনে দেয় গতি, দীপ্তি এবং নিবিড়তা।

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

১০ই মার্চ ১৯৫১

(মা পড়লেন তাঁর "কথাবার্তা" হতে)..."অর্থশক্তি বর্তমানে রয়েছে প্রাণময় জগতের সত্তাদের ও শক্তিদের দখলে অথবা তাদের প্রভাবের বশে। সেই প্রভাবের কারণেই তোমরা কখনো দেখনা যে যথেষ্ট পরিমাণে তা উচ্চসত্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় সকল সময়েই তা অন্যান্য দিকে চলে যায়, কারণ বিরোধী শক্তিরা তাকে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে সেই ভাবে ব্যবহার করছে, এবং প্রধানত তারা এরই জোরে পৃথিবীর উপর নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রেখেছে। ওদের এরূপ দখল ওদের পুরো শক্তির ক্রিয়াতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কাজেই তার ভিতর থেকে কিছু বের করে আনতে পারা যথেষ্ট কঠিন কাজ। যতবারই তুমি চেষ্টা করতে যাবে অর্থের বর্তমান মালিকের হাত থেকে কিছু টেনে বের করে আনতে, ততবারই তার জন্য তোমাকে বিস্তর লড়তে হবে।"

প্রশ্ন : রূপকথায় শুনেছি যে সম্পদের ভাণ্ডারের পাহারাতে সাপ থাকে। তা কি হতে পারে?

উত্তর : হাঁ, কিন্তু সে বাস্তবের সাপ নয়, প্রাণময় জগতের সাপ।

বিশ্বের সম্পদভাণ্ডারের চাবিকাঠি আছে প্রাণময় জগতে, আর সেখানে পাহারা দিচ্ছে মস্ত এক কালো সাপ—সাধারণ সাপের চেয়ে দশ পঞ্চাশ গুণ বড়ো। সেখানকার দরজা সে সব সময়েই আগ্‌লে আছে—বিরাট আকারের আর কালো রঙের সেই সাপটা ফণা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, সর্বক্ষণ সজাগ হয়ে। আমি একবার তার সামনে গিয়ে পড়েছিলাম (আমাকে এরা একটু খাতির করে, আমার কথা শোনে)। আমি তাকে বললাম, "আমাকে ঢুকবার একটু রাস্তা দাও তো"। সে বললে, "দিতে পারি তোমাকে ঢুকতে, কিন্তু তাহলে ওরা তখনই আমাকে মেরে ফেলবে, সুতরাং সেটা সম্ভব হবেনা।" আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "কী করলে ওখানে ঢোকা যেতে পারে তা জানো?" সে বললে "হাঁ, তুমি যদি কেবল একটি কাজ করতে পারো তাহলে অনায়াসে তোমায় ঢুকতে দিতে পারব—যদি মানুষদের যৌন প্রবৃত্তি জিনিসটাকে জয় করতে পারো—তাহলে আমার দিক থেকে আর কোনোই বাধা থাকবেনা, তোমাকে এর ভিতরে যাবার রাস্তা ছেড়ে দেবো।"

কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি ওর মধ্যে ঢুকবার রাস্তা পাইনি, তার কারণ ও যা করতে বলেছিল তা এখনও সম্ভব হয়নি। মানবজাতির ভিতরকার ঐ জিনিসকে এখনও আমি জয় করতে পারিনি। কাজটা বড়ো সহজ নয়।

প্রশ্ন : যে সকল লোকেরা ভয়ংকর রকমের প্রাণজগতের সত্তাদের সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়েছে, তাদের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করাই দরকার, কিন্তু সে কথা তো আগে জানতে পারা চাই। কেমন ক'রে জানা যাবে তাদের ঐভাবে জড়ানোর কথা ?

উত্তর : প্রাণের তরফের তেমন আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিশক্তি না থাকলে তা জানা কঠিন, অর্থাৎ প্রাণময় জগৎটাকে তোমার দেখতে পাওয়া চাই। আমি বহুবারই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে এই দুটো জিনিস প্রায়ই হয়ে থাকে। যখন কোনো কারণে একজনের সঙ্গে তোমার মতে বনছেনা, প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি বাধছে, তখন তুমি বলবে, "এ ব্যক্তি নিশ্চয় এক ভয়ংকর রকমের প্রাণসত্তা।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে তোমার নিজেকে আগে জানা দরকার, দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তির তরফের আসল বক্তব্য কি তাও জানা দরকার। আর একরকম জিনিস হয়ে থাকে, তা আরো আশ্চর্য। দুটি মানুষকে আমি জানতাম যারা কেবল প্রভাবগ্রস্তই নয় কিন্তু নিজেরাই মূর্তিমান ঐরূপ ধরনের প্রাণময় সত্তা। অথচ তারা অন্যদের সম্বন্ধে প্রায়ই মন্তব্য ক'রে বলতো যে এরা নিশ্চয় প্রাণময় জগতের প্রভাব পেয়েছে। অতএব হঠাৎ কিছু একটা মীমাংসা করতে যেওনা। অনেক সময় অর্ধেক জানার চেয়ে বরং একেবারে না-জানাই ভালো। কারণ যদি তুমি অজ্ঞাতে কোনো প্রাণময় সত্তার সংস্রবে আসো তাহলে সাধারণ ভাবেই তার সঙ্গে মিশতে পারবে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবেই নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে, তাকে শত্রুতা করতে দেখলে সহিষ্ণু হয়ে সতর্ক থাকবে। তার পরে সে যাই কেন করুক তাতে কিছু গ্রাহ্যই করবে না। কেবল যারা পুরোপুরিভাবে কোনো প্রাণময় সত্তাকে আয়ত্তে এনে নিরপেক্ষ হয়েছে, তারাই বলতে পারে, "অমুক লোক বা তমুক লোক বারাত্মক রকমের সত্তা।"

(মা আবার নতুন জায়গা থেকে পড়লেন)..."স্থূলদেহের আশ্রয়ের মধ্যে মানুষ যথেষ্টই নিরাপদে থাকে। দেহটাই তার রক্ষক হয়। কেউ কেউ এই দেহকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ক'রে ভাবে, মৃত্যুর পরে এই দেহের বন্ধন ছেড়ে গেলে তখন বুঝি সব কিছুই সহজ ব্যাপার হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দেহই তাকে দুর্গের মতো আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। যত-ক্ষণ এর আশ্রয়ে রয়েছে ততক্ষণ বিরোধী শক্তিদের পক্ষে তাকে কাবু করতে পারা কঠিন হয়। দুঃস্বপ্ন কেমন হয় তা জানো তো ? তখন তোমরা দেহ ছেড়ে ঐ প্রাণময় জগতের মধ্যে গিয়ে পড়ো। তেমন দুঃস্বপ্নের কবলে পড়লে তখন তোমরা কি করো ? তাড়াতাড়ি আবার নিজের দেহের মধ্যে ফিরে এসে নড়েচড়ে নিজের স্বাভাবিক চেতনাতে জেগে ওঠো।"

প্রশ্ন মৃত্যুর পরে মানুষের প্রাণময় সত্তার অবস্থা কি হয়?

উত্তর সেটিও তখন লোপ পেয়ে মিলিয়ে যায়, তাছাড়া দৈবাৎ অন্য রকম হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো জিনিসে কারো তীব্র আগ্রহ লেগে থাকে, যদি কোনো দৃঢ় প্রবৃত্তির দ্বারা তার সত্তাটি বিভক্ত হয়ে গিয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে তার প্রাণসত্তা লোপ পেতে থাকবে টুকরো টুকরো ভাবে। বাষ্পের মতো বা জলের মতো একেবারে উবে না গিয়ে তা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরোতে পরিণত হবে। সেগুলি গিয়ে জড়ো হবে কেন্দ্রস্থ কামনাটিকে ঘিরে, সেগুলি হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তাবিশেষ, যদিও তার আকৃতি মানুষের মতো কিছু নয়, নানা অনির্দিষ্ট রকমের আকৃতি হবে তার। কখনো বা তাকে আগেকার চেহারার মতো দেখাবে, কখনো বা তা সেই কামনারই একটা রূপ নেবে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সেই কামনাকে সফল করা, তার জন্যই সে সুযোগ খুঁজে ফিরবে।

মনে করো, কোনো কৃপণ ব্যক্তির দারুণ মোহ রয়ে গেছে তার ধনরত্নের জন্য। সে যখন মারা গেল, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণসত্তাও ভেঙেচুরে লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু তার ভিতরকার সেই সম্পদের মোহটি রইল বেঁচে। তখন সেই মোহকে ঘিরে তার সত্তার কতকগুলি উপাদান জুটে প্রাণময় জগতের একরূপ জীবন্ত সত্তা হয়ে তা রয়ে গেল। সেই ব্যক্তি তার জীবদ্দশাতে যদি তার গচ্ছিত ধনরত্ন কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, তাহলে সেখানেই তার উপর বসে সর্বক্ষণ আগ্‌লাতে থাকবে, পাছে অন্য কেউ তার সন্ধান পেয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু কারো কারো এমন সূক্ষ্মবোধ থাকে যে গোপন সম্পদের খবর জেনে সে ঠিকই বলতে পারে, "এইখানে কিছু সঞ্চিত সম্পদ আছে।" প্রথমে যখন এটা হয়, তার দ্বিতীয় ফল এই হয় যে ঐ যক্ষের মতো আগ্‌লে থাকা সত্তাটি তার জিনিস রক্ষা করতে একটা কিছু বিপদআপদ বাধিয়ে দেয়। হয় সেই সন্ধানী লোকটি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে, নতুবা তার বিশেষ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, নতুবা সে খুনও হয়ে যেতে পারে, যেমন করেই হোক সেই সত্তা বাধা দিয়ে নিজের জিনিস রক্ষা করে; অথবা যে লোকটি জেনেছিল, তার স্নায়ু দুর্বল থাকলে হঠাৎ তার মস্তিষ্কবিকৃতিও হয়ে যায়।

এ ছাড়া দুর্দান্ত রকমের যৌন কামনা থাকলেও তার থেকে ঐরূপ ছোটো ছোটো ঘৃণিত রকমের সত্তার সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর সময়েও কারো যদি ঐরূপ কামনা টিঁকে থাকে, তাহলে তাদের ঐ সব সত্তা যত দুর্বলস্নায়ু জীবিত মানুষদের আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকে তাদের অনবরত উত্তেজিত করতে থাকে। এমন লোকেদের আমি দেখেছি যাদের সর্বদাই ঘিরে আছে ঐরূপ ডজন ডজন সত্তা। আমি বাস্তব কথাই বলছি।...মরিস্ মাগ্রে নামের একজন লেখককে তোমরা জানো বোধ হয়, তিনি একবার এখানে এসেছিলেন। তাঁর একটা বইতে তিনি লিখেছেন যে যৌন প্রবৃত্তি যাদের খুব প্রবল, তাদের চারিদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরে থাকে এই সব নোংরা সত্তা, এরাই তাদের উত্তেজিত করতে থাকে, যাতে তাদের প্রাণশক্তিকে খানিকটা খরচ

করিয়ে এরা তার থেকে কিছু খোরাক পায়। তিনি এটা বিশেষ লক্ষ্য ক'রে জেনেছেন। যাদের স্নায়ুগুলি একটু বেশি উত্তেজনাপ্রবণ, তাদের মধ্যে এটা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। এমন কি যারা ঐরূপ উত্তেজনা পায় তারা নিজেরাই প্রায় বুঝতে পারে যে বাইরের থেকে এ জিনিস আসছে—তাদের ভিতরকার অংশকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলছে বটে, কিন্তু প্রথমে উত্তেজনাটি যে বাইরের থেকেই এলো তা বেশ বোঝা যায়। এমনি শত সহস্র কতই আছে; কিন্তু এই মানবজাতির পক্ষে এটা খুবই বিড়ম্বনার কথা, এ এক নাছোড়বান্দা রকমের দাসত্ব।

প্রশ্ন: প্রাণগত দুঃস্বপ্নের কালে দেহ থেকে কোন অংশটি বেরিয়ে গিয়ে থাকে?

উত্তর: সে তোমার প্রাণসত্তাটি—তার সমস্তটা নয়, তাহলে বেঘোর অবস্থা এসে পড়বে, কেবল কতকটা অংশই বেরিয়ে যায় বাইরে একটু ঘুরে আসতে। কেউ কেউ তখন এমন ভয়ানক জায়গাতে গিয়ে পড়ে যে সমস্ত রাত্রিটা দারুণ দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে কাটে—এমনি কত অসংখ্য রকমের সম্ভাবনা রয়েছে। জিনিসটা হয়তো খুবই সামান্য, তোমার সত্তার একটু সামান্য অংশই তাতে জড়িত, তথাপি যদি তা চেতন অংশ হয় তাহলে দুঃস্বপ্নটিও হয় তেমনি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক।

যখন তুমি ঘুমিয়ে থাকো, তখন তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তার সবগুলিই দেহের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকেনা। তার মধ্যে কিছু কিছু অংশ স্বাধীনতা পেয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে—সে স্বাধীনতা খুব সীমাবদ্ধ হলেও তারা তখন আপন আপন উৎপত্তির রাজ্যের মধ্যে চলে যেতে পারে। মন এটা খুব বেশি পরিমাণেই করতে পারে, কারণ মন দেহেরই অন্তর্গত অংশ হলেও প্রায় সব সময় দেহের মধ্যে থাকে না। প্রাণসত্তাও বেরোতে পারে, কিন্তু সে দেহের মধ্যেই অনেকটা কেন্দ্রীভূত। কিন্তু মন জিনিসটা এমনই উড়ন্ত রকমের, যে তুমি মনে মনে কাউকে চিন্তা করতে থাকলেই মানসিক সত্তায় তার কাছে চলে যেতে পারো, অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে। খুব একাগ্রতার সঙ্গে যদি কোনো স্থান সম্বন্ধে চিন্তা করো, তাহলে তোমার মনের একটা অংশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়—কারণ মনের কাছে দূরত্ব বলে কিছু নেই। অবশ্য মনকে দেহেতে কেন্দ্রীভূত ক'রে রাখতে বিশেষ শিক্ষার দরকার। খুব কম লোকেরই মন সুনির্দিষ্ট রূপে গঠিত হয়ে থাকে; মন প্রায়ই হয় উড়ন্ত মেঘের মতো, কেবল এদিক ওদিক আসাযাওয়া করছে। এমন কি প্রাণসত্তাকেও যদি দেহানুযায়ী আকৃতি দিতে হয় তবে তাকেও ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রভূত করা চাই। মনের পক্ষে তা আরো বেশি দরকার। তাকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ক'রে চৈত্যকেন্দ্রের কাছে রাখতে হবে, তবেই সে নির্দিষ্ট আকার নেবে।

মনকে সুগঠিত করতে অনেকে সারা জীবনই ব্যাপৃত থাকে। এমন অনেককে জানি যারা নিজেদের মনকে বিরাট দুর্গরূপে গড়ে তুলেছে (তাদের মানসিক শক্তিও তেমনি

অসাধারণ)। মনকে তারা এমন শক্তিশালী ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ বিরাট সৌধের মতো ক'রে রেখে-ছিল এবং তার দেয়াল ছিল এমনই নিরেট যে বাইরের মনোজগতের সঙ্গে তার কোনো সংস্পর্শই ঘটত না। তারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সেই দুর্গের মধ্যেই অবস্থান করতো, আর তাদের চেতনার সকল ক্রিয়া নিজের মধ্যেই সৃষ্ট হতো—বাইরের মানসিক জগৎ সেখানে আদৌ প্রবেশ করতো না। তাদের নিজেদের দেহসত্তা ও প্রাণসত্তার সঙ্গে সকল সংস্রব অবশ্য ঠিকই ছিল, কিন্তু চেতনা ও তার ক্রিয়া চলত নিজেদের মনের সেই গঠনের মধ্যে, তার ভিতর হতে তা বাইরে বেরিয়ে আসত না। অবশ্য এমন অবস্থা কেবল তাদেরই পক্ষে হতে পারে যারা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে স্থূল চেতনাকে একেবারে বর্জন ক'রে কেবল আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে আভ্যন্তরীণ সত্তাতেই একাগ্র থেকে তারই সঙ্গে একান্ত হয়ে অবস্থান করে। এদের কারো কারো নাম যদি তোমাদের শোনাই তাহলে তা শুনে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে তারা এমন অবস্থা গড়ে তোলে যে মনের সকল স্তরই তার মধ্যে রইল, তারা সেই সুদৃঢ় নিরেট দুর্গের মধ্যে নিজেকে রাখে বন্দী ক'রে, আর যখন বোঝে যে এইভাবে তারা চরম সত্যে গিয়ে পৌঁছেচে, তখন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরই গড়া জিনিসের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছেচে।

আর যে সকল অনুভূতি পাবার তারা প্রত্যাশা করেছিল সেইগুলিই তারা পাচ্ছে; মুক্তির অনুভূতি, দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার অনুভূতি, পরাৎপরের সঙ্গে একাত্ম হবার অনুভূতি, সব কিছুই তাদের হবে, কিন্তু সবই নিজেদের গড়া জিনিসের মধ্যে, মূল বিশ্ববাস্তবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ তা নয়। ওরই মধ্যে কেউ যদি কোনোরূপে একটু কিছু সংস্পর্শ পেয়ে যায় এবং তা পরখ ক'রে দেখার মতো ক্ষমতাও পায়, কিংবা যদি হয়তো তাদের সেই নিরেট দেয়ালের মধ্যে কিছু ফাটল বেরিয়ে পড়ে, তাহলে তারা প্রথমটাতে ওতে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, যে শক্তির দ্বারা সেরূপ ঘটল তাকে তারা মনে করে ভয়ংকর এক প্রলয়ংকরী শক্তি, মনে হতে থাকে যে এ বুঝি প্রচণ্ড রকমের কোনো বিরোধী শক্তির ক্রিয়া।

প্রশ্ন : আর মনের দুঃস্বপ্ন কি জিনিস?

উত্তর : মস্তিষ্কের মধ্যে যখন বিস্ফোট বাধে, মস্তিষ্কময় দেখা দেয়, উদ্বেগ হতে হতে উদ্বেলতা আসে, যখন আত্মসংযম হারিয়ে ফেল, তখন বিচিত্র রকমের মনোময় গঠনগুলো তোমার উপর এসে ভর করে—অধিকাংশ স্থলে তা তোমার নিজেরই সৃষ্টি। তখন জাগ্রত চেতনার বশে কিছু না থাকাতে মাথার মধ্যে শুরু হয়ে যায় স্প্যানিশ ধরনের নৃত্যলীলা, এক রকম উন্মাদের মতো অবস্থা; সমস্ত ভাবগুলি যায় জট পাকিয়ে, পরস্পরে গুঁতোগুঁতি করতে থাকে, অলীকদর্শন চলতে থাকে। সে সময়ে যদি মাথার ভিতরকার অশান্তি থামিয়ে প্রশান্তি আনবার ক্ষমতা তোমার না থাকে, বিশুদ্ধ আলোকপাত সেখানে যদি না করতে পারো,

তাহলে তখনকার অবস্থা হয় প্রাণের তরফের দুঃস্বপ্নের চেয়ে দশগুণ ভয়ংকর। প্রাণের দুঃস্বপ্নে বড় জোর এই হয় যেন কোনো শত্রু এসে তোমাকে মেরে ফেলতে চাইছে, তুমি তার সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করছ, কিন্তু তোমার সজোর আঘাতগুলো তার মোটে গায়েই লাগছে না, কোনোমতেই তাকে তুমি বাগাতে পারছ না। সে তোমার সামনে থেকে তোমার গলা টিপে মারতে চাইছে, কিন্তু তুমি তোমার সমস্তটা জোর দিয়েও তাকে হটাতে পারছ না ; এমন তেড়ে আসা শত্রুর সঙ্গে বিফল প্রয়াসে লড়তে থাকা খুবই কষ্টের ব্যাপার। সেইজন্যই বলা হয় যে সমুচিত ক্ষমতা ও বিশুদ্ধতা অর্জন না ক'রে দেহ ছেড়ে বেরোবার মতলব করা উচিত নয়। এমন দুঃস্বপ্নের বেলাতে তোমার "স্মৃতি"কেই কাজে লাগাতে হয়। তোমার হয়তো গায়ে খুব জোর আছে, ভালো মুষ্টিযুদ্ধ লড়তে পারো, কিন্তু প্রাণসত্তায় শক্তি না থাকলে প্রাণময় জগতের কাছে তুমি একেবারে হীনবল। কিন্তু মানসিক দুঃস্বপ্নের বেলাতে যেখানে মাথার মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য চলেছে, সেখানে মনে হয় যে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি।

প্রশ্ন মৃত্যুর পরে চৈত্যসত্তা তো যায় বিশ্রাম নিতে, কিন্তু প্রাণসত্তা আটকে থাকে প্রাণময় জগতে—তাতে কি চৈত্যের পক্ষে বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না?

উত্তর কিন্তু প্রাণসত্তা বা মনঃসত্তা কেউই তো সেই বিশ্রামের অবস্থায় গিয়ে হাজির হয় না, তারা তো লোপ পেয়ে বিলীন হয়ে যায়। কেবল যদি কেউ সারাজীবন যোগ ক'রে থাকে, আপন ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলতে যথেষ্ট যত্নবান হয়, প্রাণ ও মনকে চৈত্যের অভিমুখে একাগ্র ক'রে রাখে—এমন হয়তো লাখের মধ্যে একটি হতে পারে—সে ক্ষেত্রে ঐগুলি লোপ না পেয়ে টিঁকে থাকে। যেমন, কোনো এক দার্শনিক বা লেখক যদি একাগ্রতার সঙ্গে প্রচুর মস্তিষ্কের কাজ ক'রে থাকে, আর সেই ভাবে মন প্রাণকে গড়ে তোলে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাদের তা থেকেই যায়, কিন্তু তা কেবল ঐ চিন্তাশক্তির আকারেই, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। মৃত্যুর পরেও তাদের সেই চিন্তাশক্তি টিঁকে থাকে, আর তারা তখন ঐরূপ কোনো এক মস্তিষ্কের সন্ধান করে যার মধ্যে ঢুকে পড়ে তারা অনুরূপ ক্রিয়া করতে পারে। এই প্রকারেই বড়ো বড়ো চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মন অন্য কোনো মনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে যথোচিত রূপে অভিব্যক্ত করতে পারে।

আর প্রাণসত্তার বেলাতে, মনে করো একজন সঙ্গীতজ্ঞ সারা জীবনের সাধনাতে তার বাহ্যসত্তাতে সঙ্গীতের এক সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্ররূপে তৈরি ক'রে তুলতে চেষ্টা করেছে, যাতে তার প্রাণশক্তি ঐ দেহযন্ত্র দিয়ে অপূর্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে। এই ভাবে তাদের দুটি সুপটু হাত এমন একটা ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে যে মৃত্যুর পরেও তা একরূপ সূক্ষ্মদেহ নিয়ে টিঁকে থাকবে, সেটি হবে তার দেহের আকৃতির অনুরূপ। এরা তখন প্রাণময় জগতে ঘোরাঘুরি করতে থাকে আর অনুরূপ গুণযুক্ত কারো দ্বারা আকৃষ্ট হলে তার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা

করে। তেমন কারো যদি প্রবণতা ও গ্রহিষ্ণুতা থাকে তাহলে ঐ হাত দুটির সূক্ষ্মদেহ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াতে তারাও আশ্চর্য রকম সঙ্গীতের সৃষ্টি করে, সেই হাতের সাধনার সুফল তারা পেয়ে যায়।

প্রশ্ন : এরূপ কি বৈজ্ঞানিকের বেলাতেও হতে পারে না, যাতে তাদের জীবনের সাধনার ফল মৃত্যুর কিছুকাল পরেও অভিব্যক্ত হতে পারে?

উত্তর : হাঁ পারে, যেমন হয়েছিল পিয়ের কুরী ও মারী কুরীর বেলাতে, স্বামীর মৃত্যুর পরে তার শক্তি তার স্ত্রীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে ক্রিয়া করেছিল।

প্রশ্ন নিশরের কবরগুলি যারা খুঁড়তে যায় তাদের প্রায়ই কিছু দুর্ঘটনা ঘটে কেন?

উত্তর সেটা তাদের প্রাপ্য, কবরের পবিত্রতা তারা লঙ্ঘন করে, নয় কি? এ নিয়ে অনেক রকমের গল্প আছে। কিন্তু সে হলো আলাদা কথা।

জিনিসটা একটু বুঝিয়ে বলি। স্থূলদেহের মধ্যে রয়েছে "দেহাশ্রিত আত্মা", সেই মানুষটি মরে গেলেও দেহাশ্রিত আত্মা কিছুকাল পর্যন্ত সেখানে টিঁকে থাকে, আর ততক্ষণ পর্যন্ত দেহটি বিনষ্ট হয় না। প্রাচীন মিশরের লোকেরা এ খবরটি জানতো; আরো তারা জানতো যে ঐ দেহকে নষ্ট হতে না দিয়ে কোনোপ্রকারে যদি রক্ষা করা যায়, তাহলে তার আত্মাও তাকে ছেড়ে যাবে না আর দেহটিও অটুট থাকবে। সেই চেষ্টাই করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আশ্চর্যরূপে কৃতকার্যও হয়েছে। তাই, যে সকল সত্তা ঐভাবে হাজার হাজার বছর ধরে বিশ্রামের অবস্থাতে রয়েছে, তাদের সেই বিশ্রামকে যদি বিঘ্নিত করতে যাও কেবল অযথা কৌতূহলের বশে অথবা "বৈজ্ঞানিক" কারণে, তাহলে তারা যে তাতে খুব খুশি হবে না সে কথা স্পষ্টই বুঝতে পারো।

প্যারিসে 'গিমে" যাদুঘরে দুটি মমির শবদেহ রক্ষিত আছে। তার মধ্যে একটিতে অন্যরূপ কিছু নেই, কিন্তু অন্যটিতে তার আত্মা যে সচেতনভাবে অবস্থান করছে তার নিদর্শন এবং সংস্পর্শ পর্যন্ত পাওয়া যেতো। কিন্তু ভেবে দেখ, কতকগুলি নির্বোধ মানুষ যদি দলে দলে তোমার কাছে আসতে থাকে আর চোখ বের ক'রে মহা বিস্ময়ের মতো বলতে থাকে যে, "ও, এটা ছিল এমন, ওটা ছিল তেমন," তাতে নিশ্চয় তুমি খুশি হও না।

ওরা গিয়ে গোড়া থেকেই গোলমাল করতে শুরু করে; মমিগুলি যত্নে তৈরি বাক্সের মধ্যে এঁটে বন্ধ করা থাকে, দেহটি যাতে তার মধ্যে অবিকৃত ভাবে থাকতে পারে তার জন্য যা-কিছু ব্যবস্থার দরকার সমস্তই নিখুঁতভাবে করা থাকে। কিন্তু ওরা গিয়ে সেই বাক্সটিকে নির্মমভাবে ভেঙেচুরে বিনা দ্বিধায় খুলে ফেলে, উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য তার উপরে জড়ানো আবরণগুলিকে যেখানে সেখানে টানাটানি ক'রে ছিঁড়ে

ফেলে,...কিন্তু এটা অবশ্য জানা কথা যে কোনো সাধারণ ব্যক্তিকে ঐভাবে সময়ে মমি রূপে রেখে দেওয়া হয়নি, যারা অসাধারণ মানুষ ছিল এবং বিশেষ কিছু আভ্যন্তরীণ শক্তির অধিকারী ছিল, কিংবা যারা রাজা ছিল বা রাজার ঘরে জন্মেছিল, অর্থাৎ যারা "ক্ষমতাপ্রাপ্ত" সত্তা ছিল, তাদের বেলাতেই ঐরূপ করা হতো।

একটি মমির কথা জানি যার সম্পর্কে অনেক রকমের দুর্ঘটনা পরে পরে ঘটতে দেখা গিয়েছিল। সে ছিল রাজকুমারী, কোনো এক ফারাও রাজার কন্যা, সে আবার ছিল থিবসের মন্ত্রশিক্ষা কলেজের প্রধানা অধ্যাপিকা।...কিন্তু মানুষেরা তো এইরকমই হয়ে থাকে।

১২ই মার্চ, ১৯৫১

প্রশ্ন প্রাণময় জগতের শক্তিরা তো আছেই মনোময় জগতেও কি তাই আছে?

উত্তর হাঁ, পুরোপুরি মনোময় জগতে তেমনি মনোময় শক্তিসত্তাও আছে, যারা প্রাণময় শক্তিদের থেকে স্বতন্ত্র, তাদের নিয়মকানুন সম্পূর্ণ আলাদা। মনোময় সত্তা এমন অসংখ্য আছে। তারা প্রায় অবিনশ্বর; তবে তারা আকৃতি ও সম্পর্ক অনায়াসে বদলে ফেলতে পারে—অতিরিক্ত রকমে তরল তাই অনবরতই ক্রিয়া বদলাচ্ছে।

(মা এবার অন্য প্রসঙ্গ হতে পড়লেন)..."তোমরা কেবল সেই কথাই বুঝে নিতে পারো যা নিজেদের আভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে আগের থেকেই জানা ছিল। কোনো বই পড়তে পড়তে যে কথাটা তোমাদের মনে লেগে যায় তা তোমাদের নিজেদের গভীর অন্তরের মধ্যে আগের থেকেই অনুভূত হয়ে থাকবে।...বাইরের থেকে যে জ্ঞান তুমি আয়ত্ত করো, তার মানে আগের থেকেই তোমার ভিতরদিকে সে জ্ঞানের অঙ্কুর ছিল, এখন তার বাইরে ফুটে বেরোবার একটা সুযোগ পেলে মাত্র।"

প্রশ্ন কোনো কোনো বিষয়ে বুঝতে পারা এত কঠিন হয় কেন?

উত্তর তার অনেক কারণ আছে—মস্তিষ্ক যতটা তৈরি হয়েছে, প্রথম বয়সে যেমন ধরনের শিক্ষা হয়েছে, বিশেষত যে পরিমাণের পূর্বানুভূতি তোমার আছে সেই অনুযায়ী। কিন্তু এখানে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। নতুন কোনো ধারণাকে মস্তিষ্কের মধ্যে গ্রহণ করতে হলে তার জন্য মস্তিষ্কে নতুন একটি ক্ষুদ্র কুণ্ডলী তৈরি হওয়া দরকার, এর জন্য কিছু সময় লাগে। তোমাকে এমন কিছু বলা হলো যা তোমার জীবনে কখনো শোনোনি সেটা যখন প্রথম শুনলে তখন তার কিছুই বুঝলে না, তার মানে মস্তিষ্কে তা ঢুকল না।

কিন্তু কিছুকাল কেটে গেলে আবার দ্বিতীয়বার যখন সেই কথা শুনবে তখন তা তোমার বোধ-গম্য হবে। তার কারণ ঐ নতুন কথা শোনার প্রথম শক্‌টা লেগে ইতিমধ্যে তা মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু কাজ করেছে, এবং কথাটি বোঝবার পক্ষে যেমন দরকার তারই উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। কেবল প্রস্তুত করাই নয়, সেখানে যে অপূর্ণতা ছিল তা আপনা হতেই দূর হয়ে গেছে। তাই যখন তুমি প্রথমে একটা কঠিনবোধ্য বই পড়ো, তার ছয় মাস বা এক বছর পরে আবার সেই বই পড়লে এবার প্রথম বারের চেয়ে অনেক ভালোভাবে তা বুঝতে পারবে, এবং কখনো কখনো অন্যরূপ ভাবেও বুঝবে। কারণ তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে ইতিমধ্যে তার কাজ হয়ে গেছে তোমার সজ্ঞান চেতনার অগোচরে। বর্তমান মানুষ যেভাবে তৈরি, তাতে খানিকটা সময় দেবার কথা বিবেচ্য।

প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে কি মস্তিষ্কই শক্‌ দেয়, না চিন্তাটাই এসে শক্‌ দেয়?

উত্তর: তা নয়, চেতনা শক্‌ দেয়। অধিকাংশ লোকে তা জানতে পারেনা। কিন্তু প্রত্যেকের বেলাতেই তা কাজ করতে থাকে।

(না আবার পড়লেন)..."আমরা হয়তো কোনো একটা কথা বেশ পরিষ্কারভাবেই বলছি, কিন্তু শ্রোতারা সে কথা এমন ভুল ক'রে বুঝল যে অবাক হতে হয়। প্রত্যেকেই সে কথা সেই অর্থে ছাড়া অন্যরূপে অর্থে বোঝে, কখনো কখনো এমন কি বিপরীত অর্থেও বোঝে। এমন ভ্রান্তি ঘটতে দিতে যদি না চাও, তাহলে তার উচ্চারণের দিকে মন দেবে আর তার ধ্বনিকে অনুসরণ ক'রে তার পশ্চাতে চলে যাবে, আর মনকে স্তব্ধ ক'রে শুনতে শিখবে।"

প্রশ্ন কেমন ক'রে স্তব্ধ হয়ে শুনতে শেখা যাবে?

উত্তর: অর্থাৎ সেই দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যদি ঠিকভাবে মনোযোগ দিয়ে শোনো যে কি বলা হচ্ছে আর যদি তা বোঝবার জন্য ইচ্ছাটি থাকে, তাহলে ঐরূপ স্তব্ধতা আপনি এসে যাবে। মনোযোগ দিলেই স্তব্ধতা আসে।

প্রশ্ন "মনের দুর্গ" ছেড়ে কি বাইরে বেরোন যায়?

উত্তর: সে তো অনেকেই করে। এমন কি তারা সেই দুর্গের ভিতর থেকে তার সৈনাদেরও বাইরে পাঠায়!

কিন্তু না, সেখানকার প্রধান যে জন সে বেরোয়না; সে থাকে দুর্গটিকে আঁকড়ে আর সেখান থেকে সৈনাদের উপর হুকুম চালায়! দুর্গের দখল সে বরাবর বজায় রাখে, কারণ তবেই তার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ববোধ বজায় থাকে।

প্রশ্ন : দুর্গ ছেড়ে গেলে কী হবে?

উত্তর : না, খবরদার তা করবেনা! দুর্গ ছেড়ে থাকার মতো ক্ষমতা যতক্ষণ হয়নি ততক্ষণ তা চলবে না—আর সে ক্ষমতা লাভ করা খুব কঠিন ব্যাপার। লোকে সাধারণত যা ক'রে থাকে, অনেক চেষ্টাচরিত্র ও অনেক কষ্ট সহ্য করবার পরে তাদের ধারণা হয় যে তারা বীরত্ব অর্জন করেছে, তখন দুর্গটিকে তারা ভেঙে ফেলে—কিন্তু তার পরক্ষণেই আবার অন্য দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সত্যের দিক থেকে এমন অদলবদলে বিশেষ কিছু তফাৎ হয়না, কিন্তু তারা ভাবতে থাকে যে অনেকটাই তারা এগিয়ে গেছে, যেহেতু পুরানো দুর্গকে ভেঙে নতুন এক দুর্গ গড়তে পারলে।

বস্তুত দুর্গ ছেড়ে থাকতে পারা খুবই কঠিন—তাতে মনে হবে যে আমি আর বেঁচে নেই, আমার ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু নেই, আমি নিতান্ত ভেসে বেড়াচ্ছি। অসীম বিশালতার মধ্যে ক্রমাগত ভেসে বেড়ানো আর নিত্যই বদলাতে থাকা, নিত্যই আগুপারে চলা, এমন কোনো পাকা আশ্রয়স্থল নেই যেখানে পা রেখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, "আমি হচ্ছি এমন, এমনি হলো আমার চিন্তারীতি"—সে বড়ো প্রাণান্তকর অবস্থা, ওর জন্যে চেষ্টা করতে যাওয়াই উচিত নয়; তার ফলে অনেকের মস্তিষ্কবিকার হয়ে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে।

প্রশ্ন মনের গঠন কিসের দ্বারা হয়?

উত্তর : মনোময় অহং তোমার মনের গঠন করে, আর সেই তাকে আঁকড়ে থাকে।

প্রশ্ন : 'আমি' আর অহং কি একই জিনিস?

উত্তর সাধারণত তাই।

প্রশ্ন অনেকে মনে ভাবে এক আর মুখে বলে আর, এ কেমন ক'রে হয়?

উত্তর : হাঁ, প্রায়ই তাই হয়ে থাকে। তারা মনেতে ভাবে এক কথা, আর বলবার সময় বলে তার উল্টো কথা। জিভটার উপর মনের চিন্তার যদি তেমন প্রভুত্ব থাকতো তাহলে অনেক নির্বুদ্ধিতা করাই ঘুচে যেতো। কিন্তু সংযমের অভাবে উপস্থিত ঝোঁকের মাথায় তুমি যা মুখে আসে তাই বলে ফেল, যেন একটা কথাবলার কল বকতে শুরু ক'রে অনবরত বকেই চলেছে। কথাটা অসঙ্গত মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিকই তাই সর্বদা হয়ে থাকে। খুব কম লোকই আছে যারা এমনি ঝোঁকের কবলে পড়েনা। অনেক কিছু বলার পরে তখন তারা ভাবে, "ও কথাগুলি বললাম কেন?" নিজেরাই তা জানেনা যে কেন বলেছে। অনেককে আবার জানি, তারা অন্যে যা শুনতে চাইছে তেমনি কথাই বলে। যাকে শোনাচ্ছে সে ভাবে, "এবার ও অমুক রকমের কথা বলবে", কিংবা হয়তো ভাবে, "এবার অমুক

কিছু না বললে বাঁচি"। আবার কেউ কেউ কাঠের পুতুলের মতো যখন যা শোনে তাই মেনে বেমালুম হজম ক'রে নেয়, কেন যে তা জানেনা।

প্রশ্ন : ইচ্ছাশক্তির অভাবে কি এমন হয়?

উত্তর : তা নয়, এ হলো মনের একটা আলগা গঠন। এখানে ইচ্ছাশক্তির বিশেষ প্রয়োগ নেই। ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করতে পারলে হয়তো অসঙ্গতির মাত্রা কিছু কম হয়। কিন্তু তা নয়, এগুলো ঐরূপ মনেরই কাজ, সে মনের গঠনই অমন, মনের শক্তিটাই ঐভাবে চলাফেরা করছে, যেমন খাঁচার ভিতরকার কাঠবিড়ালি অনবরত ঘুরে বেড়াতে থাকে, নিতান্তই বিনা কারণে।

প্রশ্ন তাহলে এও কি বিশ্বক্রিয়ার অন্তর্গত?

উত্তর : না, বিশ্বক্রিয়া নয়, কেবল মানবীয় ক্রিয়া। কজন মানুষের নিজস্ব চিন্তা বলে কিছু আছে? সাধারণ মানসিক গঠনের সাধারণ মানুষদের মধ্যে কারোই আছে বলে মনে হয় না। ক'জনই বা নিজের মনে ভেবে নিয়ে নিজের চিন্তাকে গড়েছে। খুবই কম। যারাও বা তা ক'রে থাকে তাদের বলা হয় কঠোরবুদ্ধি বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কিংবা একরোখা, প্রভুত্বকামী—কত রকম অপবাদই দেওয়া হয়। তার কারণ শুধু এই যে তারা চিন্তা করে একটা নির্দিষ্ট ধারা নিয়ে।

একটা সাধারণ প্রশ্ন সম্বন্ধে মনোভাবের দৃষ্টান্ত নিয়েই দেখা যাক।

"জগতের এই অস্তিত্ব কি অনির্দিষ্ট, না এর কিছু আরম্ভ ও শেষ আছে?" এ-বিষয়টি নিয়ে কেই বা ভালো ক'রে ভেবে দেখেছে? কিংবা "জগতের শুরু হলো কেমন ক'রে আর এই পৃথিবীতে প্রথম মানুষ দেখা দিতে শুরু করল কেমন ক'রে?" মন এ প্রশ্নের কোনো নির্দিষ্ট রকমের নির্ধারণ করতে পারেনা অনির্দিষ্ট কতকগুলি সম্ভাবনার কথা তার সামনে এসে হাজির হয়, তার ভিতর থেকে একটাকেও সে ঠিকভাবে বেছে নিতে পারেনা। তখন সে কি করে? নিজের ব্যক্তিগত পছন্দমত একটাকে সে বেছে নেয়, আর বলে, "হুঁ, এই কথাটাই একেবারে সঠিক।" কিন্তু যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে খাঁটি অকপট ও সতর্ক ও নিরপেক্ষ হও, তাহলে তখন কেমন মীমাংসা করবে? এ বিষয়গুলি মানুষের কাছে খুবই নিকটসম্পর্কীয়, সুতরাং মানুষদের এ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থাকা উচিত, নয় কি? পৃথিবীটা হলো মানুষেরই রাজ্য। তাই এ বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, তা পড়লে এক বইতে পাবে একরকম কথা, অন্য বইতে পাবে অন্যরকম কথা। এ ছাড়া ধর্মীয় তরফের মতগুলোও ওর সঙ্গে মিশে গিয়ে বলছে অমুক কথাটাই "খাঁটি সত্য", এটি তোমরা বিশ্বাস করো, নতুবা পাপ হবে! আবার বিজ্ঞানীদের লেখা বই পড়ো, তাতে কেবল বৈজ্ঞানিক রকমের

কথাই বলবে। দার্শনিকের বই পড়ো, তাতে কেবল দার্শনিক তত্ত্বই বলবে। আধ্যাত্মিক তরফের বই পড়ো, তাতে আবার সেই ধরনের কথাই পাবে, কিন্তু...ঘাট পড়ো না কেন, তুমি যেখানে শুরু করেছিলে সেখানেই রয়ে গেলে। কিন্তু যারা মনের মধ্যে একটা স্থায়ী মত ধরে থাকতে চায় (এরাই চায় "দুর্গ" রচনা ক'রে তার মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে)—তারা নির্দিষ্ট একটা মতকে গ্রহণ করে ; যথেষ্ট মনের জোর থাকলে বহু মতের মধ্যে একটিকে তারা ধার্য ক'রে নেয় ; তারপর সেটিকে নিজের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে তার প্রত্যেক জিনিসকে যথাস্থানে রেখে ওর চারিদিকে এক কঠিন দেয়াল রচনা করে (যাতে বহুরকম প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধ যুক্তি এসে কোনো গুরুতর সংঘর্ষ না বাধাতে পারে এবং মতটিকে সুষ্ঠু ভাবে রক্ষা করা যায়), এবং তখন জোর গলাতে বলে—"এবার আমি ঠিক কথা জানি।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই জানেনি ।

এ এক রকমের মজার খেলা, তোমার মনের তৎপরতা যত বেশি হবে ততই তুমি এই খেলাতে মাতবে, আর নিজের মতকে এমন জোরে আঁকড়ে থাকবে যেন তার উপর সব কিছুই নির্ভর করছে ! অনেককে জানি যারা তাদের কেন্দ্রগত মতকে আঁকড়ে থেকে বলে, "তোমাদের আর সকল মতামত চুলোয় যাক, কিন্তু আমার এই মত ঠিক থাকবে, এটাই হলো খাঁটি সত্য।" আবার এরাই যখন যোগ করতে আসে (আশ্চর্যের বিষয় হলেও) তখন এদের সেই মতটা অনবরতই বা খেতে থাকে ! সব রকমের ঘটনাই তাকে ঠুকতে ঠুকতে আলুগা ক'রে আনে, তখন একদিন হতাশ হয়ে তাদের বলতে হয়, "যাঃ, আমার সেই ধারণাটা আর টিঁকল না।"

একজন বেশ কবিত্বের ভাষাতে বলেছিল, "সব কিছু হারাতে পারলেই সব কিছু মিলবে !" বিশেষ করে মনের পক্ষে এটা খুব ঠিক কথা, কারণ যতক্ষণ তুমি সব কিছু ছাড়তে না পারছ, ততক্ষণ কোনো কিছুই তোমার পাওয়া হবেনা।

প্রশ্ন এই পৃথিবীর সূত্রপাত কেমন ক'রে হয়েছিল ?

উত্তর : ও কথা বিজ্ঞানদের জিজ্ঞাসা করো, তারা বলে দেবে।

প্রশ্ন : শেষ পর্যন্ত যা-কিছু শিখলাম তার সবই যদি হারাতেই হয়, তাহলে আদৌ কোনো-কিছু শেখবারই বা কি দরকার আছে ?

উত্তর ওটা তো হলো জিম্‌ন্যাষ্টিকের মতো ব্যাপার। যেমন দেহকে সুগঠিত ও মজবুত করতে হলে তোমাকে গোড়া থেকে অনেক রকম কসরৎ শিখতে হয়, তার মানে এই নয় যে সারাজীবন ধরে তুমি অমনি কসরৎ আর ভার ওঠানো আর প্যারালেল বারই করে যেতে থাকবে। অবশ্য তা করতে পারো যখন তোমার মন যাবে, কিন্তু সেটা তো আসল

লক্ষ্য নয়। মনের বেলাতেও ঠিক সেই কথা। মনকে ভালোভাবে তৈরি ক'রে নেবার জন্য, তাকে উন্নত নতুন জীবনের উপযোগী ক'রে নেবার জন্য, তাকে উচ্চশক্তির দিকে উন্মীলিত করবার জন্য ওর পক্ষেও অনেক রকম কসরতের দরকার হয়। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো হয় এই কারণেই : সেখানে তারা যা কিছু শেখে সমস্তই চিরদিন মনে রাখবার জন্য নয়—কে অত কিছু মনে রাখতে পারে! পরে আবার যখন তাদেরই মাষ্টারী করতে ডাকা হয়, তখন পুনরায় সেই সব কথা তাদের নতুন ক'রে শিখতে হয়, কারণ ইতিমধ্যে তারা সবই ভুলে গেছে। কিন্তু যদি তারা আগে কখনো স্কুলে না গিয়ে থাকে এবং ঐ সকল জিনিস শিখে না থাকে এবং সব কিছুই একেবারে নতুন শিখতে হয়,...মনে করো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে যদি তুমি প্যারালেল বার শিখতে শুরু করতে যাও, তাহলে সেটা যথেষ্টই কষ্টের ব্যাপার হয়ে পড়ে, নয় কি? যে বস্তিক তেমন নমনীয় হতে শেখেনি তার বেলাতেও ঠিক তাই হয়। মনের পক্ষে সব চেয়ে ভালোরকম জিম্‌ন্যাষ্টিক কি হতে পারে জানো? কোনো দার্শনিকের সঙ্গে প্রত্যহ আলাপ আলোচনা করা, যার মধ্যে তত্ত্ব ছাড়া নিরেট বস্তু কিছু নেই। যার বাস্তবতা নেই এমন কিছুতে একাগ্র হওয়া যায়না : সবই সেখানে মুখের কথা, বিবিক্তের রাজা। তাই হবে নিছক মানসিক কসরৎ : আর তুমি যদি সেই দার্শনিকের মানসিক গঠনের মধ্যে ঢুকে তার কথাগুলো বুঝে নিয়ে তার জবাব দিতে শেখো, তাই হবে যথার্থ জিম্‌ন্যাষ্টিকের কাজ।

প্রশ্ন : (কোনো গণিতজ্ঞ ভক্ত) যেমন অঙ্কবিশারদদের মধ্যে হয়ে থাকে, তাই কি?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন যদি মৃত্যুকালে প্রাণসত্তা প্রাণময় জগতের বিরোধী শক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে তখন কি সে অন্যত্র কোথাও আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেনা?

উত্তর : হাঁ, এই কারণেই কারো মৃত্যু ঘটলে সকল দেশের সকল ধর্মেই নির্দেশ দেওয়া আছে যে অন্ততপক্ষে এক সপ্তাহ কাল মৃতব্যক্তিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সঙ্গে স্মরণ মনন করবে। কারণ সেইরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি তাকে স্মরণ করো (মনের মধ্যে হাহুতাশ বা কান্নাকাটি বা বেলাবাল আকুলতা যেন কিছু না থাকে) আর নিজে যদি শান্ত হয়ে থাকো তাহলে বিরোধী শক্তিদের দ্বারা আক্রান্ত হলেও ওটি তার পক্ষে সহায়সূচক আলোর মতো কাজ করবে (একথা বলছি কেবল তার প্রাণসত্তা সম্পর্কে, বিশ্রামলব্ধ চৈত্যের পক্ষে নয়), —নতুবা ঐরূপ আক্রমণে সে দিশাহারা হয়ে কিংকর্তব্য স্থির করতে না পেরে দারুণ অস্বস্তি ভোগ করতে থাকে ; তখন শ্রদ্ধান্বিত স্মরণকারীদের দিক থেকে ঐরূপ আলো দেখতে পেলে সে তারই কাছে গিয়ে আশ্রয় পায়। এরূপ প্রায়ই হয়ে থাকে যে মৃতব্যক্তির প্রাণ-

সত্তার একটা অংশ (কিংবা পরিণত হলে সম্পূর্ণ প্রাণসত্তাই) সেই প্রিয়জনদের আলোর আবহাওয়াতে আশ্রয় পায়। কারো কারো সঙ্গে সঙ্গেও ঘোরে সেই মৃতব্যক্তির প্রাণসত্তার কিছু অংশ। শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন এইজন্যই, এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এই শ্রাদ্ধের কাজটি কোনোরূপ উৎসব হিসাবে না করাই ভালো—কারণ উৎসবাদির আড়ম্বর বরং হানিকরই হতে পারে ; যখন তুমি জাঁকজমক ও ক্রিয়াকাণ্ডের দিকেই বেশি মনোযোগ দাও, তখন মৃতব্যক্তিকে না ভেবে সেইগুলির ব্যবস্থার কথাই ভাবতে থাকো। আর ঐ সকল বাহ্য ব্যাপারের ভিতর দিয়ে বরং তারা ঐ ব্যক্তিকে ভুলতেই চেষ্টা করে। আসলে মানুষের মূলগত দুটি স্বভাব আছে, বেদনাদায়ক জিনিসকে ভুলতে চেষ্টা করা, আর উপস্থিত একঘেয়ে অবস্থা কাটিয়ে বিষয়ান্তরের কামনা করা। এইজন্য মানুষ তার জীবনের অর্ধেকটা সময় এমন কিছু নিয়ে কাটিয়ে দেয় যার সঙ্গে আসল সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

মানুষ জীবনে যখন বৈরুব্য বোধ করতে থাকে (কারণ সকলেই কাজের বাঁধনে নিযুক্ত হয়ে থাকে না, কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে ধনী হয়ে ঘরে বসে থাকে) তারা মূঢ় হয়ে কতই অপকর্ম করে। মানুষ যত কিছু অবিমৃষ্যকারিতা ও অনুচিত কাজ করে, তার মূলে থাকে এই নিষ্কর্মা বৈরুব্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ডাল্‌নেস (dullness)—ভিজে ন্যাতার মতো হয়ে থাকা। কোনো তৎপরতা নেই, অসাড় হয়ে পড়া, যখন নিজেকে চাঙ্গা ক'রে তোলবার জন্য নিজের কিছু চাবুক খাবার (রূপক হিসাবে) দরকার হয়।

প্রকৃতির জমাখরচের ছন্দে সাম্য বজায় রাখার জন্য মানুষকে বিরামের অবসর দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা পুনঃস্ফূর্তি পায়, কিন্তু ওর সদ্ব্যবহার করতে তারা জানে না।

(এটি ছাপার সময় ১০,৩, ৬৫ তারিখে মা এতে আরো কিছু যোগ করেন)

এখন আমি আরো অনেক কিছু বলতে পারি...যেমন...ভগবান যখন মানুষের সঙ্গে আরো চেতনতর সম্পর্ক ঘটাতে তাদের আরো কাছাকাছি হয়ে আসেন, তখন তারা নিজেদের তার থেকে সরিয়ে নিতে অনেক বেশি দুষ্য কাজ করতে থাকে কিংবা তারই নানা পরিকল্পনা করতে থাকে।

প্রশ্ন নিজেদের সরিয়ে আনতে চায় কেন, তাঁর আলোকে সইতে পারেনা বলে ?

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন তাহলে সে আলোর চাপ কি খুব বেশি হয় ?

উত্তর হাঁ, তারা ওতে ভয় পেয়ে যায়, আতংকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তার আনুকূল্য করতে না পেরে বরং ওর থেকে নিস্তার পেতে তারা অন্য দিকে ঝুঁকে পড়ে। *

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পণ্ডপতি অধিকারী

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী"—Thoughts & Aphorisms—সম্পর্কে শ্রীমা।)

১০৯

"মানুষ যে স্তর অবধি আয়ত্তে আসতে পেরেছে তার উপরকার সব-কিছু তার কাছে কঠিন বোধ হয়, যখন সে বিনা সহায়ে তার জন্য প্রয়াস করতে যায় কিন্তু ভগবান যখন মানুষের মধ্যে নিজে এসে তার ভার নেন, তখন সেই জিনিসই খুব সহজ ও সরল হয়ে পড়ে।"

এ তো খুবই খাঁটি কথা।

এই দু'তিন দিন আগেই আমি এক প্রশ্নের জবাবে এই ধরনের কথা লিখেছি : শ্রীঅরবিন্দকে ভগবানই বলব, কিন্তু তবু তিনি তাঁর অংশ মাত্র, সম্পূর্ণ ভগবান হতে পারেন না, কারণ অভিব্যক্ত ও অনভিব্যক্ত তাবৎ সব-কিছুকে নিয়েই তিনি হলেন সর্বময়। আরো আমি লিখেছি : ভগবান নয় এমন কোনো-কিছুই নেই, ভগবান ছাড়া কোনো-কিছু হতেই পারে না, কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে খুব কম লোকই সচেতন। আর সৃষ্টির মধ্যে এই অচেতনাই হলো সকল অসত্যের গোড়া।

সবই তো স্বপ্রকাশ এখানে ! ওখানে। সর্বত্র। তবে অসত্য এলো কেমন করে ? সৃষ্টির মধ্যে এই অচেতনা হতেই অসত্যের সৃষ্টি হয়েছে। যেমনি সমগ্র সৃষ্টি আবার পুরো সচেতন হয়ে জানবে যে সেও ভগবান, তখনই অসত্য যাবে বিলীন হয়ে।

তাই তো এমনতরো হয়ে দাঁড়িয়েছে, নয় কি ? সকল কাজই হয়েছে কঠিন, কষ্টকর, প্রাণান্তকর। কারণ সকল কাজই করা হচ্ছে ভগবানের চেতনাকে বাদ দিয়ে। কিন্তু তিনি যখন তাঁর রাজ্যকে আপন হাতে নেবেন (কিংবা বরং বলতে পারি আবার যখন তিনি তাঁর রাজ্যের দখল নিজের হাতে পাবেন), আর সকল কিছুই করা হতে থাকবে তাঁর চেতনার মধ্যে এবং তাঁর চেতনাকে নিয়ে, তখন সবকিছুই হয়ে উঠবে আশ্চর্য রকমের সহজ ও গৌরবযুক্ত—তদ্ভিন্ন তার মধ্যে থাকবে এক অব্যক্ত রকমের আনন্দ।

এটা এসেছে সপ্রমাণ রূপে। লোকে বললে "কী এ, যাকে অসত্য বলি ? সৃষ্টি এমন মিথ্যা কেন ? এ তো মায়া নয়, অর্থাৎ অনস্তিত্ব নয়, এর রয়েছে পুরোপুরি রকমের অস্তিত্ব, কিন্তু...এ যে অসত্য তা এর নিজের জানা নেই ! এর উৎপত্তি কোথা হতে, কেবল যে সে বিষয়েই অজ্ঞাত তা নয়, কিন্তু এর আসল পরিচয় সম্বন্ধেই অজ্ঞাত, অসত্যের সত্যতা সম্বন্ধেই অজ্ঞাত। তাই এ নিজের অসত্যের মধ্যে দিব্য বেঁচে আছে।

উপরোক্ত সূত্রটি অতি অপূর্ব। এর সম্বন্ধে আর বেশি কিছুই বলবার নেই, ওর মধ্যে সকল কথাই বলে দেওয়া হয়েছে।

৩-৩-১৯৬৫

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

ইয়াকে রসিদ আলি ব্যাপারে অসামরিক ভারতীয় ও বৃটিশ কর্মচারীদের এ দেশে স্থানান্তরিত করিবার পর দমদমে ফেরা হইল। তখন হইতেই পূর্বদিকেও যে যুদ্ধের রাঙ্গ মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে তাহা পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রথম প্রথম ওয়াপিটি বিমানে আমরা স্থলভাগ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ, আসাম ও মণিপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া দেখিয়া আসিতাম; আর আবিলান্ধা বিমানে সমুদ্রের উপরে অথবা উপকূল ভাগ পর্যাবেক্ষণে যাইতাম।

একদিনের কথা মনে পড়ে। পাইলট অফিসার ভাটিয়ার সাথে প্রত্যূষে স্থলভাগ পর্য্যবেক্ষণে উড়িয়া চলিয়াছি। ওয়াপিটি বিমানের সম্মুখের ককপিটে পাঃ অঃ ভাটিয়া ও পিছনের ককপিটে আমি। ময়মনসিংহ সহরের উপর দিয়া আসিয়া গারো পাহাড়ের উপর পৌঁছিয়াছি। খোলা ককপিটে বসিয়া মধ্যে মধ্যে চারিদিকে বেশ তাকাইয়া দেখিতেছি, নানা কথা ও চিন্তা মনের মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে। উড়িবার আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আছি। বেতারবার্তা-গ্রহণী যন্ত্র কানের উপর হইতে নামাইয়া নীচে রাখা আছে। হঠাৎ খেয়াল হইল পাঃ অঃ ভাটিয়া সম্মুখের ককপিট হইতে আমাকে কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মাথা ও কান ঢাকিয়া বেতার-বার্তা রিসিভার যন্ত্র লাগান আছে। ঐ যন্ত্র শীঘ্র আমার কানে লাগাইয়া শুনিতে তিনি আমাকে বলিলেন। রেডিও টেলিফোন যন্ত্র তখনও পর্যন্ত দূর পাল্লার কার্যে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তৈরী হয় নাই। সেইজন্য মর্স কোডেই অর্থাৎ টরে টক্কাতেই সব বার্তা পাঠান ও নেওয়া হইত। আমি বেতারবার্তা গ্রহনী যন্ত্র কানে লাগাইয়া খুব মনঃসংযোগ করিয়াও কিছু শুনিতে পারিলাম না। পাঃ অঃ ভাটিয়া পরে বলিলেন তিনি এক নির্দ্দেশবার্তা পাইয়াছেন। বার্তাতে তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে চট্টগ্রামের দিকে কোন একটি অজানা বিমান আসিতেছে। ঐ বিমান কোন দেশের তাহা সঠিকভাবে এখনও নির্ণয় হয় নাই। তিনি যেন বার্তা পাওয়া মাত্র ঐ এলাকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। অজানা বিমানের সাথে সাক্ষাৎ বা সংঘর্ষ তাঁহার যেন না হয়। কিন্তু ঐ বার্তা পুনরায় না পাওয়ায় আমরা চট্টগ্রাম অভিমুখেই চলিলাম। সব সহরগুলির উপর দিয়া পর্যাবেক্ষণ করিয়া যাইতে যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। দ্বিপ্রহরের পর চট্টগ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে কিন্তু অজানা বিমানের দর্শন ত' দূরের কথা কোন চিহ্নও পাওয়া গেল না। বিমানে পেট্রল ভরিয়া লইয়া এবার আমরা অনেক উত্তরের

পথে পাহাড়ের এলাকা দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দর তখনও নির্মাণ শেষ হয় নাই। তেজগাঁও দেখিয়া পরে ঢাকার অন্য বিমান বন্দরে অবতরণ করিতে বৈকাল পার হইয়া গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসার পর কৃত্রিম আলোতে দমদম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করা হইল। পাঃ অঃ তাহিয়া যে বার্তা শুনিয়াছিলেন, সেই বার্তা দমদম বিমান ঘাঁটিতেও শোনা গিয়াছিল। শুনিবার পর দমদম বিমান ঘাঁটির বেতার অফিস, আমাদের নিকট হইতে কোন বেতারবার্তার আশায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু কোন বার্তা না পাইয়া আমাদের দুইজনের বিমান সহ ফিরিয়া আসিবার আশা ত্যাগ করে এবং স্থির করে যে আজ দুইজন বৈমানিক ও একটি ওয়াপিটি বিমান নিখোঁজ হইল। আমাদের ঢাকায় অবতরণের পর, ওখানকার বেতার অফিস দমদম বিমান ঘাঁটির বেতার অফিসকে জানায় যে আমরা বহাল তবিয়তে ও অক্ষত বিমানে ঢাকায় অবতরণ করিয়াছি। পরে অনুসন্ধানের সময় চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের বেতার অফিস জানায় যে চট্টগ্রাম অভিমুখে কোন অজানা বিমান আসিতেছে এরূপ কোন বার্তা তাহারা পায় নাই। এই ঘটনাটা অনেকটা ধাঁধার মত রহিয়া যায়। সেদিন প্রায় তের ঘন্টা আমাদের উড়িতে হইয়াছিল।

আর একদিনের কথা আরও মজার। সকালে আগিলান্টা বিমানে আমরা পাঁচজন বৈমানিক যজ্ঞোপসাগর অভিমুখে রওনা হইয়াছি। রওনা হওয়ার সময় আকাশ পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল, মেঘের চিহ্নও কোথাও ছিল না। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা উড়িবার মত পেট্রল ট্যাঙ্কে ভর্তি করিয়া লওয়া ছিল। দেড়ঘন্টা যাওয়ার পর উত্তর পূর্ব দিক হইতে ঘনঘটা করিয়া মেঘ আসিয়া জমিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন কি একশত ফিট্ দূরের বস্তুও মেঘে ঢাকিয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইল। কমাণ্ডার ছিলেন মযুরভঞ্জ ষ্টেটের পাঃ অঃ ভঞ্জদেও। দ্বিতীয় ছিলেন যিনি, তাঁহার অন্য কোন নাম থাকা সত্ত্বেও আমরা গুজবুজ সিংহ বলিয়া ডাকিতাম। কারণ তাঁহার প্রকাণ্ড মোচড়ান দাড়ি ও তাহার উপর মস্তকে আরও প্রকাণ্ড নীলবর্ণের পাগড়ী এই দুইয়ে মিলিয়া নির্ভেজাল সিংহের মতই দেখাইত। তিনি ছিলেন পঞ্জনদবাসী শিখ। ঘনঘটা যত গভীর হইতে লাগিল, গুজবুজ সিংহও সেই অনুপাতে অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। ক্রমে প্রবল বৃষ্টি সুরু হইল ও সেই সঙ্গে ভীষণ গর্জন করিয়া বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বিমান এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিল যেখানে প্রতিমুহূর্তে বিদ্যুৎপাত হইতেছিল। এমন কি সময় সময় চারি এঞ্জিনের একটি হইতে অন্যটি পর্যন্ত বিদ্যুৎশিখা লম্ফ দিয়া পার হইতেছিল। ডোপযুক্ত ফেব্রিকে যে কোন মুহূর্তে ঐ প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই আগুন ধরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। অত্যধিক বিদ্যুৎ চমকানর ফলে, অল্প সময়ের ব্যবধানে দিক্‌নির্ণয়কারী ও উচ্চতানির্ণয়কারী যন্ত্র দুইটিও অকেজো হইয়া গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত পাঃ অঃ গুজবুজ সিংহ তাঁহার আসনে বসিয়াই অস্থিরতা দেখাইতেছিলেন, কিন্তু যন্ত্র দুইটি বিকল হওয়া মাত্র তাঁহার আসন ছাড়িয়া ককপিটের মাঝখানে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া

ভগবানের কাছে উচ্চস্বরে নালিশ নিবেদন করিলেন "মৈনে ক্যা কিয়া ? ভগওয়ান, কেঁও মেরা জান লেনে মাংতা হ্যায় ?" এদিকে ঐ প্রচণ্ড বায়ুপাতের মধ্যে পাঃ অঃ ভরদেও একা কন্ট্রোল কলাম সোজা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাহাতে বিমানের গতিও সোজা না হইয়া বিমান এদিকে ওদিকে দুলিয়া দুলিয়া চলিতেছিল। ককপিটের এক কোণে দাঁড়াইয়া আমি সব দেখিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম সময় আর বোধ হয় বেশী নাই ; কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সকলের গল্প একসঙ্গে শেষ হইবে। ভরদেও চকিতে একবার আমার দিকে তাকাইয়া দক্ষিণ দিকের বিমান চালকের আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন ও কন্ট্রোল কলাম শক্ত করিয়া সোজা ধরিতে অনুরোধ করিলেন। বিমানচালকের আসনে বসিয়া কন্ট্রোল কলাম সোজা করিয়া ধরিতে দেখি, একাজে তখন একজন শক্তিমান পালোয়ানের প্রয়োজন ; আমার মত লোকের সাধ্যের বাহিরে। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে ধরিয়া সোজা রাখিতে চেষ্টিত হইলাম। ততক্ষণে পাঃ অঃ ভরদেও তাঁহার বামদিকের বিমানচালকের আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন ও পাঃ অঃ গুরুবুক সিংহের পশ্চাৎদিকে আসিয়া গুরুবুক সিংহকে এক প্রচণ্ড লাথি মারিলেন ও সেই সঙ্গে গুরুবুক সিংহের প্রতি বিমানবাহিনীর নিজস্ব চোখা চোখা গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। লাথি খাইয়া গুরুবুক সিংহ উল্টাইয়া পড়িলেন। বোধ হয় ভাবিলেন বিমান ক্রাশ করিয়া মাটিতে পড়িয়াছে। লাথি মারার পর ভরদেও তাঁহার আসনে আসিয়া বসিয়া বেতার-যন্ত্রী গৌতমকে বলিলেন "ঐ গাধাটাকে কেবিনে ফেলিয়া দিয়া এস।" এত কাণ্ডের মধ্যেও পাঃ অঃ ভরদেওকে সব সময় শান্তই মনে হইতেছিল। কখনও মনে হয় নাই যে তিনি অশান্ত বা ভীত হইয়াছেন। এবার খুব নীচু দিয়া আমরা উড়িতে উড়িতে চলিলাম, যদি কোন চেনা-জানা জায়গা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশেষে হইলও তাহাই। ব্যারাকপুর রেল ষ্টেশনের চেউখেলান ছাত নজরে পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রবল বায়ুপাত সত্ত্বেও দমদম বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করা গেল।

বিয়াল্লিশ সনের শেষের দিকে এমনই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে একদিন পাঃ অঃ ভরদেও বিমাট হাড়সন বম্বার লইয়া বর্মায় বোমা ফেলিতে গিয়াছিলেন। পাঁচঘন্টা উড়িয়া আসিবার পর তিনি যখন উড়িষ্যার উপকূলে, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। বিমানে তখনও প্রায় পাচঘন্টা উড়িয়া বেড়াইবার মত পেট্রল ছিল। কিন্তু একে রাত্রির আঁধার তাহার উপর প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি। শেষ পর্যান্ত তিনি কটকের নিকট অবস্থিত চারঘাটিয়া বিমানবন্দর খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন পেট্রল শেষ হইল, তখন ধীরে ধীরে বিমান ঐ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এক না জানা, না দেখিতে পাওয়া যায় এমন যায়গায় চালক অবতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিমান মাটির স্পর্শ পায় উড়িষ্যার এক ধানক্ষেতে ; নিমেষেই উল্টাইয়া যায়—শুধু তাহাই নয়, কাদামাটিতে বিমান প্রায় অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। বোধ হয় কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ দশ বার ফুট মাটির গহ্বর হইতে পাঃ অঃ ভরদেও বাহির হইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। পরের দিন আমরা ধানক্ষেতে যাইয়া বিমান তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইলাম।

তখন কুড়ান দিয়া বিমান কাটিয়া দেহগুলি বিমান হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম। গুজবুজ সিংহ এখনও বহাল তবিয়তে আছেন। সিংহ হইয়াই নয়া দিল্লীতে এক সেক্রেটারিয়েটের প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। বছর কয়েক পূর্ব্বেও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

এরপর কলিকাতার বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষার বহড়া সুরু হইল। প্রথম প্রথম সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে আমাদের একখানা ওয়াপিটী বিমান দূরে উড়িয়া যাইত ও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া কলিকাতার উপর ফিরিয়া আসিত। আমার মনর যাহাতে কেহ এঞ্জিনের আওয়াজ শুনিতে না পায়, সেইভাবে এঞ্জিন খুব আস্তে চালু বা প্রায় বন্ধ করিয়া, পূর্ব্বে না-জানান কোন দিক হইতে আসিত। আমাদের শত্রুবিমান-নজরদার দল তাহাদের এই অতর্কিত আগমন সময়মত জানিবার চেষ্টায় থাকিত। অনেক সময়ই বিমান একেবারে মাথার উপর না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের আগমন কেহই জানিত না। কিছুদিনের মধ্যেই করেকবার উচিত সময় মতই অর্থাৎ বিমান মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার পর তাহাদের আগমন জানা গেল, ও তখন সহরের আলো নির্ব্বাপণ পর্ব্বের ব্যবস্থা করা হইল। এখন এয়ার স্পটারদের সাহায্যের জন্য বিমান চিনিবার লাল সবুজ আলো জ্বালাইয়া আসা হইত।

একবার হকার হরভাক্স বিমান লইয়া রয়াল এয়ার ফোর্সের বৈমানিকরা আমাদের আক্রমণকারী ওয়াপিটি বিমান ধ্বংস করিবার বহড়া দিতে আসিল। ওয়াপিটির তুলনায় হকার অডাক্স বিমানের গতিবেগ অনেক বেশী। ওয়াপিটির গতিবেগ ঘন্টায় আশী মাইল আর হকার অডাক্সের প্রায় একশত সত্তর মাইল। পরের দিন দৈনিক কাগজে খবর বাহির হইল যে "গত রাত্রির বহড়াতে আক্রমণকারী সবগুলি বিমানই কলিকাতায় পৌঁছাইবার বহু-পূর্ব্বেই ধ্বংস করা হইয়াছে।" কিন্তু মজা হইল, আমাদের মেসে রাত্রির আহারের সময়। গোরা বৈমানিকদের অন্সরে কিন্তু স্পিরিট প্রবেশ করিবার পর তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের দুইটি বিমান কোনদিকে লুকাইয়া উড়িতেছিল? অন্য সবগুলিই ত আমরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি ও গুলি মারিয়া ধ্বংস করিয়াছি।" তাঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না যে, সেইদিন রাত্রে আমাদের মোটে দুইটিই হোয়াট-এ-পিটি (ওয়া-পিটির কুলিন নাম) বিমান উড়ান হইয়াছিল ও তাহারা কলিকাতার পূর্ব্বে উপকণ্ঠে যে লবণাক্ত জলাভূমি আছে, তাহার উপর সামান্য উচ্চে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। সেই দিকে রয়াল এয়ার ফোর্সের কোন বিমানই আসে নাই। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বহড়ার শেষে সব গোলমাল মিটিয়া নিরাপত্তা স্থাপনের সংকেতের ঘোষণা বেতারে পাইয়া, করেক মিনিটের মধ্যেই আমাদের বিমান দুইটি ফিরিয়া আসে ও নামিয়া পড়ে।

আমাদের কমাণ্ডিং অফিসার ফ্ল্যা: লে: চৌধুরীর রসিকতার একটি গল্প এখানে বলা হয়ত অসঙ্গত হইবে না। সেই সময় কলিকাতা ও পূর্ব্ব ভারত আক্রমণ হইতে রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ ও ব্যবস্থা করার জন্য তিনটি বাহিনীর অর্থাৎ স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান

বাহিনীর প্রধানদের লইয়া কলিকাতায় একটি বৈঠক হয়। স্থলবাহিনীর কর্তাই এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কারণ এই সম্পূর্ণ ভূখণ্ড আক্রমণ হইতে রক্ষাকার্যে তিনি এই তিন বাহিনীর প্রধানরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিমানবাহিনীর কোন গোরা সিনিয়র অফিসার তখন কলিকাতায় না থাকাতে ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী বিমানবাহিনীর হইয়া এই বৈঠকে যান। এবং বৈঠকে তিনিই মাত্র এদেশীয় ছিলেন। সভায় প্রধান মহাশয় বৈঠকে আগত বিভিন্ন বাহিনীর কর্তাদের পূর্বভারতকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায় বিশদভাবে বিবেচনা করিতে বলিলেন। এবং যদি সত্যই এই দেশ আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে কি উপায়ে ঐ দেশ রক্ষা করা সম্ভব হইবে সেই বিষয় চিন্তা করিয়া প্রকৃষ্ট উপায় নির্দেশ করিতে বলিলেন। অনেক আলোচনা ও কথা হইতে লাগিল। কিন্তু ফ্ল্যা: লে: চৌধুরীকে সব আলোচনাই যেন খেলাচ্ছলে করিতে দেখা গেল। এই ব্যাপার প্রধান মহাশয়ের দৃষ্টিতে আসিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ফ্ল্যা: লে: চৌধুরীকে সরাসরি প্রশ্ন করিলেন, বিমানবাহিনী এই আক্রমণ রোধ করিবার জন্য কি করিতে পারিবে? ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী অনুনয় করিয়া পাল্টা প্রশ্নে জানিতে চাহিলেন কবে তক এই আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা আছে? আক্রমণের দিন তারিখ কেন জানিতে চাহেন এই কথা প্রধান মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে, ফ্ল্যা: লে: চৌধুরী বলিলেন, "যে কয়টা পুরাতন বিমান দমদমায় আছে, সেগুলি জাপানী 'জিরো ফাইটার' বিমানের তুলনায় খেলনা; সেই বিমানগুলি দেশরক্ষার যুদ্ধে কোন কাজেই লাগিবে না সেইজন্য যদি আক্রমণের দিনক্ষণ পূর্বেই জানিতে পারা যায়, তবে সেই সময় কয়েকদিনের সপ্তাহান্তের ছুটি লইয়া দিল্লী বেড়াইয়া আসিবেন।" যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও প্রধান মহাশয় এই উত্তরে চটিলেন না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই ফল ভালই হইল। আটালান্টা বিমানগুলি স্থানান্তর করার হুকুম আসিল ও আটালান্টার বদলে ব্রিষ্টল কম্পানীর ছোটনাক ব্লেনহীম বম্বার পাঁচটি পাওয়া গেল। ব্লেনহীম তখন ইংলণ্ডেও প্রথম শ্রেণীর বিমান বলিয়া গণ্য হইত।

আমরা যাহাকে বলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলাম এই ছোটনাক ব্লেনহীম বিমান সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিবার জন্য। এঞ্জিনীয়াররা সব কলকব্জা খুলিয়া লাগাইয়া, মেরামত করিয়া যাহাতে বিমানে কোন খুঁতই না থাকে তার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আর বৈমানিকরা দিনে রাত্রে বিমান উড়াইতে লাগিল—তখন ঝড়বৃষ্টিই হউক বা দিন পরিষ্কারই থাকুক। কিম্বা রাত্রে চাঁদের আলো থাকুক বা অন্ধকারই হউক। ভারতে তখন মোট পাঁচটি ব্লেনহীম ছিল, আর সে পাঁচটি আমাদেরই নিকট।

এই বিমানে মোট তিনজনের আসন ছিল, বিমান চালক, নেভিগেটর ও বেতারবার্তা-পরিচালক। বেতারবার্তা-চালককে পশ্চাৎদিকের চারটি ব্রাউনিং মেশিন গানও চালাইতে হইত। বেতারবার্তা-চালকের আসন ছিল বিমানের খোলের মধ্যখান, কিছুটা নীচের দিকে। তাহার আসনে যাইতে হইলে সরু গলির মধ্য দিয়া কিছুটা দূর পর্যন্ত যাইতে হইত। তাহাতে যথেষ্ট কসরৎ ও পরিশ্রম ছিল।

এই বিমান পাওয়ার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত রয়াল এয়ার ফোর্সের বৈমানিকরাও আমাদের ঈর্ষা করিত ও প্রকাশ্যেই বলিত, "ও! ভারতীয়রা তিন মাসের মধ্যেই ওগুলি সব নাশ করিয়া ফেলিবে।" কিন্তু তিনমাসের মধ্যেই যখন এই বিমান উড়াইবার কৌশল আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিল ও বিমানের সংখ্যা পাঁচটি হইতে কমিয়া চারটি হইল না, তখন যেন সকলেই আমাদের একটু সমীহ করিত। কোথাও, যেখানে তিন বাহিনীর (Three Services) লোকজন আছে বা যাওয়া-আসা করে, সেখানে একবার তিন নম্বর ফ্লাইটের নাম করিলেই গোলমাল সব মিটিয়া পথ সুগম হইয়া যাইত।

নূতন বিমান পাওয়ার ও উড়াইবার আনন্দে ও গর্ব্বে তখন কখনও মনে আসে নাই যে আকাশযুদ্ধে যদি এই বিমান কখন ভূপতিত হয়, তাহা হইতে বিমানচালক ও নেভিগেটর হয়ত বিমান পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইতে সক্ষম হইবে ও প্যারাস্যুট সহকারে মাটিতে নামিতেও পারিবে, কিন্তু বেতারচালকের পক্ষে এই সব গুলি পার হইয়া আসিয়া বিমান পরিত্যাগ করা মোটেই সম্ভব হইবে না, তাহাকে বিমানের সাথেই চূর্ণচ্যাপ্টা হইতে হইবে।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু একটি বিমান আমাদের আসল যুদ্ধে যাওয়ার পূর্ব্বেই হারাইতে হয়। ফ্ল্যাঃ লেঃ চৌধুরী ও ইষ্টার্ন জামসেদপুরের টাটা লোহার কারখানা বিমান আক্রমণ রোধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হন। সরেজমিনে অবস্থা দেখার জন্য, তাঁহারা একটি ট্রেনহীন বিমানে যাইয়া জামসেদপুর বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। রানওয়ে তখনকার দিনে খুব ছোট ছিল, আর মাঠ লাল রংয়ের মোরাম কাঁকর-পাথরে পূর্ণ ছিল। জামসেদপুরেই লোহার কারখানার নিজস্ব কয়েকটা ছোট বিমান থাকিত। সেগুলি এই রানওয়ে হইতে অবলীলায় উড়িয়া যাইতে ও নামিতে পারিত। ট্রেনহীনের মত বেশী ওজনের ও গতিবেগের বিমানের পক্ষে যে সেই রানওয়েতে অবতরণের বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে সে কথা কাহারও মনে আসে নাই। যাহা হউক, অবতরণের পর মুহূর্ত্তেই ফ্ল্যাঃ লেঃ চৌধুরী বুঝিতে পারেন যে সোজা গেলে, রানওয়ের উপর এই বিমান থামান যাইবে না। কারণ অবতরণের পর এর গতিবেগ ঘন্টায় আশি নব্বুই মাইল। রানওয়ের শেষে আসিয়া তিনি বিমানকে দক্ষিণ দিকে ঘুরাইবার চেষ্টা করেন, তখনও বিমানের গতিবেগ ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইলের উর্দ্ধে। এত বেগের সময় জোর করিয়া বিমান ঘুরাইতে চেষ্টা করায় বিমানের দক্ষিণদিকের পা মুচড়াইয়া যায় ও ডানার প্রান্ত মাটিতে পড়িয়া বিমানের গতির অবসান হয়। বিমানের এইভাবে অচল অবস্থা হওয়ার কথা টেলিফোনযোগে পাওয়ার পর সাতজন সঙ্গী লইয়া, সেইদিনই বৈকাল হাওড়া হইতে বোম্বাই মেলে জামসেদপুর অভিমুখে যাত্রা করা গেল। পরের দিন, বিমানের অবস্থা ভাল করিয়া পরীক্ষার পর স্থির করা হইল যে জামসেদপুরে ট্রেনহীনের মত বড় বিমান সম্পূর্ণ মেরামত করা সম্ভব হইবে না। তখন এলাহাবাদে বড় বড় জঙ্গী বিমান মেরামতের জন্য কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আনা হইয়াছে ও কিছু কিছু মেরামতের কাজও হইতেছিল। আমাদের রিপোর্ট পাঠাইবার পর দিল্লী হইতে নির্দ্দেশ

পাওয়া গেল বিমান খুলিয়া ফেলিতে হইবে ও বিমানের অংশগুলি রেলওয়ের মালগাড়ীতে এলাহাবাদ বিমান মেরামতের কারখানায় পাঠাইতে হইবে। প্রায় পনের দিনে বিমানের অংশগুলি খুলিয়া ফেলিয়া খোলা মালগাড়ীতে এলাহাবাদ পাঠান গেল। বিমান বাহিনীকে আশ্রয় দিয়া রাখিবার কোন স্থান জামসেদপুরে ছিল না। আর স্থলবাহিনীর বিবেচনায় আমাদের মান খুব উচ্চস্তরের হওয়ায়, স্থলবাহিনীর কর্তারা, জামসেদপুরের সেরা হোটেলে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

আমার খুব সুবিধা হইল। জামসেদপুর স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলাম। দাদা ওখানকার লোহার কারখানায় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কাজেই কাজকর্ম্ম শেষ হইলে বৈকালে একেবারে বাড়ী চলিয়া যাইতাম ও সকালে পুনরায় হোটেলে ফিরিয়া আসিতাম। দুপুরের আহার হোটেলে ও রাত্রে বাড়ীতে। ছুটি বিনা বাড়ীতে আসা গেছে, কাজেই বাড়ীতে প্রত্যহ রাত্রে ভোজন বেশ ভালই হইতেছিল। একদিন রাত্রে দাদার সাথে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিবার পর দাদা আমাকে একটা রূপার তৈয়ারী আংটি দিলেন ও সব সময় আঙ্গুলে পড়িয়া রাখিতে বলিলেন। আংটিতে একটা লাল পাথর বসান ছিল। আর বলিলেন এই আংটি মন্ত্রপূত; আকস্মিক বিপদ হইতে আমাকে বাঁচাইবে। আঙ্গুলে পরিয়া দেখিলাম, বেশ পছন্দই হইল।

হোটেল হইতে সকালে ও দুপুরের বিমানবন্দরে যাইবার জন্যও দুপুরে ও বৈকালে বিমানবন্দর হইতে ফিরিয়া আসিবার জন্য স্থলবাহিনী আমাদের জন্য একটি ছোট পুরাতন বাস ঠিক করিয়া দিয়াছিল। চালক ছিল স্থলবাহিনীর একজন সাধারণ সৈনিক। প্রত্যহই যাতায়াতের সময় বিমানবাহিনীর নানাকথা সে আমাদের কাছে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইত। একটা প্রশ্ন সে নানাভাবে আমাদের প্রত্যহই করিত—মোটর গাড়ীর চালক হইয়া বিমানচালক হইতে পারিবে কিনা? তাহার মতে বিমান চালনা খুব সহজ হওয়াই সম্ভব, কারণ আকাশে কোন রাস্তা ত নাই, যেখান দিয়া খুসী বিমান চালাইয়া যাওয়া যাইবে। আর রাস্তায়, মোটর চালনা কত কঠিন—প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই সাবধান থাকিতে হয়, না হইলে কাহার উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইবে ঠিক কি? গতিবেগ বেশী হইলে যে সে ভয় পায় না, সেকথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইত না, বাসের গতিবেগ বাড়াইয়া দেখাইবার চেষ্টাও করিত। পুরাতন বাসের কাঠামোর কথা চিন্তা করিয়া আমরা কখনও তাহাকে বাসের গতিবেগ পনের কুড়ি মাইলের বেশী করিতে দিতাম না। একদিন কিন্তু দুপুরের আহারের পর বিমানবন্দরে আসিবার সময় আমরা গল্পে ব্যস্ত ছিলাম। তখন বিমানের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই মালগাড়ীতে বোঝাই করাও শেষ হইবে। আমাদের এই মনোভাব হইয়া গল্প করার অবসরে বিমানবন্দরের ভিতরে আসিয়া সে তাহার মোটর চালনার অন্তিম কসরৎ দেখাইল। বড় রাস্তা হইতে বিমানবন্দরের মাঠ ও রাণওয়ে কিছু নিম্নে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিমানবন্দরের মাঠ মোরাম অর্থাৎ লাল ছোট পাথর কাঁকরে পূর্ণ। বাসের গতিবেগ যতদূর

সম্ভব বাড়াইয়া বিমানের ন্যায় সে বাসের মোড় ঘুরাইল। আর বাগও সে গতিবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বার তিনেক উলটাইয়া পালটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কাত হইয়া পড়িয়া রহিল। চাকা কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়াই চলিল। চালক লইয়া নয়জনের মধ্যে কেবল একজনের অবস্থা অক্ষত রহিল। মাথায় আমার মোটা সোলার টুপি ছিল। প্রথম উলটানর সময় গতিবেগ আমাকে বাসের ছাতের প্লাইউড্ ভেদ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে ও ভূতলে অর্থাৎ মোরাম কাঁকর-পাথরের উপর আমার পতন হইয়াছে মস্তকোপরি। এই বিপদের সময় সোলার টুপিই আমার কাষ্ঠকল্প নীরস মস্তক দুবার বাঁচাইয়াছে। প্রথমবার বাসের প্লাইউড্ নির্ম্মিত ছাত ভেদ করিবার সময় ও দ্বিতীয়বার যখন কাঁকর পাথর ভরা মাঠে মাথার উপর পড়িলাম। সেইজন্য বোধহয়, এখনও নিশ্চল কেদারায় টুপি মাথায় বসিয়া থাকি; আর এরজন্য অবচেতন মনকে দায়ী করি।

বাসচালক সৈনিকের আর বিমানচালক হইবার অবকাশ এ জীবনে মিলিল না। হাঁসপাতালে নীত হইবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যে স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই স্থানেই চলিয়া গেল। ষ্টীয়ারিং হুইল তাহার পাঁজরার হাড় সব কয়টিই প্রায় চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। আর আমাদের অন্য সাতজনের সকলকেই প্রায় দুই তিন সপ্তাহ করিয়া জামসেদপুর হাঁসপাতালে থাকিতে হইল। তাহাদের মধ্যে দিল্লীর ফারুকী ও হুগলীর কোলের আঘাত বেশী। দুইজনেরই আঘাত ছিল কোমরে শিরদাঁড়ার হাড়ে।

সহরে এই বিপদের কথা রাষ্ট্র হইতে বেশী সময় লাগে নাই। দাদা হাঁসপাতালে টেলিফোন করিয়া কোন পাত্তা না পাওয়াতে শীঘ্র বিমানবন্দরে আসিয়া আমাকে অক্ষত অবস্থায় দেখিলেন ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের কাজ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। লোহার কারখানার বড় ক্রেনগাড়ী লইয়া বিমানের বড় অংশগুলি নরা খোলা মালগাড়ীতে উঠাইতে বিলম্ব হইল না। তাহার পর পুনরায় দমদম বিমানঘাঁটিতে ফিরিয়া আসা গেল।

বর্ম্মার যুদ্ধে ব্লেনহীম বিমানের সংখ্যা কখনও আর আমাদের পাঁচ হয় নাই। যদিও ছোটনাক বদল হইয়া আরও দ্রুততর বিমান বড়নাক ব্লেনহীম আসিয়াছে। তখনকার দিনের জাপানী জিরো বিমানের সমকক্ষ আর অন্য কোন বিমান আমাদের ছিল না। গতিবেগ এই দুই বিমানের প্রায় সমান ছিল। কিন্তু জিরো খুব অল্প পরিসর স্থানেই ঘুরিতে পারিত। ব্লেনহীমকে ঘুরিতে হইলে লম্বা দৌড়ের প্রয়োজন হইত। সেইজন্য অনেক সময়ই জিরো বিমান শীঘ্র ঘুরিয়া ব্লেনহীমকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিত।

মধ্য ওজনের বোমা নিক্ষেপকারী বিমান হিসাবেই ব্লেনহীম বম্বার বিমান তৈয়ারী হয় কিন্তু বর্ম্মার যুদ্ধে প্রমাণ হইল যে এই প্রয়োজনকালে এই বিমানকে ফাইটার হিসাবেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

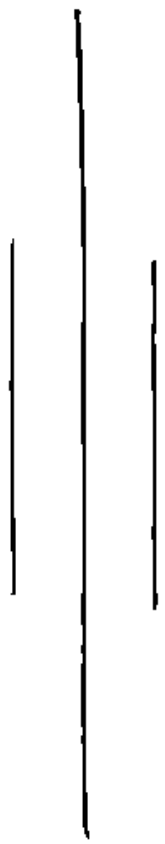

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

It's *Spencer's*

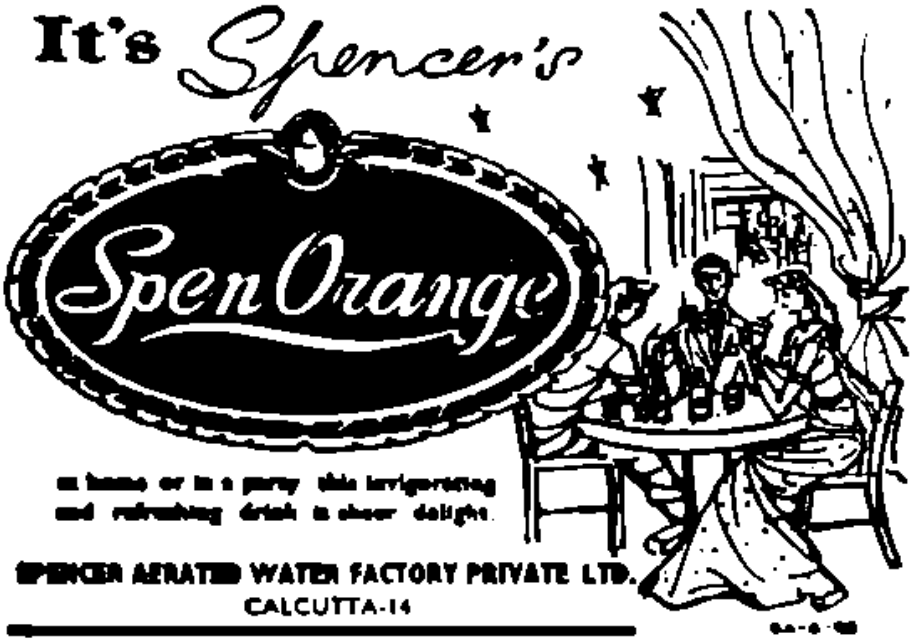

at home or in a party this invigorating and refreshing drink is sheer delight

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14

Troubled by insects ??

If so, please do not hesitate to make use of our up-to-date scientific and efficient servicing arrangements by specially trained staff for completely disinfecting your premises with :

" GAMMEXANE " FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

"We do not belong to the past dawns,
but to the noons of the future."

ZENITH RUBBER WORKS

INDIA'S FOREMOST MANUFACTURERS
OF
HIGH GRADE RUBBER SOLES & HEELS

Office & Factory :— **15, South Tangra Road,**
CALCUTTA-15

Telegrams: **'Vessel' Cal**
Codes { Scotts 10th. Ed.,
A. B. C. 5th. Ed.,
Bentley's

Telephones { Office : 23-1393
Dock Office:
Residence: { 55-6464
55-3724
55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS
3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Under Distinguished Patronage of:
LEONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO., LTD.
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য বই

গান্ধী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড (১৮৯৪—৯৬) দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৬—৯৭)

মহাত্মা গান্ধীর কর্মজীবনের ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে হ'লে এই রচনাবলী অপরিহার্য। মূল রচনার সহজ সরল সুন্দর বঙ্গানুবাদ।

প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা

বাংলার উৎসব

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

১.২৫

বাংলার শিকারপ্রাণী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

৩.০০

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য

রচনা নৃত্যবিদ্ শ্রীমণি বর্ধন

বাংলার লোকসংগীত ও লোকনৃত্য সম্পর্কে এ-ধরণের গবেষণামূলক বই আগে কখনও বের হয়নি।

মূল্য

স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্র

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
হেস্টিংস্ ষ্ট্রীট,
ক লি কা তা—১

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা

প্রকাশন শাখা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড,
ক লি কা তা—২৭

WB (I & P. R.) 4651/65

DESIGNED

ET
RT
:N
NEERING
UREMENT
TRUCTION
:CTION
L OPERATION

The Kuljian Corporation of India is a service organisation specialising in consulting engineering. ■ In its fully—equipped office in Calcutta, the Corporation has assembled a well-knit team of about a hundred trained Indian and American construction engineers and draughtsmen all qualified by experience in project construction. ■ Backed by the experience of a decade in power engineering in India and proud of the tradition of its American collaborators whose famous name it bears, the Corporation welcomes exacting assignments of all types, in any part of India, any time. ■ From feasibility report to initial operation is the scope of Kuljian service; from power plants to all-type public works is the range of Kuljian operation.

The **Kuljian** *Corporation*
(INDIA) PVT. LTD.

ENGINEERS CONSTRUCTORS
24-B, Park Street, Calcutta 16

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

OR SERVICE

ফোন -
৩৪-৪৬৩৮

অলঙ্কার শিল্পে প্রগতির প্রতীক

সেনকো জুয়েলারী ষ্টোর্স

• প্রাইভেট লিমিটেড •

১৮৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের

★ কবির্মনীষী

★ রবীন্দ্রনাথ

(রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক)

GRAM :

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA-33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

বর্ষ—২৫ সংখ্যা—৪

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৫)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

মা কে

শ্রীঅরবিন্দ

উপর হতে অনুমতি আর নীচে হতে আবাহন, এ দুয়ের মিলন ঘটায় যে শক্তি তাই হল ভাগবতী মাতার সত্তা ও শক্তি।

মায়ের দিকে যে ফিরেছে, সে-ই আমার যোগ সাধনা করে।

পথটি মরুভূমি নয়, তুমি একলাও নয়, মা রয়েছেন তোমার সঙ্গে।

মাকে ধরলেই সব জিনিষ ধরা যায়।

মা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যেন, তোমার আচরণ হবে সর্ব্বদা সেই অনুপাতে —বাস্তবিকই ত' তিনি সর্ব্বদা উপস্থিত রয়েছেন।

অভ্যাসের দ্বারাই লাভ হয় মায়ের নিত্য সান্নিধ্য।

তোমার মনকে তুমি যদি অনুসরণ করে চল, সে মন কখনও মাকে চিনবে না, তিনি স্বয়ং তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'লেও।

জীব যায় জীব-জননীর কাছে তার সকল বাসনা সকল দুঃখ-কষ্ট নিয়ে; ভাগবতী জননীও তাই চান, এই ভাবেই তিনি ঢেলে দিতে পারেন তাঁর হৃদয়ের পূর্ণ ভালবাসা।

আমরা যাঁকে মা বলে ভালবাসি, পূজা করি, তিনি হলেন সকল সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী ভাগবতী চিন্ময়ী শক্তি।

মা কেবল ঊর্দ্ধ হতে শাসন করেন না, তিনি এই নিম্নতর ত্রিধা বিশ্বের মধ্যেও অবতরণ করেন।

মায়ের চেতনা আর আমার চেতনা একই, দুয়ের মধ্যে একই ভাগবত চেতনা, কারণ বিশ্ব-লীলার জন্য তা প্রয়োজন।

তাঁর জ্ঞান তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে, তাঁর চেতনা ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব হয় না।

মা হলেন ভগবানের চেতনা ও শক্তি অথবা বলা যেতে পারে মা হলেন চিৎ-শক্তিময় ভগবান।

মায়ের শরীর ধারণ হল পার্থিব চেতনার পক্ষে সুযোগ যাতে অতিমানসকে সে গ্রহণ করতে পারে—এ কাজটি সম্ভব করবার জন্যে তার যাতে প্রয়োজনীয় রূপান্তর সাধন হয়।

মা শরীর ধারণ করেছেন পৃথিবীতে একটা কাজ করবার জন্যে, জড় জগতের পরিবর্ত্তন তার অন্তর্গত।

এই জগতের মধ্যে মা নিয়ে আসেন একটা উর্দ্ধতন সদ্‌বস্তু যার অভাবে সবই হয় অজ্ঞান আর মিথ্যা।

বিশ্বকর্ম্মে মা কাজ করেন বিশ্বের নিয়ম অনুসারে। তাঁর স্থূল শরীর ক্রিয়ার রয়েছে নিত্য ভগবৎ প্রসাদের সুযোগ।

মায়ের সত্তা বহুবিধ—যেটি সম্মুখে এসে দাঁড়ায় সেই অনুসারে তাঁর রূপ বিভিন্ন।

স্থূলে যে সিদ্ধি হবে তার উপযোগী আধার নিয়েই মা এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

সন্তানের জন্য মায়ের ভালবাসার সীমা নেই। তাদের সকল ত্রুটিই তিনি অক্লান্তভাবে সহ্য করে চলেন। মানুষী প্রকৃতির ক্ষুণ্নতা সে ভালবাসাকে ক্ষুণ্ন করে না।

বিশ্বাতীত ভাব মায়ের একটি দিক মাত্র।

আধ্যাত্মিক আলো যখন থাকে তখনই মায়ের আবির্ভাব হয় আর তাঁর কর্ম্ম সত্যের শক্তি সব নামিয়ে আনে।

মায়ের সন্তানদের মধ্যে তারাই মায়ের সবচেয়ে নিকটে যারা তাঁর দিকে নিজেদের খুলে ধরেছে, যারা তাঁর আন্তর-সত্তার সন্নিকটে, তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত—তারা নয় যারা কেবল তাঁর দেহের বাহ্য সান্নিধ্যে।

সূর্য্য আর আলো সহায় হতে পারে, সহায় হয়, যদি তা সত্যকার আলো আর সত্যকার সূর্য্য হয়, তবুও তারা মায়ের শক্তির স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

মা রয়েছেন সর্ব্বত্র, তাঁর ক্রিয়া সর্ব্বত্র তাঁর আপন বিশ্বজ্ঞানের আশ্রয়ে।

যা জানা দরকার তা তিনি জানেন, কখনও তাঁর অন্তর-সত্তা দিয়ে কখনও বা বাহ্য মন দিয়েই।

আপন বিশ্ব সত্তায় তাঁর সকল জ্ঞানই রয়েছে তবে কাজের জন্যে যা দরকার তাই তিনি সম্মুখে এনে ধরেন।

বাহ্য সংবাদ যা কিছু তিনি পান তা তাঁর আন্তর-জ্ঞানকে স্ফুটতর করে ধরে মাত্র।

মায়ের ইচ্ছা অনুসারে মায়ের করুণা নেমে আসে। জীব সে করুণা গ্রহণ করতে পারে, প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

মায়ের দৈহিক সান্নিধ্য হ'ল একটা নিরন্তর চাপ, যাতে ঘটে ক্রমগতি, ক্রমোন্নতি।

অন্তরে মায়ের সম্মুখে সব খুলে ধর, সবচেয়ে শ্রেয় যা তার জন্যে তাঁর আলো যেন কাজ করতে পারে

সব করতে হবে মায়ের শক্তির ক্রিয়াফলে আর তার সহায় হবে তোমার আস্পৃহা, তোমার নিষ্ঠা, তোমার আত্মসমর্পণ।

অন্তঃপুরুষ যদি তোমার দেখা দেয়, সে তোমাকে বলবে না তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে, বলবে মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

মায়ের শক্তি কেবল ঊর্দ্ধে, সত্তার শেষ শিখরে শুধু নয়, তা রয়েছে তোমার সঙ্গে, তোমার কাছেই ; কাজ করতে প্রস্তুত তোমার প্রকৃতি সুযোগ দিলেই।

মাকে স্মরণ করবে—স্থূলতঃ দূরে থাকলেও, অনুভব করতে চেষ্টা করবে তোমার সঙ্গেই তিনি রয়েছেন, আর তোমার আন্তরসত্তা তাঁর ইচ্ছা বলে যা দেখিয়ে দেয় সেই অনুসারে কাজ করে চলবে।

নিজে যা করা যায় না, মায়ের শক্তিকে ডেকে নিয়ে এলে তা করা যায়।

মায়ের ক্রিয়ার দিকে যত নিজেকে খুলে ধরবে, বাধা-বিঘ্নের মীমাংসা তত সহজে হয়ে যাবে, যথাযথ কাজও করা হবে।

মা কখনও মনে পোষণ করেন না তোমার ভাবী বাধা-বিঘ্ন স্খলন-পতন বিপদ-আপদ। তাঁর চেতনা নিবিষ্ট করেন ভালবাসার উপর, আলোর উপর,—বাধা-বিঘ্ন, পতন-স্খলনের উপর নয়।

যারা ঋজু অকপট নয় তারা মায়ের সহায়ের সুযোগ নিতে পারে না। তারা নিজেরাই সরিয়ে দেয় ও-জিনিষটিকে।

মায়ের শক্তি বা তোমার অন্তঃপুরুষ কাজ করতে পারে, কিন্তু কেবল তখনই যখন সত্তার সম্মতি রয়েছে তাতে।*

.....

* অনুবাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

কঠোপনিষৎ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

বাজশ্রবা কামনা করলেন সর্ব্বস্ব প্রদান করবেন। নচিকেতা নামে তাঁর এক পুত্র ছিল।

যখন দক্ষিণা বিতরণ চলছিল, তা দেখে বালকের অন্তর শ্রদ্ধায় ভরে উঠল, সে চিন্তা করল :

যাদের অন্তিম জলবিন্দু পান হয়েছে, যাদের অন্তিম তৃণগাছটি ভুক্ত হয়েছে, অন্তিম দুগ্ধকণা যাদের দোহন করা হয়েছে, যারা ইন্দ্রিয়হারা, এমন গাভী দান করে যে ব্যক্তি, তার গতি হল নিরানন্দলোকে।

পিতাকে বালক তাই জিজ্ঞাসা করল, "ভগবন্ তুমি আমাকে দান করবে কার কাছে?"

পিতৃদেব অবোধ পুত্রের অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, চুপ করে রইলেন। অবুঝ বালক জিজ্ঞাসা করল দুবার, তিনবার, রোষভরে পিতৃদেব শেষে বললেন "তোকে দেব মৃত্যুর কাছে।"

সরলচিত্ত বালক ভাবল, "অনেকের মধ্যে আমার স্থান প্রথমেই, অনেকের সঙ্গে আমি আবার মধ্যম, আমি ত' অধম নই। সুতরাং পিতৃদেব বললেন যে কথা তার অর্থ নিশ্চয় আছে, যমদেবের কাছে আমার করণীয় কিছু থাকবে।"

বালক আরো ভেবে চলল মৃত্যুর বিষয়ে "দেখ চেয়ে আগে ছিল যারা তাদের কি হয়েছে, পরে যারা এসেছে তাদেরও বা কি হয়েছে, মর্ত্যজীব শস্যের মত পাকে আর ঝরে যায়, পুনরায় শস্যের মত আবার জন্মগ্রহণ করে।"

এ এক রহস্য, এ রহস্য এক যমদেবই উদ্‌ঘাটন করতে পারেন। তাই নচিকেতা চলল যমের গৃহে, যমের দরজায় গিয়ে সে বসল; ধর্ণা দিয়ে তিনরাত্রি কাটাল যমের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে।

বালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদ যেমন ভগবানের সাক্ষাৎ পেয়েছিল তাদের সরল বিশ্বাসের ফলে, সরল কিন্তু সবলচিত্ত নচিকেতাও যমের ঘরে পৌঁছেছিল ও তার সাক্ষাৎ পেয়েছিল।

যমের পার্শ্বচরেরা যমকে গিয়ে খবর দিল, দেখ এক ব্রাহ্মণ বালক তোমার সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য তিন দিন ধরে রয়েছে দরজার গোড়ায়। "একে ব্রাহ্মণ তারপর অতিথি, এ ত' অগ্নিতুল্য। পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে এসে তার অভ্যর্থনা কর। জান ত', ব্রাহ্মণ কারও গৃহে গিয়ে অভুক্ত থাকলে সে গৃহীর সকল পুণ্য ক্ষয় হয়ে যায়, তার ঐহিক বিপত্তিও ঘটে বিপুল পরিমাণে"।

ব্রাহ্মণ অর্থে আমরা বুঝব গীতা ব্রাহ্মণের যে লক্ষণ দিয়েছে। ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্ম-পরায়ণ, অধ্যাত্মের সেবক ও সাধক। তখনকার সমাজের একটা বিশেষ কর্ত্তব্যই ছিল সমাজের এই শ্রেষ্ঠ শ্রেণীকে পোষণ করা, সমাদর করা, কারণ সমাজের মর্য্যাদা ও মূল্য নির্ভর করে তার বাহ্য শক্তি বা সম্পদের উপর নয়, তার অন্তরের ঋদ্ধির উপর।

যম তখন কিছু ব্যস্ত ত্রস্ত হয়ে দেখা দিলেন—হয়ত বা তিনি একটু পরীক্ষা করে দেখছিলেন নচিকেতার আন্তরিকতাকে। নচিকেতাকে তিনি সমাদর করে আসনে বসালেন এবং পূর্ব্বকৃত ত্রুটির স্খালনের জন্য বিনয়সহকারে বললেন :—

"ব্রাহ্মণ, অতিথি তুমি, তিনদিন এখানে অভুক্ত থেকে অপেক্ষা করছ, তোমাকে নমস্কার জানাই, আমার মঙ্গল হোক (অর্থাৎ আধুনিক ভাষায়, ক্ষমা কর আমাকে অনুগ্রহ করে) যমদেব দারুণ মানুষী ভাব দেখিয়ে বলতে চাইলেন, মর্ত্য হলেও তিনি অশিক্ষিত অসভ্য ব্যক্তি নন। যমদেব বলে চললেন, "নচিকেতা, তিনরাত্রি তুমি এখানে অপেক্ষা করেছ, তিনটি বর তবে তুমি আমার কাছে থেকে চেয়ে নাও।" নচিকেতাও তেমনি দ্বিরুক্তি না করে, শালীনতা সহকারে স্বীকার করল এবং চাইল তার প্রথম বর।

"আমার পিতৃদেব আমার অদর্শনে নিশ্চয় বিচলিত হয়ে পড়েছেন, মনে করেছেন আমি মৃত্যুকবলিত হয়ে গিয়েছি, আর ফিরব না। তুমি তাঁর মনকে শান্ত করে দাও, আমার উপর তাঁর যে অসন্তুষ্টি এসেছিল তা দূর করে দাও আর আমি যখন তোমার গৃহ থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে যাব তিনি যেন আমাকে চিনতে পারেন এবং সাদরে গ্রহণ করেন। যমদেব, এই হ'ল তবে আমার প্রথম বর।"

যম উত্তর করলেন, "নিশ্চয় তাই হবে। এখান থেকে তুমি ফিরে যাবে, পূর্ব্বের মত তোমাকে তোমার পিতা ঔদ্দালক আরুণি দেখতে পাবেন, মৃত্যুর মুখ হতে মুক্ত তোমাকে দেখে তিনি শান্ত হবেন, তাঁর বিদ্বেষ চলে যাবে, রাত্রিতে হবে সুখের নিদ্রা।"

নচিকেতা বললেন আবার—

"বলা হয়ে থাকে স্বর্গে কোন ভয় নাই, তুমিও সেখানে নাই, জরার বিভীষিকা নাই। ক্ষুৎপিপাসা দুটিকেই পার হয়ে সকল শোকের ওপারে গিয়ে স্বর্গে পরমানন্দে থাকে লোকেরা।"

"হে মৃত্যু, তুমি ত' জান সেই স্বর্গীয় অগ্নিকে, বল আমায় তার কথা, আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনছি। স্বর্গের লোকেরা অমৃতত্ব লাভ করেছে, বল এ রহস্য। দ্বিতীয় বর এই চাই আমি।"

মৃত্যুদেব উত্তরে বললেন "নচিকেতা, শোন তবে এই অগ্নিবিদ্যা। এ অগ্নির জ্ঞান আমার আছে, অগ্নি নিয়ে যায় অনন্তের লোকে। অগ্নি হ'ল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা, গুহা-নিহিত সে। আমাদের নিভৃত সত্তার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত।"

যম নচিকেতাকে আরও বুঝিয়ে বললেন,

অগ্নি হ'ল সৃষ্টির আদি। কোন রকম ইটক দিয়ে, কতগুলি ইটক দিয়ে কি প্রণালীতে অগ্নিকে সমিদ্ধ করা যায় সে গুপ্ত তথ্যও দিলেন। নচিকেতা অভিনিবেশ সহকারে শুনল সব কথা এবং এইভাবে যা শিখল মৃত্যুকে সব আবার শোনাল।

মৃত্যু খুশী হয়ে তাকে আবার বললেন—

"নচিকেতা, আমি অতি তুষ্ট হয়েছি তোমার উপর, তোমাকে তাই আর একটি বর দিলাম এই তোমাকে যে অগ্নিবিদ্যা শিখিয়েছি, সে অগ্নির নাম তোমার নামেই হবে, এখন থেকে লোকে বলবে নাচিকেত অগ্নি। অগ্নিবিদ্যার প্রতীকস্বরূপ তোমাকে এই বহুরূপা মালাটি দিলাম, গ্রহণ কর।"

মালাটি কিসের প্রতীক তা তেমনি রূপকের ভাষাতেই মৃত্যু কিছু ব্যাখ্যা করে চললেন—অগ্নিবিদ্যারই ভাষা—

"তিনটি অগ্নি যে চয়ন করেছে, তিনটির সঙ্গে যে সংযুক্ত হয়েছে, তিনটি কর্ম্ম যে করে চলেছে, সে জন্মমৃত্যু পার হয়ে যায়, তখন জানতে পারে ব্রহ্মজাত সেই পূজ্য দেবতাকে, তাকে জেনে পরম শান্তি লাভ করে সে।"

ঐ একই রহস্য হয় ত' আরও রহস্যাবৃত করে যমদেব বলে চললেন,

"তিনটি নাচিকেত অগ্নি যার লাভ হয়েছে, এই ত্রয়ীর জ্ঞান যার হয়েছে, এই ভাবে জেনে দেখে নাচিকেত অগ্নিকে যে অধিগত করেছে, সে মৃত্যুর সকল পাশ সম্মুখ থেকে সরিয়ে দিয়েছে, সকল শোক অতিক্রম করে গিয়েছে, স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করেছে। এই হল তোমার সেই স্বর্গীয় নাচিকেত অগ্নি তোমার দ্বিতীয় বরে তুমি যাকে বরণ করেছ। লোকেরা বলবে অতঃপর এ হল তোমারই অগ্নি। নচিকেতা, এখন তুমি তোমার তৃতীয় বর চেয়ে নাও।"

নচিকেতা উত্তরে বলল—

"আচ্ছা এখান থেকে জীব যখন চলে যায়, সে সম্বন্ধে একটা তর্ক ওঠে—কেউ বলে যে সে থাকে, আবার কেউ বলে সে থাকে না—আমি এই তত্ত্ব জানতে চাই, আমাকে তুমি এই জ্ঞান দাও। এই হল আমার তৃতীয় বর।"

এবার যেন যম কিছু বিপদের মধ্যে পড়লেন, বললেন "দেখ, দেবতাদের মধ্যেও এই তর্ক পুরাকাল থেকে চলে এসেছে, এ তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, এর জ্ঞান সহজ সুবিজ্ঞেয় নয়। তুমি অন্য কিছু বর কামনা কর, আমাকে আর অনুরোধ-উপরোধ করো না, এ প্রশ্ন ছেড়ে দাও।"

নচিকেতাকে আমরা ইতিমধ্যেই নিশ্চয় চিনেছি. সে নাছোড়বান্দা, বলে উঠল

"চমৎকার কথা! দেবতাদের কাছেও এ হল তর্কের বিষয়; তুমিও বলছ এ বিষয় সুবিজ্ঞেয় নয়। কিন্তু তোমার মত অন্য বক্তাও ত' মিলবে না আমার এ বিষয়ে, আর এর তুল্য অন্য বরও আমার কাম্য নয়।"

মৃত্যুও চেষ্টা করলেন নচিকেতাকে বুঝিয়ে ভুলিয়ে রাখতে—বালকমতি মনে করে হয় ত—বললেন—

"নচিকেতা, বরণ কর শতায়ু পুত্র-পৌত্র, বরণ কর বহু গো-মহিষ হস্তি-অশ্ব, সোনা-দানা,—আরো বরণ কর বৃহদায়তন ভূমি, নিজেও যত বৎসর কামনা কর জীবন ধারণ কর।"

"এ ছাড়া এর তুল্য অন্য বরও যদি কিছু তোমার কাম্য হয়, বরণ কর, যথা ইচ্ছা ধনসম্পদ এবং চিরজীবন কিম্বা চাও যদি সমগ্র রাজ্য একটা, সকল কাম্যেরই কামনা পূর্ণ করব তোমার আমি।"

যমদেব, লোভনীয়ের তালিকা বলে চললেন, বালক নচিকেতার মন হয় ত ভিজবে অবশেষে—

"হে নচিকেতা, যত সব কাম্য দুর্লভ এই মর্ত্যলোকে, সব তুমি চেয়ে নাও যেমন তোমার ইচ্ছা—এই যত রমণীয় রমণী, সঙ্গে তাদের যান বাহন, গীত বাদ্য—এ সকলের অনুরূপ মানুষের কাছে প্রার্থনীয় আর কিছু নাই, এ সবই আমি তোমাকে দেব, যথা ইচ্ছা ভোগ কর—কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন আর করো না।"

কিন্তু নচিকেতা আদৌ বালক বা অপক্কমতি যুবক নয়, সে উত্তর দিলে তৎক্ষণাৎ—

"হে অন্তক, তুমি যাদের নাম করলে তাদের স্থিতি আগামী কাল পর্য্যন্ত ; এমন ইন্দ্রিয় নাই যার তেজ ক্রমে হ্রাস পায় না। তা ছাড়া সমস্ত জীবনই যদি পাওয়া যায়, তবুও তা অতি স্বল্প। হে যমদেব, তোমার এই সব যান বাহন এই সব রমণী, এই সব নৃত্যগীত তোমারই থাক।"

"হে মৃত্যু, মানুষের তৃপ্তি বিত্তে হয় না—ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো—। আর তোমাকেই যখন দেখতে পেয়েছি, তখন বিত্তের আর অভাব হবে না। তোমার যতদিন ইচ্ছা হয় ততদিনই বেঁচে থাকব, কিন্তু আমার চাই ঐ একটি মাত্র বর।"

"তুমিই বল না—

এই জড়ালীন অধঃস্থ মর্ত্যজীব একবার যখন অজর অমরদের সান্নিধ্য লাভ করেছে, সত্যকার জ্ঞান পেয়েছে, সে অবধান করতে পেরেছে রূপ আর রতি আর সুখ কি পদার্থ, এই নাতিদীর্ঘ জীবনে সে কি আনন্দ পাবে?

হে মৃত্যু, এই যে বিতর্ক চলে এসেছে, মহান মৃত্যুর পরে কি আছে বা না আছে আমাকে বল। এই যে নিগূঢ় অন্তরালের রহস্য, আমি চাই জানতে সে কথা। তোমার কাছ থেকে নচিকেতা অন্য কিছু বর চায় না।"

নচিকেতাকে মৃত্যু আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁর গুপ্তবিদ্যা উদঘাটন করে চললেন নচিকেতার কাছে। তিনি আরম্ভ করলেন এই রহস্য এই মন্ত্র দিয়ে, নচিকেতা যাকে ধরেছে, পেয়েছে নিজে থেকেই।

মানুষের সম্মুখে দুটি পথ রয়েছে, দুটি দরজা,—একটি হল শ্রেয়ের আর একটি হ'ল প্রেয়ের। দুটি নিয়ে যায় দু'দিকে। নচিকেতা প্রেয়কে ত্যাগ করে শ্রেয়কে বরণ করেছে। মানুষের প্রগতি ক্রমোন্নতি নির্ভর করে গোড়ায় এবং বরাবর প্রতিপদে এই নির্ব্বাচনকে আশ্রয় করে। প্রতিপদে যে শ্রেয়কে চিনতে পারে ও বরণ করে নেয় সেই লাভ করে শ্রেষ্ঠকে, পরম সৎবস্তুকে। নচিকেতাও তাই লাভ করেছিল, হয়ে উঠেছিল বুদ্ধিষ্ঠ।

এই কাহিনীর মাঝখানে একটি হেঁয়ালী রয়ে গিয়েছে, তার সম্বন্ধেও 'বিচিকিৎসা' উঠতে পারে—সেই কথাটিই বলছি এখানে।

দ্বিতীয় বরে যমদেব নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যা শেখালেন। অগ্নিবিদ্যার ফল, অগ্নি-সিদ্ধি কি বলা হয়েছে—স্বর্গলোক লাভ, যেখানে অমৃতত্ব ভোগ করা যায়, আনন্দের লোক যেটি, যেখানে স্বয়ং মৃত্যু পর্য্যন্ত নেই, জরা নেই, ভয় নেই, শোক নেই, ক্ষুধা পিপাসা নেই।

আর অগ্নি কি বস্তু? অগ্নি হ'ল লোকাদি, অনন্তলোক,—আদি অনন্ত অমৃতত্ব আনন্দ, এই হ'ল অগ্নির স্বরূপ। তার স্থিতি কোথায়? নিহিতম্ গুহায়াম্, গুহাভ্যন্তরে নিহিত। গুহা কাকে বলি? সে কথা পরে হবে, আপাততঃ স্মরণে রাখা দরকার যে অগ্নি হ'ল ত্রিকর্ম্মকৃৎ এবং ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন যিনি বা যা তার জ্ঞান অগ্নির আছে।

সমস্যাটি এই। গীতার ভাষায়, একটা মিশ্রিত (ব্যামিশ্র) বাক্য কি বলা হয় নি? তৃতীয় বর নচিকেতা চাইলেন এই—

এখান থেকে চলে গেলে মৃত্যুর পরে জীব থাকে বা থাকে না, এই যে দুটি মত এর কোনটি সত্য? কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন বা বর নিয়ে যা বলা হ'ল তাতেই কি মৃত্যুর পরের রহস্য ব্যাখ্যাত হয় নি? স্বর্গলোকে গমন অমৃতত্ব ভোগ দেবতাদের সঙ্গ ইত্যাদি—নূতন করে কেন তবে সেই একই প্রশ্ন?

প্রথম রহস্য জেনে রাখা দরকার, স্বর্গলোকে পৌঁছান যায়, শারীর মৃত্যু না ঘটলেও—"মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য" বলা হয়েছে—মৃত্যুকে সরিয়ে ঠেলে ফেলে অথবা (যেমন সাধারণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়) মৃত্যুর পূর্ব্বেই। নচিকেতা স্বয়ং এ কাজটি করেছিলেন। স্বর্গলোক যেন ভিন্ন পাড়ার মত বা গৃহের মত একটা লোক—আনন্দময় লোক—যেখানে জরা মৃত্যু দুঃখ শোক নাই—কিন্তু তার অর্থ এমন নয় যে মৃত্যুকে যুদ্ধে পরাজিত করা হয়েছে, মৃত্যুর উপর প্রভুত্বলাভ করা হয়েছে। এখানে মনে হয় যেন মৃত্যুকে সরিয়ে রাখা হয়েছে বা তাকে এড়িয়ে চলা হয়েছে। মৃত্যু শুধু অনুপস্থিত এখানে, মৃত্যু বশীভূত হয় নি। আমার ঘরে মৃত্যু নাই বটে কিন্তু মৃত্যু বসে আছে তার ঘরে এবং যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে (একটা সীমানা থাকলেও), মৃত্যুর মৃত্যু ঘটে নি।

তৃতীয় বরে নচিকেতা জানতে চায় মৃত্যুর পিছনে মৃত্যুর অতিরিক্ত কিছু আছে কি না। স্বর্গে না হয় গেলাম, কিন্তু স্বর্গের পরে বা পিছনে? কারণ এ কথাও বলা হয়ে থাকে, স্বর্গভোগ কিছুকালের জন্য—তা যতদীর্ঘই হোক না। কিন্তু কালভোগ হয়ে গেলে আবার পৃথিবীতে আসতে হয়, আবার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়। মানুষের আত্মা যদি অমর হয় তবে তা স্বর্গের বাহিরে নাই, স্বর্গের অতিরিক্ত কিছু নয়—

ফলতঃ উপনিষদে বেদান্তজ্ঞানে দুরকম অমরত্বের কথা আছে। এক হল, কালগত অমরত্ব অর্থাৎ চিরজীবী হয়ে থাকা, আর এক হল ত্রিকালের বাহিরে, পরম সৎ বস্তু বা পরাৎপরের মধ্যে—যা হল বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত। আনন্ত্য এবং অসীমতাও এই দু রকমের আছে—এক, কালকে ধরে কালকে আশ্রয় করে কালক্রমের সঙ্গে একীভূত হয়ে—লৌকিক দৃষ্টিতে যাকে বলা হয় যাবচ্চন্দ্রোদিবাকরৌ—আর দুই হল সকল সৃষ্টি সকল প্রকাশ ছাড়িয়ে তার উর্দ্ধে ব্রাহ্মীস্থিতির মধ্যে।

নচিকেতা চেয়েছেন এই উপলব্ধি। দেবতারা কাল-পুরুষ, যত বৃহৎ মহৎ তাঁরা হোন না, চিরকাল স্থায়ী চিরজীবী তাঁরা হোন না, তাঁদের মৃত্যু নাই, তাঁরা মৃত্যুর রহস্য জানবেন কি করে? মৃত্যুর বাহিরে তাঁরা বাস করতে পারেন। মৃত্যু তাঁদের পক্ষে পরদেশী; কিন্তু মৃত্যুর ভিতর দিয়ে, মৃত্যুকে পার হয়ে, ওপারে কালাতীত কি সত্য তা তাঁদের অজ্ঞাত। তাই যমদেব বলছেন দেবতারা এ বিষয়ে সন্দেহাকুল বিমূঢ়। যমদেবের এ জ্ঞান আছে, তিনি জানেন তাঁকে ছাড়িয়ে তাঁর ওপারে কি সত্য নিহিত। নচিকেতা যমদেবকে বলছে, "তোমাকে যখন পেয়েছি তখন এ জ্ঞান নিশ্চয় পাব, তোমার মত কুশলী বক্তা অর্থাৎ জ্ঞানী আর কেউ নেই।" কারণ যমকে বলা হয়েছে বৈবস্বত অর্থাৎ সূর্য্য বা সবিতা হতে জন্ম তাঁর, সূর্য্য সবিতা হল পরাজ্ঞান, ব্রহ্মসম্বিৎ যা থেকে বিশ্ব-সৃষ্টি। যম হ'ল প্রাণশক্তি, প্রাণছন্দ, ঐহিক বিধান—এখানে প্রকাশের মধ্যে জীবনলীলায় সবিতার প্রতিনিধি এবং অগ্নি তার বাহন বা যন্ত্র বা প্রতীক।[১] যম যে অগ্নিবিদ্যা নচিকেতাকে দিলেন তা হ'ল ঐহিক সিদ্ধি, কালত্রয়কে জয় করা, কালগত অমরত্ব বা স্বর্গ লাভ করা। এ বিদ্যা ত্রিবৃৎ অর্থাৎ ত্রিধারা, ত্রিকর্ম্ম, কালত্রয়ের মধ্যে লোকত্রয়ের মধ্যে। লোকত্রয় আমরা জানি হ'ল দেহ প্রাণ মন, এই ত্রয়ী নিয়ে এ-পারের সাধনা ও সিদ্ধি। মানুষের আধার হ'ল বেদী, দেহ প্রাণ মন এবং তাদের বৃত্তি হ'ল বেদীর ইষ্টক,[২] অগ্নি হ'ল আধারের অন্তরের অন্তরতম গহনে নিভৃত যে চিন্ময় তেজঃশক্তি, অন্তঃপুরুষের তপঃশক্তি।

---

১ সূর্য্য যেমন বিবস্বান জ্যোতির্ময় সৎপুরুষ, যম হলেন তেমনি বৈশ্বানর—বিশ্বধীর্য্য সার্বভৌতিক শক্তি (বিশ্ব+নৃ); সূর্য্য বিশ্বাতীত, ওপারের—অগ্নি বিশ্বগত, এপারের। অথবা আরো ঠিক বলতে গেলে সূর্য্য ওপার থেকে এপারে, অগ্নি এপার থেকে ওপারে।

২ যমের উল্লিখিত বহুরূপী বালা (স্বক) যম এই বহুরূপী প্রকৃতি।

ত্রিকর্মের সাধনা দিল কালগত সিদ্ধি, এখন প্রয়োজন কালাতীত সিদ্ধি, তৃতীয় বরে নচিকেতা চাইলেন এই শেষোক্ত জ্ঞান, বিশ্বজ্ঞানের পর পরাজ্ঞান, বিশ্বসিদ্ধির পর পরাসিদ্ধি।

অগ্নিকে বলা হয়েছে লোকাদি, লোক সকলের আদি, লোক সকলের উৎস, আদি লোক, কারণ অগ্নির স্থান স্বস্থান বা ক্ষেত্র হ'ল ক্ষিতি, এই পৃথিবী, এই জড়জগৎ। স্থূল জড়ের অন্তরে অবচেতনা অচেতনার অন্তরালে এই অগ্নি অর্থাৎ তপঃশক্তি, চিন্ময় তেজ, আপনাকে লুকিয়ে রেখেছে, তারই নিভৃত প্রেরণায় চলেছে সৃষ্টির প্রগতি। এই অগ্নিশক্তির কল্যাণে নচিকেতার পরাসিদ্ধি।[৩] উপসংহারে উপনিষদ দিলেন এই ফলশ্রুতি।

মৃত্যুর মুখে কথিত এই বিদ্যা নচিকেতা লাভ করল, সমগ্র যোগবিধি। হ'ল তার ব্রহ্মপ্রাপ্তি, বিরজ ও বিমৃত্যু (বিশুদ্ধ মৃত্যুহীন)। অন্য যে কেউ নচিকেতার পথ অনুসরণ করবে, নচিকেতার মত তারও লাভ হবে এই আত্মসিদ্ধি।

---

৩ ঈশ উপনিষদের ভাষায় বলতে পারি, প্রথমে (দ্বিতীয় বরে) নচিকেতা অবিদ্যার জ্ঞান লাভ করে মৃত্যুকে অতিক্রম করলেন, পরে (তৃতীয় বরে) বিদ্যার জ্ঞান লাভ করলেন অমৃতত্ব।

শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গদ্য রচনাবলীতে যে সব কথা বলেছেন, কাব্যে সেই তত্ত্বকেই জীবন্ত করে ধরে দেবার জন্যে বেছে নিয়েছেন (মহাভারত, অরণ্য-পর্ব ২৪৮) এই কাহিনী ; সতীত্ব সাধনা, মর্ত্যের অভীপ্সা কত বড় সিদ্ধির সামর্থ্য ধরে তারই ব্যাখ্যান, পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে বর্ণিত হয়েছে এই মহাকাব্য। রাজা অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী স্বামী-রূপে বরণ করেছেন নির্বাসিত অরণ্যবাসী অন্ধরাজা দ্যুমৎসেনের পিতৃভক্ত পুত্র সত্যবানকে। দেবর্ষি নারদ সাবিত্রীকে জানালেন যে আর মাত্র এক বছরের মধ্যেই সত্যবানের আয়ু শেষ হয়ে যাবে ; শুনে কিন্তু সাবিত্রীর মত তবু বদলাল না। অনিবার্য সেই দিনে উপস্থিত হলেন মৃত্যুদেব যমরাজ, সত্যবানকে নিয়ে যেতে চাইলেন সত্যবানকে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃত হলেন সাবিত্রী। অন্ধকার লোক-লোকান্তর পার হয়ে সত্যবানকে নিয়ে চললেন যমরাজ—তার পিছনে সাবিত্রী, নির্বাক প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো। অবশেষে মৃত্যুকে জয় করে সাবিত্রী ফিরে পেলেন সত্যবানকে। মনের প্রসাদে, রাজা দ্যুমৎসেনও ফিরে পেয়েছেন তাঁর দৃষ্টিশক্তি আর তাঁর রাজ্য।

এই প্রতীকটি শ্রীঅরবিন্দ ফুটিয়ে ফলিয়ে ধরেছেন দেখাবার জন্যে কি রকমে সাবিত্রীর মধ্যে দিয়া সেই স্পর্শ মূর্ত হয়েছে, যে স্পর্শ জীবনের আঁধারতম মুহূর্তে—আশার কণামাত্র আলোর সন্ধানও মেলে না যখন তখন—এনে দেয় যুগ-যুগান্তের সুদীর্ঘ তপস্যায় নূতন এক তাৎপর্য। মহানিশার অবসানে দিনের সূচনার অবিস্মরণীয় বর্ণনা দিয়ে এই কাব্যের শুরু ; প্রতি-নিয়ত উষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আগত আর দশটা দিনের মতোই আজকার দিনের শুরু, এই হল সত্যবানের নিয়তি-নির্দিষ্ট মৃত্যুর দিন। প্রেমের মহিমা-ভাস্বর সাবিত্রী বুক বেঁধে তৈরী হলেন আপাতদৃষ্ট দুর্লঙ্ঘ্য এই বিধানের বিরুদ্ধে যুঝবেন বলে। প্রশ্ন জাগল, মানবতা কি অজ্ঞানের আর মৃত্যুর মোহেই বাঁধা থাকবে, না কি পথ কেটে এগিয়ে চলবে অমৃতত্বের অভিমুখে

> Whether to bear with Ignorance and Death
> Or hew the ways of Immortality...

দ্বিতীয় পন্থাটি সম্ভব, যেহেতু পৃথিবী নিজেই ত' এই ত্রাণের অভীপ্সায় আকুল। সাবিত্রীর জন্মই ত' হল অশ্বপতির আধারে মূর্ত গভীর এক আকূতির প্রত্যুত্তরে ভগবতী

জননীর আত্মদান। রাজা অশ্বপতির আত্মা স্বচেতনা লাভ করে পার হয়ে গিয়েছিল চেতনার কত-না লোক, যতদূর সম্ভব ঊর্ধ্ব থেকে যতদূর সম্ভব গভীরে, তীব্র অনুভূতি দিয়ে জেনেছিল তাদের আদি উৎস। উঠেছিল গিয়ে বিশ্বমাতার সমীপে, তাঁকে জানিয়েছিল আকুল প্রার্থনা—তাঁরই অংশ যদি নেমে আসে পৃথিবীর বুকে, তবেই না ভাঙ্গবে প্রাকৃত নিয়তির শৃঙ্খল।

সে প্রার্থনা পূর্ণ হ'ল। জন্ম নিলেন সাবিত্রী; সত্যবানকে বরণ করলেন তিনি পতিত্বে। নারদ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা যখন রূঢ় সত্যে পরিণত হল, তখন ধীরে ধীরে সাবিত্রী জানতে পারলেন তাঁর একাগ্র ধ্যানে—কোন ব্রত সাধনের উদ্দেশ্যে তাঁর এই নরদেহ ধারণ, নরতনু গ্রহণ। নিদারুণ সেই দিনের প্রত্যূষে প্রস্তুত হলেন তিনি একাকিনী চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন বলে।

অন্তঃকরণের অন্তশ্চেতনার গভীর থেকে গভীরতর লোকে অভিনীত হয়ে চলল সে অপরূপ নাট্যধারা। ঘোর শূন্যকে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চললেন সাবিত্রী; তুচ্ছ করে গেলেন স্বর্গের অবিমিশ্র আনন্দকে।

রাত্রি-দিন হল এ দ্বৈতের নিত্যকার দুটিরূপ—যতদিন তারা রয়েছে ততদিন পৃথিবীর জীবন-যাত্রায় বৈপরীত্যের দ্বন্দ্বের প্রয়োজনও থাকবে, যতদিন না দ্বৈত আবিষ্কার করবে মিলনের মধ্যে সর্বজয়ী ঐক্য একত্ব।

ফলতঃ এখন থেকে নূতন এক আলো এসে তার ব্রত সম্পাদনের সহায় হল। অতি-মানস শক্তির শান্তি, ঐক্য, সামর্থ্য এবং প্রেম সাবিত্রীকে দিল তাদের সহযোগ—সাবিত্রী সেসব গ্রহণ করলেন তাঁর নিজের জন্যে নয়, সে শক্তিকে সঙ্গে নামিয়ে আনতে চাইলেন মানুষের কাছে, যাতে তা ক্রমে ক্রমে অব্যর্থভাবে পৃথিবীর বুকে প্রকাশ করতে পারে দিব্য জীবন।

কাব্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে আবার রয়েছে তিনটি ভাগ। আরম্ভে হ'ল সমস্যাটির স্বরূপ, তাতে এসে গেল অশ্বপতির সাধনার রহস্য। প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগে (**The Book of Beginnings**) অশ্বপতির ব্যক্তিগত সিদ্ধি। দ্বিতীয় ভাগে তার বিশ্বগত সিদ্ধি (**The Book of the Traveller of the Worlds**) এবং শেষে তৃতীয় ভাগে বিশ্বাতীত সিদ্ধি (**The Book of the Divine Mother**)। তারপর দ্বিতীয় খণ্ড—এখানে বলা হয়েছে সাবিত্রীর জন্মকথা, প্রেম ও মৃত্যু-রহস্য; সাবিত্রীর ক্রমিক আত্মার প্রকাশ। তৃতীয় ভাগে শেষ সিদ্ধি ও বিজয়—বিজয়ের অপরূপ ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্ব্ব

অশ্বপতির প্রয়াস হল বিবর্ত্তনের রহস্য আবিষ্কার। মানব-আত্মারই এই প্রয়াস। সুপ্রাচীন চিরন্তন এ আস্পৃহার পুরোধা অশ্বপতি—

"তাঁর অন্তরে অঙ্কিত বৃহৎ সুবহান স্মৃতি সব
অক্ষয় অক্ষুণ্ণ মহিমা যবনিকা-অন্তরাল থেকে সামান্যই আকার দিতে পেরেছে
তার কাজ চলেছে জীবনের গুপ্ত জঠরে।"

ভবিষ্যৎ ক্রমে আপন সব মাহাত্ম্য নিয়ে ফুটে উঠল তার স্বপ্নে—এক আস্পৃহা তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল দুঃসহ দুর্গম বিশ্বাতীতের জ্যোতির দিকে—

"স্থূল চক্ষু ধারণ করতে অক্ষম এমন রশ্মিজালে তা আবৃত।"

এরই সঙ্গে চলেছে আর এক অন্তর্যামী শক্তির ক্রিয়া, যদিও গুপ্ত তবুও সে চলেছে পথ বেয়ে, ধৈর্য্যের সঙ্গে পরীক্ষা করছে গভীরতর দেশে, আবিষ্কার করছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মুঞ্চরণ, আকস্মিক দৃষ্টিপথ, ভাগবত কৃপা, অপ্রত্যাশিত সাহায্য। সাধনার নিভৃত পথ প্রকৃতির কূল উপকূল সহজে পরিহার করতে পারে না—এ হল দিনের উন্নতি ও রাত্রির অবনতি ধরে সুদীর্ঘ পরীক্ষা—উপলব্ধি সব প্রকাশ পায় আবার নিভে যায় বারবার।

প্রথম স্থায়ী যে প্রগতি, তা হল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত এই যত আকর্ষণ তা থেকে আকস্মিক মুক্তি, একটা বিশেষ কর্ত্তৃত্ব এবং নীরবতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা—

"তার সত্তার শিখর সব অধিষ্ঠিত প্রশান্ত আত্মার মধ্যে
তার মন...
নিম্নে দৃষ্টিপাত করে এক যাদুক্রিয়া, এক লীলার উপরে..."

তখনই ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধতন সত্তারা প্রকট হয়, নেমে আসে ঐশী এক সান্নিধ্য। স্পষ্টতর এক আকৃতির শেষে ফুটে ওঠে প্রথম সম্মিলনী-মন্ত্র :

"এক গাঢ় যবনিকা ছিন্ন হ'ল, বিপুল এক অস্ফুটবাক শোনা গেল....
জ্ঞানকণ্ঠ এক আনন্দমুগ্ধ ওপার থেকে...
অমর বাণীর অগ্নিময় পরিস্ফুরণ..."

অশ্বপতির কাছে এই উপলব্ধি হ'ল বিরাট এক আশার সূচনা। যে দিব্য মহিমা তার দৃষ্টিপথে এসেছিল একবার, তাকে পূর্ণভাবে অধিকার করতে হবে, এই ভূতলে নামিয়ে আনবার জন্যে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার জন্যে। তার অন্তরাত্মা পেয়েছে দিব্যদৃষ্টির নিভৃত দুয়ার। সূর্য্যের কিরণ এক ফিরে যদি যায় সূর্য্যের মধ্যে তেমনি তার অন্তরাত্মা চলল নীরবতার সাগর মহাসাগর পার হয়ে। ঊর্দ্ধ থেকে অবতীর্ণ হল এক মহাশক্তি তার সাক্ষাতে।

"সনাতন বাহুযুগলের মধ্যে তাকে অবাধ বিক্রমে তুলে নিল
পূর্ণতর শুদ্ধতর এক আনন্দ তাকে টেনে নিল, বাধ্য করল দুর্বার আকর্ষণে
পুলকের শক্তির ঘূর্ণাবর্তে—তার মরত্ব থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে, সে লাভ করল এক অভিনব কূলহারা রূপান্তর।"

অন্তরাত্মাকে ঘিরে ছিল যত আবরণ, খসে পড়তে লাগল তারা, আবার মিশে চলল প্রকৃতির যন্ত্রের মধ্যে—সে প্রকৃতিও এখন আপনাকে খুলে ধরতে প্রস্তুত হয়েছে। বিশ্ব থেকে মুক্ত হয়ে অশ্বপতি দেখল এখন অগণিত শক্তিসব সক্রিয় হয়ে উঠেছে স্তরের পর স্তরে সজ্জিত অসংখ্য লোকরাজির মধ্যে।

"দিব্যবিধানের ক্রমধারা মূর্ত করেছে যত সাম্রাজ্যরাজি
তারা চিরন্তন থেকে নেমে এল ডুবে গেল কালের ধারায়...
জীবনের অভিযানে আনন্দে সমৃদ্ধ হয়ে...
ফিরে উঠে গেল আবার কালস্রোত থেকে অমর আত্মার মধ্যে।"

"আমাদের প্রত্যাবর্তনের পথ নির্দেশ করে কেবল সেই সমুচ্চ সত্তা
মুক্তির মধ্যে উত্তরণের সোপান এক
তার ধাপে ধাপে প্রকৃতি উঠে চলেছে ভাগবত সত্তার মধ্যে।"

অশ্বপতি সূক্ষ্মপ্রকৃতির এই সব রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন—এরা সব অন্তরাত্মার ক্রম উত্তরণে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ*

সুধা বসু

যোগের কথায় শ্রীঅরবিন্দ প্রথমেই বললেন, All life is yoga—সমস্ত জীবনটাই একটা যোগ। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখি, ঘোর আঙ্গিরস দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বলছেন, 'পুরুষই যজ্ঞ। তার জীবনের প্রথম চব্বিশ বছর হল প্রাতঃসবন, তারপর চুয়াল্লিশ বছর ধরে মাধ্যন্দিন সবন এবং অবশেষে আটচল্লিশ বছর সায়ন্তন সবন। এমনি করে তার সমস্তটা জীবনই একটা লোমযাগ—বাল্য কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্য সমস্তই একটা অমৃত আনন্দের উচ্ছলন।' উপনিষদ বলছেন, 'একথা শুনে কৃষ্ণ অপিপাস হয়ে গেলেন।'

এখানে দুটি ভাবনার সমন্বয় দেখতে পাচ্ছি জীবন আনন্দে উচ্ছল অথচ পুরুষ অপিপাস, অকামহত—বাসনার উত্তালতা বা অবসাদ তাঁর মধ্যে নাই। গীতাতেও দেখি এই ভাবনারই উদ্দীপ্ত প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের সমস্তটা জীবনই ভূতভাবন একটা যজ্ঞ, তিনি উন্মেষে-নিমিষে যোগযুক্ত। অথচ তাঁর যোগ পর্বতকন্দরে নয়—কুরুক্ষেত্রে, সেখানে তিনি নিত্যজাগ্রত। এই তাঁর বহির্যোগ। আর, তাঁর অন্তরে বৃন্দাবনের স্বপ্ন—এই তাঁর অন্তর্যোগ। তাঁর কুরুক্ষেত্রের শিক্ষা আজও রূপ ধরেনি। সমস্ত জীবনই যে যোগ বা যজ্ঞ —একথা কোথাও তেমন জোর দিয়ে যেন বলা হয়নি। বিবিক্ত সাধনার শেষে জীবন্মুক্তের জীবন যোগজীবন—এ-আদর্শের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সাধনার শুরুতেই ব্যবহারিক জীবনও যে যোগজীবন হতে পারে—একথা একবার আমরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনেছিলাম, আবার তার উদাত্ত ঘোষণা শুনলাম শ্রীঅরবিন্দের মুখে।

তা-ই হয়। 'কালেন মহতা' যোগ নষ্ট হয়ে যায়, আবার সেই পুরাতনকে যুগের প্রয়োজনে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের যোগজীবনের আদর্শ এবং যোগ-সমন্বয়ের ভিত্তি এই ফিরিয়ে আনার উপরে। তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমার যোগ আনকোরা নতুন, একথা আমি বলিনা। পূর্বের যোগধারার সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে, এবং তা থেকে অনেক-কিছুই আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাতে ফুটে উঠেছে অভিনবের একটা ব্যঞ্জনা'—যেমন আমরা দেখি গীতাতে। পূর্ণযোগের তিনটি অভিনবত্বের কথা তিনি নিজেই বলেছেন।

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

প্রথমত:, এ-যোগে শুধু উপরে উঠে যাওয়াই নয়, সেখান থেকে সমৃদ্ধ হয়ে আবার নীচে নেমে এসে জীবনকে সমৃদ্ধ করারও একটা দায় যোগীর আছে। দ্বিতীয়ত, ঠিক এই কারণেই এ-যোগ একার যোগ নয়, সবাইকে নিজের সঙ্গে তুলে নিয়ে যাবার জন্য এ একটা বিশ্বযোগ। তৃতীয়ত, লক্ষ্য ও প্রকারের এই ভেদ হতে এ যোগের রীতিতেও অনেক-কিছু নতুনত্ব থাকবে, অতীতের অনুবৃত্তি হয়েও সবটাই তার পুনরাবৃত্তি হবে না। পূর্ণযোগের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হতে বোঝা যায়, শ্রীঅরবিন্দের সাধনপদ্ধতিতে যোগ আর জীবনে কোথাও কোনও ছেদ পড়েনি কেন।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে আত্মাকে বলা হয়েছে চতুষ্পাৎ—জাগরিতস্থান স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান পুরুষরূপে তাঁর তিন পাদ, আর চতুর্থপাদে তিনি প্রপঞ্চোপশম, শান্ত শিব এবংঅদ্বৈত। সাধারণ জীবনে আমরা দিনের বেলায় জেগে থাকি আর রাতে ঘুমাই। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, আবার সুষুপ্তিতে স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ি। তারপর আবার জেগে উঠতে হয়, ঘুম ভেঙে যায়। এই জাগ্রত চৈতন্যকেই সাধারণত: আমরা জীবন বলে বুঝে নিয়েছি। অবশ্য স্বপ্নেও এর ছায়া পড়ে, কিন্তু সুষুপ্তির স্মৃতি আমাদের থাকে না—এক প্রাণারাম সুখানুভব ছাড়া। তাইতে বুঝি যে, ঘুম আর জাগরণ তখনও একই সঙ্গে চলেছিল—মন ঘুমিয়ে পড়লেও প্রাণ কিন্তু জেগেই ছিল। এমনি করে চেতনাকে খুলে-মেলে-ছড়িয়ে দিয়ে যেমন আমাদের জেগে থাকতে হয়, তেমনি আবার তাকে গুটিয়ে নিয়ে বিশ্রামেও যেতে হয়। এর মধ্যে কাকে আমরা যোগভূমি বলব—বাইরে চেতনার বিস্ফারণকে, না অন্তরে তার সংহরণকে?

আমাদের দেশে বহুদিন ধরে যে-যোগপন্থাগুলি চলে এসেছে তাতে সংহরণ বা নিরোধের ধারাটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। নির্বীজ সমাধি বা প্রপঞ্চোপশমে তুরীয় স্থিতি যোগের লক্ষ্য হয়ে ওঠায় প্রাকৃতজীবন থেকে যোগজীবন যেন বিযুক্ত—এইরকম একটা ধারণা সাধারণ মনে দানা বেঁধে আছে। যোগের ভাষায়, চেতনাকে গুটিয়ে এনে নিরোধের দিকে যাওয়া 'সমাধি' আবার বাইরে বা জাগ্রতে ফিরে আসা হল 'ব্যুত্থান'। যোগসূত্রকার পতঞ্জলি বলেছেন, 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ:'। বরনীয়ারা বলেছেন নিদ্রা আর সমাধিস্থিতি এক। তাঁদের মতে এই হল যোগভূমি। ব্যুত্থানে চিত্ত মূঢ়, ক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ত। এগুলি যোগভূমি হতে পারে না, যদিও এসব ভূমিতেও মানুষের সমাধি হতে পারে—কেননা সমাধি সার্বভৌম চিত্তধর্ম। কিন্তু সে-সমাধি যোগের সমাধি নয়। বিক্ষিপ্ত ভূমির পর একাগ্রভূমিতেই যথার্থ যোগ শুরু হয়, যদি সে একাগ্রতার আলম্বন হয় অন্তরাবৃত্ত আত্মচৈতন্য বা বিশ্বোত্তীর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য। উভয় ক্ষেত্রেই জগৎ যোগের এলাকা থেকে বাদ পড়ে যায়।

কিন্তু এভাবে সমাধি হলেও তাতে সর্বক্ষণ থাকা সম্ভব হয় না। সমাধির পর আবার স্বভাবের নিয়মেই সাধকের ব্যুত্থান হয়। রামকৃষ্ণদেব সপ্তস্বরের উপমা দিয়ে বলতেন 'সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি,—নি-তে সর্বক্ষণ থাকা যায় না আবার সা-তে ফিরে আসতে হয়।' ফিরে এসে দেখি, বাইরের জগৎ তার ঝামেলা নিয়ে যেমন ছিল তেমনি আছে। তখন বাইরের ঝামেলা থেকে আবার আমরা ভিতরের শান্তিতে ডুবে যেতে চাই। এমনি করে বারবার নিরোধের অভ্যাস দ্বারা সর্বনিরোধ নির্বীজ সমাধি লাভ ক'রে সেখানেই থেকে যাবার দিকে আমাদের একটা ঝোঁক আসে।

কিন্তু, এতে সমাধি ও ব্যুত্থানে এক বিরোধের সৃষ্টি হয়। বাইরের জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়া কাম্য হয়ে ওঠে, বাইরের ঝামেলা থেকে বরাবর দূরে থাকার চেষ্টাই প্রবলতর হয়। যোগের এই ধারা সাংখ্যসম্মত। সাংখ্যের মতে যোগের লক্ষ্য আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ঘটানো। কথাটা ঠিক, কিন্তু গীতা আরও গভীর সমন্বয়ী দৃষ্টি নিয়ে বল্লেন 'সমত্বই যোগ'। দুঃখনিরোধের আদর্শ তো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা হ'ল—দুঃখ ও সুখকে সমান-ভাবে গ্রহণ করা। সমাধি ও ব্যুত্থানে সমতা আনতে হবে। সমাধিতে প্রপঞ্চের উপ-শমের ফলে যে অদ্বৈতবোধনিবিড় শান্তি, তার প্রসাদ নামিয়ে আনতে হবে জাগ্রতে। স্থিতধী বা জাগ্রতেও সমাধিস্থ পুরুষের প্রধান লক্ষণ হল সমতা। অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? তিনি কি বলেন, কি ভাবে থাকেন, কি ভাবে বিচরণ করেন?' এটা এমন একধরনের প্রশ্ন, যা প্রচলিত সমাধির লক্ষণের সঙ্গে মেলে না। সমাধির পরিপাক হলে অন্তর্মুখীনতার চরমে আসে এক প্রশমের অবস্থা, তাকে বলা হয় ব্রহ্মনির্বাণ। কিন্তু তাকে অন্তরে রেখে সেই আত্মশক্তির প্রসাদেই বিচরণ করতে হবে বাইরেও। তার লক্ষণ দিতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

—ইন্দ্রিয় হবে রাগদ্বেষ হতে বিযুক্ত এবং আত্মার বশীভূত। এই ইন্দ্রিয় নিয়ে পুরুষ আত্মার শাসন মেনে যদি বিষয়ে বিচরণ করেন তাহলে তিনি অধিগত করেন প্রসাদ বা প্রসন্নতা।

এইভাবেই স্থিতধী পুরুষ সহজ হয়ে যান। বাসনা-কামনার উত্তালতায় তিনি অচল-প্রতিষ্ঠ, অকামহত। ইন্দ্রিয়গুলি আত্মবশ্য তাই তারা আত্মার সত্যকেই বিচ্ছুরিত করছে বহির্জীবনে। এইভাবে বিচরণ করার ফলে চিত্তে নামছে প্রসাদ। তাইতে সর্বদাই তিনি প্রশান্ত এবং প্রসন্ন। তখন বুদ্ধির দ্বৈত ও সংসারের বহুত্ব তাঁর সহজ সমতাকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না। এই হল যোগের সম্যক্ ফল। আর, এরই মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের 'অপিপাস' হওয়ার আভাসও আমরা পেয়ে যাই। এটিকেই আমরা সহজ যোগের লক্ষণ বলতে পারি। কেননা এ শুধু উপরে উঠে, সেখানে থেকে-যাওয়াই নয়, আবার

নীচে নেমে এসে আত্মার শক্তিকে জীবনে বিচ্ছুরিত করা। কুরুক্ষেত্রের ঘোর কর্মে নিয়োজিত থেকেও ধর্মক্ষেত্রের সচেতনতাকে বজায় রাখা—এই হল শ্রীঅরবিন্দের সহজ যোগ।

তাহলে যোগের মূল লক্ষণের মধ্যে আমরা পেলাম সাংখ্যে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি এবং গীতায় সমত্ব। কিন্তু আরও গভীরে তলিয়ে বলতে পারি যোগ বস্তুটা এক পরম আবেশ। এই লক্ষণটি বৈদিক সাধনাতে পাই। প্রাচীন বৈদিক সাধনায় জীবনকে সৌরালোকে উদ্ভাসিত, প্লাবিত করে নেওয়ার একটা সহজ পথ ছিল। সমস্ত যোগজীবন ছিল যেন এক তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের মত। ভোরের শান্ত আকাশে আলো ফুটছে। ক্রমে সে আলোয় যেন দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষ সব ঝলমলিয়ে উঠছে। এমনি ক'রে এক বৃহৎ সত্তার উদ্ভাসে এবং আবেশে সমস্ত জীবন যদি এমনভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যাতে চোখ বুজে যা পাই চোখ মেলেও তাকে সহজে বহন করে নিয়ে চলতে পারি, তবে তা-ই হবে বৈদিক যোগজীবনের আদর্শ। এযুগে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা তার আভাস পাই। এই জীবনের পারিভাষিক সংজ্ঞা ছিল ব্রহ্মচর্য বা ব্রহ্মবিহার। অর্থাৎ মীন যেমন সমুদ্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তেমনই এক বৃহতের মধ্যে বিচরণ করা। ব্রহ্মচর্য ছিল ঔপনিষদ যোগপন্থাগুলিরও একটা মূল স্তম্ভ। অন্তেবাসীর প্রতি আচার্যের প্রথম অনুশাসনই হল 'বস ব্রহ্মচর্যম্'—এ ছাড়া আর কোন উপদেশ নয়। তাকে একটা অতি সাধারণ কাজ দেওয়া হল—যেমন গোচারণ। উষার আলোয় শ্রদ্ধাবিষ্ট হৃদয়টি মেলে নিয়ে ব্রহ্মচারী চলেছে গোচারণে। সে দেখছে,—শান্ত প্রকৃতি ঘুম ভেঙে চোখ মেলে যেন ধীরে ধীরে নন্দিত হয়ে উঠছে—দিকচক্রবালে জগতের আত্মা সূর্যের উদয়ে। ব্রহ্মচারীর হৃদয়কমলটিও সেই পরমজ্যোতির আবেশে উদ্দীপ্ত হয়ে উন্মীলিত হচ্ছে। হৃদয়ের অন্ধকার গুহা থেকে জ্যোতির উৎসারণ—এই অধ্যাত্মসিদ্ধির প্রতিচ্ছবি সূর্যোদয়ে। বাইরে যা ভূতাকাশ, অন্তরে তাই চিদাকাশ। সেখানে সূর্যের উদয় দেখাই ব্রহ্মচারীর পরম আকূতি। দেবতা তার সে-আকাঙ্ক্ষাকে সার্থক করেন তাঁর জ্যোতি দিয়ে, তমিস্রার কুহর হতে কিরণরাজিকে দোহন ক'রে উৎসারিত করেন এক অনিবার্য বৈপুল্যে। এই জ্যোতি সবার জন্য। বাইরে জ্যোতির সর্বোত্তম প্রকাশ সূর্যে। তাই সূর্যোদয়ে গর্ভভূতের মহান আত্মা যে-দেবতা, তাঁর আবির্ভাবে অন্তেবাসী সহজেই আপ্তকাম হতে পারেন। এই সহজযোগে অধিকার ছিল সত্যকামের, তার পরিচয় আমরা পেয়েছি ছান্দোগ্য উপনিষদে।

মধ্যযুগের মরমীয়ারা এই সহজযোগের পথ ধরেছিলেন। তাঁরাও সহজসমাধির কথা বলে গেছেন। কবীরের প্রসিদ্ধ উক্তি—'আঁখ ন মুঁদূঁ কান ন রুধূঁ সহজ সমাধি ভালা'। চোখও বুঁজতে হবে না, কানও বন্ধ করতে হবে না, সেই সহজ সমাধিই তো ভাল। অষ্টাবক্র সংহিতাতেও এই ধরনের কথা পাওয়া যায়—

'অযত্ন এব হি তে বন্ধো যৎ সমাধিম্ অনুতিষ্ঠসি।
যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র সমাধয়ঃ॥'

—এই তোমার এক বন্ধন যে তুমি সমাধির অনুষ্ঠান করতে চাইছ। মন যেখানে-যেখানে যাবে, সেখানেই তো সমাধি হতে পারে।

কিন্তু এই সহজ অবস্থা লাভ করা আমাদের পক্ষে সহজ হয় না কেন? তার কারণ, যে-কোনও যোগেই নিম্নপ্রকৃতিকে ছাপিয়ে উঠতেই হয়। আর, এই প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, ছাপিয়ে ওঠাটা কোনক্রমেই সহজ হয় না। তাইতে, যোগের প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ নিরোধের পথে খানিকটা চলতেই হয়। কিন্তু চিত্তবৃত্তিকে বরাবরের জন্য সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করা পূর্ণযোগের লক্ষ্য হতে পারে না। নিরোধ সেখানে অন্যতম উপায় মাত্র। আসল লক্ষ্য হল রূপান্তর। নিরোধের ফলে শক্তি জাগে, সেই শক্তি দিয়ে বৃত্তির ঘনত্ব ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটানোই যোগীর পুরুষার্থ। এইটিই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-যোগের মুখ্য লক্ষণ। তাঁর যোগে স্বপ্নস্থান ও সুষুপ্তিস্থান থেকে পুরুষই যোগশক্তিতে নেমে আসেন জাগ্রতে। তখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে শক্তি সঞ্চারিত হয়ে জীবনকে সুধাসিক্ত করে তোলে। এতে জীবনের কোনও প্রস্থানের সঙ্গে কোনও প্রস্থানের বিরোধ ঘটে না। তুরীয়ের প্রপঞ্চোপশমে নিত্য সমাহিত থেকে যোগী তখন জগতেও জেগে থাকেন।

[ক্রমশ]

মায়ের সঙ্গে কথা

[প্রশ্নোত্তর]

১৪ মার্চ, ১৯৫১

"Conversations with the Mother, VII" থেকে—

"...ভগবানের দিকে যখন ফিরেছ তখন তোমার নিজের মনের সব কিছু ধারণা ও মতামত ও আন্দাজকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলতে হবে ; কিন্তু সাধারণত লোকে এইটি না করে নিজেদেরই ঐ সব জিনিসকে ভগবানের উপর চাপিয়ে দিয়ে চায় যে তিনিই তা মেনে নিন। কিন্তু যোগীর পক্ষে উচিত হবে সম্পূর্ণ নমনীয়তা. ভগবান যেদিকে যেমনভাবে চালাবেন তেমনিভাবেই চলা।"

প্রশ্ন এই "নমনীয়তা" বলতে কি বুঝব ?

উত্তর : তাকেই বলি "নমনীয়" যে অনায়াসে নিজের স্বরূপ পাল্টাতে পারে। নমনীয়তা মানে এমন একটা সহজবশ্য ভাব যাতে দরকার হলে তাকে যেমন খুশি তেমনি নোয়ানো যেতে পারে। যখন বলি ভগবানের দিকে নমনীয় হতে, তার মানে এই যে তোমার মধ্যে যেন এমন কিছু পূর্বমত বা একগুঁয়েমি না থাকে যাতে তুমি ভগবৎ-ইচ্ছার বিরোধী হও। একজনের কথা জানি যে বলতো "আমি নিজেকে ভগবানের কাছে পুরোপুরি নিবেদন ক'রে দিয়েছি, তাঁর যা আদেশ হবে তাই করব বলেই ঠিক করেছি, কিন্তু তাতে আমার ভয় ভাবনা করার কিছু নেই ; আমি জানি যে তিনি কাউকে হত্যা করতে কখনই বলবেন না।" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কেমন করে তা জানলে ?" শুনেই সে চটে গেল। এ হলো অনমনীয়তা।

প্রশ্ন : সব কিছুতেই যদি নমনীয় হই, তা কি একটা দুর্বলতা নয় ?

উত্তর : কিন্তু তোমাকে তো সকলের বেলাতেই নমনীয় হতে বলা হচ্ছেনা ! অন্য কারো কাছে নমনীয় হতে কেউ তোমাকে বলছেনা। কেবল বলছি ভগবৎ-ইচ্ছা সম্পর্কে নমনীয় হতে—সে তো একই কথা হলোনা। এর জন্যে যথেষ্ট শক্তির দরকার,

কারণ এতে প্রথমেই তোমার অন্য সবাইকার ইচ্ছার সঙ্গে সংঘাত বেধে যাবে। তুমি যদি কোনো সংসারের মধ্যে থাকো তাহলে দেখবে যে তখন তোমার প্রতি সেই সংসারের সকলেরই কেমনতরো মনোভাব! ভগবৎ-ইচ্ছা সম্পর্কে যতই তুমি নমনীয় হবে ততই দেখবে যে যারা তা চায়না তারা তোমার সঙ্গে ততই বেশি বিরোধিতা করতে থাকবে।

সকলেই যদি ভগবৎ-ইচ্ছাকে মানতে থাকে, তাহলে সংঘর্ষের কোনো প্রশ্নই আর থাকেনা, সকলেরই মধ্যে ইচ্ছার মিল হয়ে যায়। আমরা এখানে তারই জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু সে খুব সহজ কাজ নয়।

প্রশ্ন কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছাকে জানতে পারাই তো কঠিন, তাই নয় কি?

উত্তর এ কথা নিয়ে আগেই অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, তা কি মনে নেই? ভগবৎ-ইচ্ছা জানতে পারা সম্পর্কে চারটি শর্ত আছে—

প্রথম মূল শর্ত—ঐকান্তিকতা
দ্বিতীয় শর্ত—কামনা ও লোভ প্রভৃতিকে জয় করা
তৃতীয়—মনকে নীরব ক'রে উন্মুখ ক'রে রাখা
চতুর্থ—আদেশ আসা মাত্র তখনই প্রতিপালন করা।

এই শর্তগুলি বজায় রাখলে তুমি উত্তরোত্তর স্পষ্টভাবেই ভগবৎ-ইচ্ছাকে টের পেতে থাকবে। কিন্তু তা টের পাবার আগের থেকেই তুমি তোমার নিজের ইচ্ছাগুলোকে নিবেদন ক'রে দিতে পারো, তাতে দেখতে পাবে যে ঘটনাধারার এমনভাবে যোগাযোগ ঘটে আসছে যাতে তুমি সমুচিত কাজটাই ক'রে ফেলছ। কিন্তু যেন সেই লোকটির মতো বলে বোসোনা, "ভগবৎ-ইচ্ছা যে কি তা আমি অন্যদের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই।" এর চেয়ে বিপজ্জনক জিনিস আর কিছু নেই, তুমি এতে যে কোনখানে গিয়ে পড়বে তার কোনো ঠিকানা থাকবেনা, —কারণ তখন তুমি অন্যদের ইচ্ছাকেই অনুসরণ করতে থাকবে, ভগবানের ইচ্ছাকে নয়। এ সম্পর্কে এমন কথাও বলা যায় যে বহুর মধ্যে একজনও প্রকৃত ভগবৎ-ইচ্ছাকে অনুসরণ করেনা।

সেই দুরন্ত হাতির গল্পটা তোমরা সকলেই তো জানো, হাতিকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখেই একজন রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল, বললে, "আমি এখান থেকে নড়বনা, আমার মধ্যে ভগবান আছেন তিনি তাই ইচ্ছা করছেন।" হাতির উপর যে মাহুত ছিল সে লোকটি চতুর, সে বললে, "কিন্তু এই হাতির মধ্যেও যে ভগবান আছেন, তিনি বলছেন তুমি সরে দাঁড়াও"।

মা অতঃপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, রোগপীড়া সম্পর্কে। কেউ প্রশ্ন করেছিল,—রোগপীড়াগুলি কি বিরোধী শক্তির। আসে বা তা যোগের ত্রুটিতে হয়, অথবা তা রোগবীজাণু কর্তৃক হয়ে থাকে। মা পড়লেন—

"যোগের আরম্ভ কোথায় আর শেষ কোথায়? সমগ্র জীবনটাকেই কি যোগ বলা যায়না? কিন্তু রোগের সম্ভাবনা তো সর্বক্ষণই রয়েছে তোমার দেহের মধ্যে ও দেহের চতুর্দিকে; রোগের বীজ বীজাণু সর্বদাই তোমাকে ঘিরে আছে, তোমার ভিতরেও তারা বাস করছে। তাহলে এমন কেন হয় যে তাই নিয়ে বছরের পর বছর বেশ নিরুপদ্রবে কেটে গেল, রোগ তোমাকে তখন স্পর্শমাত্র করলনা, অথচ হঠাৎ একদিন তোমাকে আক্রমণ ক'রে বসল? তুমি হয়তো বলবে,"প্রাণশক্তির কিছু অবনতি হওয়াতেই সেটা হয়েছে।" কিন্তু তেমন অবনতি আসে কোথা থেকে? নিশ্চয় তোমার সত্তার মধ্যে একটা অসঙ্গতি ঘটে থাকবে, ভগবৎ-শক্তিকে গ্রহণ করবার কিছু ত্রুটি ঘটে থাকবে, তার থেকেই হয়েছে। যে শক্তি ও তেজ তোমাকে নিত্য রক্ষা ক'রে আসছে তাকে যখন তুমি ছিন্ন বা ব্যাহত করো, তখনই তোমার মধ্যে ঐরূপ একটা অবনতির অবস্থা আসে, ডাক্তারি শাস্ত্রে যাকে বলে 'রোগের অনুকূল ক্ষেত্র' আর অদৃশ্য শত্রুরা তখনই সে অবস্থার সুযোগ নেয়। সন্দিগ্ধতা, বিমর্ষতা, আত্মহীনতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, এইগুলোই তোমাকে ভগবানের আলো ও তেজের ক্রিয়া-প্রভাব থেকে বঞ্চিত করে, তার ফলেই রোগ আক্রমণের সুযোগ আসে। রোগ এইভাবেই হয়, কেবল বীজাণুর দ্বারা নয়।"

আজকাল সকলেই, এমন কি ডাক্তারেরাও এ কথা মানছে যে স্বাস্থ্যপালনের উপায়গুলি তখনই ফলপ্রদ হতে পারে যখন তার উপর তোমার বিশ্বাস থাকে। ধরো, কোনো রোগের এপিডেমিকের সময়ে কি হয়। এখানে অনেক বছর পূর্বে একবার কলেরার খুব প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে উঠল। হাসপাতালের প্রধান ডাক্তারটি ছিল খুব উৎসাহী ব্যক্তি, সে রোগ-প্রতিরোধের জন্য এ অঞ্চলের সবাইকে ইনজেকসন দেবার ব্যবস্থা করলে। প্রতিজনকে ইনজেকশন দেবার পরেই তাকে বলা হতো, "এতেই তুমি বেঁচে গেলে, আর তোমার এ রোগ হবার ভয় রইল না, কিন্তু যদি এটি না নিতে তাহলে হয়ত মারা যেতে।" এ কথা তাদের প্রত্যেককে বিশেষভাবে শুনিয়ে দেওয়া হতো। এ দেশে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হলে তাকে সহজে থামানো যায়না, তা অনেককাল পর্যন্ত চিঁকে থাকে, কিন্তু ঐ ডাক্তারটি এই ব্যবস্থা ক'রে পনের দিনের মধ্যেই তা থামিয়ে দিলে। আশ্চর্য রকমে যে এত শীঘ্র এমন ফল হলো, তার কারণ ঐ ডাক্তারটি বিলক্ষণ জানতো যে লোকের মনে একটা বিশ্বাস জন্মে দিতে পারলে প্রতিষেধের ফল খুব ভালো হবে।

আরো একটা কথা ওরা খুবই সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে, যা অতি চমৎকার জিনিষ বলেই আমি মনে করি। ওরা দেখেছে যে প্রত্যেক রকম রোগবীজাণুর বিরুদ্ধেই ঠিক তার

বিপরীত রকমের আরোগ্য-বীজাণু ও আছে (তাকে বীজাণুই বলো বা বীজঘই বলো বা প্রতি-রোধবস্তুই বলো)। এর চেয়েও আশ্চর্যের কথা এই-যে এই সব "আরোগ্য-বীজাণু" আসল রোগবীজাণুদের চেয়ে আরো বেশিরকম দ্রুত সংক্রামক। দু'রকম অবস্থা এদের দ্রুত বৃদ্ধির পক্ষে খুব অনুকূল—শরীরে যথেষ্ট প্রাণশক্তির তেজ বজায় থাকা, এবং মনে আরোগ্যলাভের ইচ্ছা প্রবল থাকা! যাদের তা আছে তাদের মধ্যে এই সব "আরোগ্য-বীজাণু" খুব তাড়াতাড়ি সংক্রামিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাতেই তারা আরোগ্য লাভ করে। আবার অদ্ভুত ব্যাপার এই যে ঐরূপ রোগ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে একজন যদি সেরে উঠল তখন তার পরেই আরো তিন জনকে সেরে উঠতে দেখা গেল। আর যারা যারা সেরে ওঠে তাদের সকলের মধ্যেই থাকে ঐ "আরোগ্য-বীজাণু"র প্রাচুর্য।

কিন্তু এখানে একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি যাকে বীজাণু বলা হচ্ছে তা হলো বস্তুত অন্য কোনো জগতের ইচ্ছাশক্তির স্পন্দন বা কম্পনেরই বাস্তবে রূপ নেওয়া জিনিস। আমি যখন এই সব নতুন তথ্যের আবিষ্কারের কথা শুনলাম তখনই বললাম, "হাঁ, বিজ্ঞান যথার্থই উন্নতি করেছে বটে।" তার চেয়ে আরো যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায়, "জড়েরই ক্রমিক উন্নতি হচ্ছে,"—অর্থাৎ জড় উত্তরোত্তর উচ্চতর ইচ্ছার গ্রহিষ্ণু হয়ে হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানে যাকে বলছে "বীজাণু", তার মূল পর্যন্ত চলে যেতে পারলে দেখবে যে তা কোনোরূপ স্পন্দনক্রিয়ার বাস্তব আকৃতি লাভ, এবং সে আকৃতি কোনো উচ্চতর ইচ্ছার দ্বারাই গঠন নিয়েছে। যদি কোনো বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে সেরূপ ইচ্ছাকে বা শক্তিকে বা স্পন্দনকে (যে নামই দাও) নামিয়ে আনতে পারো, তাহলে দেখবে যে তা কেবল তোমারই মধ্যে কাজ করবে না, কিন্তু তার সংক্রমণ তোমার চারিপাশে আরো বেশি ছড়াবে।

প্রশ্ন (কোনো ভক্তের দ্বারা) রোগের বীজাণু সংক্রমণ যে বিশ্বাস করেনা, সে কেন পরিশুদ্ধ জল পান করবে?

মা তার উত্তরে পড়ে শোনালেন—

"তোমাদের মধ্যে কে এমন পুরো বিশুদ্ধ ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি আছে যে কোনো ধারণার প্রভাবের দ্বারা একটুও প্রভাবিত হয়না? অপরিশুদ্ধ জল পান ক'রে যেমনি তুমি মনে মনে ভাববে যে আমি অপরিশুদ্ধ জলটা খেলাম, অমনি তোমার তার দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়ে গেল। যদিও তোমার চেতন মনে তার প্রভাব ঢুকতে না পায়, তথাপি তোমার অবচেতন মন সম্পূর্ণই উন্মুক্ত আছে সেটিকে ধরে নিতে।...মানুষ স্বভাবতঃই ভয়ে ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ। মাত্র দশ মিনিটের জন্য যদি তোমার স্থূল মনের দিকে লক্ষ্য রাখো তো দেখবে তার মধ্যে নয় মিনিটই আশঙ্কা-জড়িত।...আর যদিও বা চেষ্টা ও সংযমের দ্বারা তোমার মনকে ও প্রাণকে আশঙ্কামুক্ত করে নিতে পারো, তথাপি দেহসত্তাটিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রবোধ দিতে পারা খুবই কঠিন।"

প্রশ্ন : মন প্রাণকে যদি ভয়মুক্ত করলাম, তবুও দেহসত্তাকে নির্ভয় করা কঠিন হবে কেন ?

উত্তর : তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেহ থাকে অবচেতনের প্রভাবের অধীনে, অবচেতনের কাছ থেকেই সে যা কিছু নির্দেশ পেয়ে থাকে। যাবতীয় ভয়গুলি সক্রিয় চেতনার কাছে তাড়া খেয়ে সমস্তই আশ্রয় নিয়ে থাকে ঐ অবচেতনের মধ্যে, সেগুলিকে নির্মূল করতে হলে অবচেতনের ভিতর থেকেও তাদের তাড়াতে হয়।

প্রশ্ন : আমরা ভয় কেন ক'রে থাকি ?

উত্তর : তোমাদের মধ্যে যতক্ষণ অহং আছে, ততক্ষণ সেই কারণে ভয়ও আছে। ভয়ের তিনটি হেতু প্রথম, নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অতিউদ্বিগ্নতা। দ্বিতীয়, অজানার সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার অলোড়ন, যা জাগ্রত চেতনাতে গিয়ে ভয়ে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়, সব চেয়ে বড়ো কথা, ভগবান সম্বন্ধে একটা সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত আস্থা ও নির্ভরতার অভ্যাস না থাকা। যদি বহুদূর পর্যন্ত তলিয়ে দেখ তো জানতে পারবে যে এটিই হলো প্রকৃত কারণ। "তৎ" বা "তিনি" যে আছেন, এই কথাটাই অনেকে জানে না। এ তথ্য যেমন ভাষাতেই প্রকাশ করো—"নিজের নিয়তির উপর তোমার বিশ্বাস নেই" কিংবা "ভগবৎকৃপা যে কেমন জিনিস তাই জানা নেই",—যে ভাবেই বলো, আসল অর্থ হলো আস্থাহীনতা। তার বদলে যদি এই ভাবটি সর্বক্ষণই তোমার মনের মধ্যে জেগে থাকে, যে, যখন যেটি হচ্ছে তা নিশ্চয় কিছু ভালোর জন্যই হচ্ছে, তাহলে ভয়ের আর কোনো কারণই থাকেনা।

ভয়ের প্রথম ক্রিয়ালক্ষণটি আপনাআপনি এসে পড়ে। কোনো মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত (নামটি আমার স্মরণ নেই) আভ্যন্তরীণ চেতনা পেয়ে তার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রমাণ দেখতে চাইলে। পরীক্ষা ক'রে সে দেখতে চাইলে যে সচেতন চেষ্টার দ্বারা দৈহিক প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়াকে নিবারণ করা যায় কিনা (যদিও তা করা যায়, কিন্তু তার পক্ষে তখনও তা সম্ভব হয়নি)। চিড়িয়াখানাতে ঢুকে সে চলে গেল সাপের ঘরে, যেখানে কাঁচের আবরণের ভিতর অনেক সাপ রাখা থাকে। ওর মধ্যে এক দুর্দান্ত গোখরো সাপ ছিল। সে যতক্ষণ জেগে থাকতো সব সময়েই ফোঁস ফোঁস ক'রে তেড়ে আসতো, মানুষ দেখলেই সে ক্ষেপে উঠত। আমাদের এই মনস্তত্ত্ববিদ্ দাঁড়ালো গিয়ে তার সামনে। সে অবশ্যই জানতো যে কাঁচের আবরণ ভেদ ক'রে ঐ সাপের আক্রমণের কোনোই সম্ভাবনা নেই। তাই সে নানাভাবে সাপ-টাকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করলে। সাপ তেড়ে এসে কাঁচের উপর বারে বারে ছোবল মারতে থাকল। আর যতবারই সে তেড়ে এসে ছোবল মারে ততবারই সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ নিজের চোখ বুজিয়ে ফেলে ! সে নিজেই বলতে থাকল, "আমার বেশ জানা আছে যে

ওতে আমার কোনোই ক্ষতি হবেনা, কারণ কাঁচের বাইরে ও আসতেই পারবে না, তবু এমন ক'রে চোখ বুজিয়ে ফেলি কেন?" তবেই দেখ, দৈহিক প্রতিক্রিয়াকে ঠেকিয়ে রাখা খুবই কঠিন। নিজেকে বাঁচাবার প্রেরণা থেকেই ওটি আসে, আর যখন বোধ হয় যে নিজেকে রক্ষা করা বুঝি গেলনা, তখনই আসে ভয়। কিন্তু ঐভাবে চোখ বুজিয়ে ফেলা, ওটি মনের কিংবা প্রাণের তরফের ভয় নয়, ও হলো যত দেহকোষের তরফের ভয়, কারণ তারা এটা বোধ করতে শেখেনি যে ওতে বিপদের কিছু নেই, আর বিপদ এলে কেমন ক'রে যে তার নিবারণ হতে পারে তাও তারা জানেনা। যোগের অভ্যাস করা হয়নি, তাতেই এমন, নয় কি? যোগে অভ্যস্ত হলে তুমি ঐ অবস্থাতে চোখ সোজাভাবে খুলেই রাখবে, বুজিয়ে ফেলবে না। এবং তখন তার দরকারও হবেনা, কারণ তোমার দেহের মধ্যে একটা নির্ভরতা এসে গেছে "অন্য জিনিসের" উপর, আর সেই "অন্য জিনিসটি হলো নিজের মধ্যে ভগবদ্ উপস্থিতি, যা সব কিছুর চেয়েই বলবান।"

কেবল সেই জিনিসই তোমাকে সকল ভয় হতে মুক্ত করতে পারে।

(এই আলাপের অনেক বছর পরে ১৯শে, ১৯৬৫ তারিখে কোনো ভক্ত এই প্রসঙ্গে আবার এক প্রশ্ন করে)—

প্রশ্ন আপনি বলেছেন, "যদি তোমার মধ্যে সর্বক্ষণ এই ভাবটি জাগরূক থাকে যে যখন যা হচ্ছে তা ভালোর জন্যই হচ্ছে, তাহলে আর ভয়ের কোনো কারণ থাকেনা।" কিন্তু সত্যই কি তাই হয়, যখন যেটা হয় সেটা সব ক্ষেত্রে ভালোর জন্যই কি হয়ে থাকে?

উত্তর সে ভালোর অর্থ পুরোপুরি রকমের সর্বকালের ভালো নয়—জগতের বর্তমান অবস্থা অনুসারে তখনকার ভালো।

এখানে দুটি জিনিস বিবেচ্য সমগ্রের দৃষ্টিতে ভগবানের আসল উদ্দেশ্যের দিক থেকে যখন যেমন সর্বাপেক্ষা ভালো হওয়া সম্ভব প্রতি মুহূর্তেই তখনকার জন্য তাই হচ্ছে; আর, যে ব্যক্তি চেতনভাবে ভগবদ্ ইচ্ছার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছে তার সেই ভগবদ্ উপস্থিতির দিক থেকে যখন যেটা সর্বাপেক্ষা ভালো সেটাই হচ্ছে।

এই হলো ও-কথার সঠিক অর্থ।

সমগ্রের দৃষ্টিতে দেখলে বিশ্বের ক্রমবিবর্তনের পক্ষে প্রতি মুহূর্তে যখন যেমন সর্বাপেক্ষা আনুকূল্যজনক তাই হচ্ছে। আর যে সব জিনিস চেতনভাবে ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত তার সেই সংযোগকে সম্পূর্ণতর করতে যখন যা সর্বাপেক্ষা ভালো তাই হচ্ছে।

কেবল এই কথাটি ভুললে চলবে না যে পরিবর্তনের ক্রিয়া নিত্যই হয়ে চলেছে, সুতরাং ভালো হওয়াও কোনোটাই স্থায়ী নয়; এখনকার ভালোকে যদি স্থিতি করে রাখো,

তথাপি তা আর পরমুহূর্তের পক্ষে ভালো হবেনা। কিন্তু মানব চেতনা চায় সব জিনিসকেই স্থায়ী ক'রে রাখতে, তাই যখন যেটাকে ভালো বলে বোধ করে, কিছুক্ষণ পরেই দেখে সে-ভালোকে ধরে রাখা গেল না। ভালোকে এমনি ধরে রাখবার চেষ্টাতেই তা মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়।

(নীরব থেকে)

এই ব্যাপারটি আমি তখনই লক্ষ্য করেছি যখন বুদ্ধে দেখতে গেলাম যে বুদ্ধ কেন বিশ্ব অভিব্যক্তিকে অনিত্য ও অস্থায়ী বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন, তাঁর কাছে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব ছিল একই বস্তু। অভিব্যক্ত বিশ্বের সংস্পর্শে গিয়ে তিনি দেখলেন যে তা প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে, তাই তিনি বুঝলেন যে এ জিনিস অপূর্ণ এবং অনিত্য, স্থায়ী হবার নয়। কেবল যা অনস্তিত্ব ও অনভিব্যক্ত তারই কোনো পরিবর্তন নেই, সেই জিনিসই প্রকৃত ঈশ্বর। ভালো ক'রে কথাটা ভেবে বুঝলাম যে তাঁর এই অভিমত এক হিসাবে যথার্থ এই বিরাট অভিব্যক্তি নিতান্তই অস্থায়ী, কারণ প্রতিনিয়তই এর রূপান্তর ঘটছে।

কিন্তু এ অভিব্যক্তির মধ্যেও এক বিষয়ে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব রয়েছে ওর অবিরাম রূপান্তর ও ক্রমোন্মীলনের ক্রিয়াটিতে, সেই মৌলিক ক্রিয়াটিই ভগবানের সঙ্গে অভিন্ন। অপরপক্ষে যা নিশ্চেতন বা তামসিক সৃষ্টি তা কিন্তু চাইছে ঐরূপ রূপান্তরের বদলে তার স্থায়িত্বকে চিরদিন একভাবে বজায় রাখতে।

এই সব কারণেই কোনো কোনো চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন যে সৃষ্টিটা হলো কোনো ভ্রান্ত ক্রিয়ার ফল। কিন্তু তার থেকে আবার নানারকম সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত এসে পড়ে: হয়তো সৃষ্টিটা পূর্ণভাবেই হয়েছিল, অতঃপর তার মধ্যে "দোষ" ঢুকে এইরূপ ভ্রান্তির অবস্থা এসে পড়ল; কিংবা সৃষ্টির ব্যাপারটাই একটা নিম্নতর ক্রিয়া, যার প্রথমে একটা আরম্ভ ছিল এবং অতএব তার সমুচিত সমাপ্তিও থাকবে কিংবা যেটা বৈদিক ধারণা, যার কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, একটা অনন্ত আবিষ্কারধারা বা ক্রমবিকাশগত উন্মীলন—যা চিরন্তনই অসীম ও অনির্দিষ্ট—যার দ্বারা সর্বপূর্ণময় নিত্যই নিজেকে বিকাশ ক'রে চলেছেন। অবশ্য এগুলি সমস্তই হলো কেবল মানুষেরই নিরূপণ। আপাতত যাবৎ তুমি তোমার মানবীয় ভাষাতে এ সম্পর্কে বলবে তাবৎ তোমার ভাষা তোমার ব্যক্তিভিত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীরই অনুগামী হবে (অর্থাৎ একে "মৌলিক ভ্রান্তি"ই বলো "দৈবক্রমে" এমন হয়েছেই বলো, বা পরমতম ভগবদ্ ইচ্ছাতে এটা ক্রমিক আত্মোৎঘাটনের ধারাই বলো), আর যোগের দিক থেকে যাকে বলা হয় "অবতরণ" তা আবার অন্য কথা...তদ্ভিন্ন নিরীশ্বরবাদী, নির্বাণবাদী, মায়াবাদী মতও আছে: অনেক ধর্মে বলেছে যে এর মধ্যে শয়তানের প্রভাব ঢুকে পড়াতেই এমন হয়েছে; আর বিশুদ্ধ বেদের মতে পরাৎপর চিরন্তনভাবে নিজেকে নিত্য এমনি রূপান্তরিত ক'রে চলেছেন। যার যেমন রুচি তদনুযায়ী এর মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেয়, পরস্পরের মধ্যে তারতম্য খুবই সূক্ষ্ম। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ

যাকে বলেছেন সব চেয়ে সামগ্রিক সত্য, অর্থাৎ বিশ্বের চিরন্তন ক্রমবিকাশমানতা, তদনুযায়ী প্রত্যেক মিনিটের পক্ষে যা সব চেয়ে ভালো হওয়া সম্ভব তাই হচ্ছে প্রত্যেক মিনিটে, সামগ্রিক ক্রমবিকাশের প্রয়োজনে। এযুক্তি পুরোপুরিভাবে ন্যায্য। আমার মনে হয় যে এর বিরুদ্ধে যা কিছু প্রতিবাদ আসতে পারে তা কেবল অন্যান্য মতগুলির কোনোটির প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বের ফলে, যে যেমন তত্ত্বকে সমর্থন করছে তদনুযায়ী। যারা ভাবে যে কোনো "দোষ" বা "ভ্রান্তি" সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে পড়াতেই শক্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে এমন বিরোধ এসে গেছে, কোনোটি ঠেলছে এদিকে, কোনোটি ওদিকে, এই নিয়ে তারা নানারূপ বাদানুবাদ করতে থাকে।

কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ ইচ্ছা বা পরমতম সত্যের সঙ্গে নিজেকে আধ্যাত্মিক ভাবে সংযুক্ত করেছে, ব্যক্তিগত উপলব্ধির দিক থেকে তার পক্ষে প্রতি মুহূর্তের অবস্থাতে যখন যা হচ্ছে তা ভালোর জন্যই হচ্ছে। সকল ক্ষেত্রেই তাই। কেবল যে দেখছে যে পরাৎপর তাঁর চেতনাকে এইরূপে উদঘাটিত করছেন ক্রমবিবর্তনের পথে, তার কাছে বিনা বাধায় সবই হচ্ছে ভালো।

(নীরব থেকে)

আসলে এ সব কথার বিশেষ মূল্য নেই, কারণ যা আছে তা আছেই, কেন আছে তার জবাব সকল দিক থেকে মানব-চেতনা ও মানব-চিন্তার একেবারে অতীত। কেবল যখন তুমি এই মানবের অবস্থাতে না থেকে জ্ঞাতার অবস্থাতে উঠে যাবে তখনই তা জানতে পারবে, কিন্তু যেমনি চাইবে সেই জ্ঞানকে ব্যক্ত করতে, অমনি আবার ফিরে আসবে মানব-গণ্ডীর মধ্যে, আর তখন তোমার সেই জানার বোধটি খেনে যাবে।

এ কথা অখণ্ডনীয়।

এই অক্ষমতার কারণেই মানুষের বুদ্ধিতে বোঝবার মতো ক'রে এ সমস্যার সমাধান করতে গেলেই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সেই লোকটির মতো বলাই বিজ্ঞজনোচিত "এখানে যখন এসেছি তখন নিশ্চয় আমার একটা কিছু করবার আছে, কেন বা কি প্রকারে তাই নিয়ে অনর্থক মাথা না ঘামিয়ে যা করণীয় তা যতটা ভালোভাবে করতে পারি তাইই করে যাই।" জগৎ কেন এমনতরো হলো ?...এ কথা বোঝবার ক্ষমতা যখন আসবে তখনই তা বুঝতে পারব।

ব্যবহারিকের দিক থেকে এই হলো স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি।

তবে প্রত্যেকে এক একটা ধারা নিয়ে থাকে...তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত বললাম, যে যেমন মনোভাব গ্রহণ করে তার প্রতিক্রিয়াও তদনুরূপ হয়, এটা স্পষ্টই দেখতে পাই। দেখতে পাই যে সেই একই অনন্ত শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুসারে ফল দেয় বিভিন্ন প্রকার, কিন্তু সে "বিভিন্নতা" গভীরতর দৃষ্টিতে উপরিগত মাত্র, "অমুকের ঐরূপ ভাবটাই কাম্য, হাঁ ওদের ওটাই পছন্দ"। কিন্তু ভিতরদিকের পথযাত্রার, আভ্যন্তরীণ উন্মীলন ও স্পন্দন-

বিকাশের ওতে কোনো ব্যতিক্রম হয়না। কেউ বা মনে প্রাণে চাইছে নির্বাণ, কেউ বা তার সকল আস্পৃহা দিয়ে আস্পৃহা করছে অতিমানস অভিব্যক্তির জন্য, কিন্তু তাতে যে স্পন্দনক্রিয়া জাগে তার ফল হয় প্রায় একই রকম। আর এই জাতীয় স্পন্দন উত্তরোত্তর একত্রে জমে উঠছে...অবশ্যম্ভাবীকে গ্রহণের জন্য।

কিন্তু ব্যবহারিক স্তরে, যেখানে আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রয়োগ হচ্ছে, সেখানে মানুষের যত কিছু নিষ্ফলতা হতে পারে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিষ্ফল জিনিস হলো দার্শনিক তত্ত্ব।

১৭ মার্চ, ১৯৫১

পূর্বোক্ত পুস্তক থেকে—"বিশ্বের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে উপস্থিত যা ঘটছে তা পূর্বগত ঘটনার ক্রিয়াফলের অনুগমনস্বরূপ..."

প্রশ্ন : এ কথার দ্বারা কি বোঝাবে?

উত্তর বিশ্ব তো নিরবধি প্রগতিশীল, যার দ্বারা পরাচেতনার উত্তরোত্তর ক্রমস্ফুরণ হচ্ছে। সুতরাং এখন যা ঘটছে তা পূর্ব ঘটনার সাপেক্ষে। বিশ্বের এখনকার অবস্থা এর আগেকার অবস্থা হতেই উদ্ভূত, এবং সে অবস্থাও উদ্ভূত হয়েছিল তারও আগেকার অবস্থা হতে। এবং এর পরের অবস্থা যা হবে...তা হবে এখনকার অবস্থারই অনুবৃত্তির ধারাতে।

প্রশ্ন বিশ্বের এমন ক্রমস্ফুরণ কি চিরদিনই চলতে থাকবে, না শেষ পর্যন্ত একটা কোথাও গিয়ে থামবে? কেমন ক'রে আমরা ধারণা করব যে এর প্রথম কোথায় সূচনা হয়েছিল বা তার সম্বন্ধে প্রথম সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল?

উত্তর এর সূচনার কোথায় সিদ্ধান্ত করা হলো?...(মা হাসলেন) বোধ করি সেই পরাৎপর থেকে, কেমন ক'রে তা জানবো! হয়তো কোনো একদিন তিনি সাব্যস্ত করলেন যে এমনি একটা বিশ্ব রচিত হোক, তাই নিজেকে বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করলেন।

বিশ্বের যা কিছু উপাদান তা সমস্তই চিরন্তন, যেহেতু গোটা বিশ্বই চিরন্তন। চিরন্তন কিছুর বেলাতে "সূচনার" কথা বলা কঠিন, যেহেতু তা নিরবধি কালই আছে ও নিরবধি কালই থাকবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ (এ কথা বলছি রূপক হিসাবে, আমার বক্তব্যকে যেন ভুল বুঝোনা)—কল্পনা করো এমন একটা বৃত্তকে যা অতি সূক্ষ্ম তিসূক্ষ্ম বস্তুতে সংখ্যাতীত ভাবে পরিপূর্ণ। সেই বস্তুগুলিকে নিয়ে যদি লোট পাকিয়ে অদলবদল করতে চাও, পরিমাণে তা এতই বেশি দেখবে ও তার পারস্পরিক সম্পর্কের সম্ভাবনা এতই অসংখ্য রকমের হবে

যে তোমাকে সেখানে অনন্তের হিসাবেই তা বলতে হবে, যদিও দার্শনিক দৃষ্টিতে তা অনন্ত হতে পারেনা, তথাপি বলবার সময় তোমাকে সংখ্যাহীন অনন্তই বলতে হবে। তার মধ্যে আবার সকল উপাদানই হলো চিরন্তন। সেগুলিকে নিয়ে যতরকমই জোট বাঁধতে চাও তাও হবে সীমাহীন, আর কোনোরূপ জোটবাঁধাই একবারের বেশি দুবার হবেনা। এমন যদি এই বিশ্ব হয়, তাহলে তা চিরনূতনই থাকবে, আর নিজে তা চিরদিনই চিরন্তন থাকবে।

প্রশ্ন কিন্তু প্রবাদে বলেছে—

উত্তর জানি জানি, কিন্তু এটা প্রবাদের প্রশ্ন নয়। লোকে অনেকেই বলে থাকে 'প্রলয়ের' কথা, কিন্তু তার মানেটা এমনি দাঁড়ায় (কিছু মনে করো না, রহস্যচ্ছলেই এটা বলছি নতুবা অসহ্য লাগবে)—যেন সেই পরম পুরুষ হঠাৎ একদিন ক্লান্ত হয়ে উঠে এক রকমের মামুলী ধরনের বিশ্বে আর খুশি না থেকে অন্যরকম বিশ্ব সৃষ্টি করতে চাইলেন! কিন্তু তিনি নিজেই তো এর সব কিছু, তাই সব কিছুকেই একবার নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে আবার নতুন ক'রে তা বাইরে বের ক'রে দিলেন! একেই যদি 'প্রলয়' বলো, তথাপি তাতে বদলায় না তো কিছুই। কারণ বিশ্বের চিরন্তন উপাদানগুলো চিরন্তনই রয়ে গেল, তার বিভিন্ন রকম জোটবাঁধাও চিরন্তন ভাবেই বিভিন্ন হতে থাকলো।

"বিজ্ঞানের মতে আমাদের এই ত্রৈমাত্রিক জড়জগৎ সীমাহীন নয়; তিন মাত্রা অপেক্ষাও বেশি রকম মাত্রাতে এক অবস্থানের মধ্যে নিজের থেকে বাঁক নিয়ে রয়েছে। এর ত্রৈমাত্রিক গণ্ডীতে বিশ্ব অনবরতই নিজেকে যত প্রসারিত করছে ততই এর ভিতরকার জিনিসগুলি পরস্পর থেকে ছুটে দূরে সরে যাচ্ছে। দূর অতীতের দিকে যদি ফিরে চাও তাহলে শেষ পর্যন্ত এমন এক সময়েতে গিয়ে পৌঁছবে যখন বিশ্ব ছিল একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত, এখন আমরা যে বিরানব্বুই রকমের জড় উপাদানের কথা জানি তার কিছুই তখন জানা ছিল না। এমনি এক "কেন্দ্রগত বিন্দু"র বা "মৌলিক অ্যাটম্"এর অবস্থাটা ছিল প্রায় ত্রিশ চল্লিশ সহস্র কোটি বৎসরের আগে, ভারতীয় প্রবাদে তাকেই বলে "স্বর্ণডিম্বাবস্থা"। কিন্তু তারও পূর্বে কি ছিল? কিছুই জানা নেই। সম্প্রতি এক আমেরিকান বিজ্ঞানী এই তত্ত্ব নির্ধারণ করেছেন যে বিশ্বের এমন অনন্তরূপ প্রসারণ হতে থাকা চিরদিন চলবে না, এর পরে বিপরীত ক্রিয়া শুরু হবে, সব কিছুই যখন একত্রে ক্রমশ গুটিয়ে আসবে।"

অর্থাৎ একে বলা যায় বিশ্বের নিশ্বাস ও প্রশ্বাস ক্রিয়া।

"সূর্য থেকে আলোকরশ্মি যাত্রা ক'রে যখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তার সাথে সাথে যদি কেউ যাত্রা ক'রে আসতে পারে, তাহলে তার আপন 'সময়ের হিসাব'টা একেবারে থেমে যাবে।"

কিন্তু আমার বোধ হয় যে চেতনার গতির সাথে সাথে যাত্রা করতে পারার পক্ষে ঐ আলোকরশ্মির যাত্রাগতি অতি স্থূল ও অপারগ। বস্তুত চেতনাতে যখন সাকার থেকে

নিরাকারে চলে যাও তখন সবই সমকালীন ভাবে হয়ে যায়, কিন্তু আলোকের দ্বারা তা হয়না, তার মাপে আলোকের ঘনত্ব অনেক বেশি।

আমি সন্দেহ করি (যদিও তা সম্ভব হতে পারে) যে বিশ্বচেতনার গতির সঙ্গে কোনোই বাস্তব জিনিসের গতি সমকালীন হতে পারে কিনা।

"বস্তুতপক্ষে কোনো বস্তু বা সত্তা আলোর গতির সঙ্গে সমান তালে ছুটতে পারেনা, কিন্তু তা যদি সম্ভব হতো তাহলে আলোকরশ্মির যেমন অসংখ্য ছটাতে সারা বিশ্বকে ছেয়ে ফেলে, তেমনি সেই সত্তার দ্বারা বিশ্বের সব কিছুই এককালে অবজ্ঞাত হওয়া যেতো।"

কিন্তু তা হতে পারলেও বিশ্বের সম্বন্ধে বা এমন কি পৃথিবীর সম্বন্ধেও তেমন পরিপূর্ণ রকমের সমকালীন চেতনা আসবে না। কারণ জগদতীত আলোককে যে জেনেছে ও স্মরণ রেখেছে, তার কাছে পার্থিব আলোক যথেষ্টই মন্দগতি, যেহেতু তা অনেক বেশি ঘনত্বসম্পন্ন। তবে তাও উচ্চতর কিছুকে প্রকাশ করবে...ঠিক বলতে পারি না।

এই আলোক জিনিসটা প্রতীক হিসাবে খুবই ভালো, তথাপি তাও সামগ্রিক হয়না।

আলো কি চিন্তার চেয়েও দ্রুতগতি?...চিন্তাকে নিয়ে তেমন কিছু বাস্তব পরীক্ষা করতেই পারো না। শব্দ আলোর চেয়ে মন্দগতি, কিন্তু চিন্তা ওর চেয়ে অনেক দ্রুতগতি... আবার তা নাও হতে পারে। চিন্তা তৎক্ষণাৎ ঘটে গেল বলে তুমি অনুভব করো। কিন্তু দেহ দিয়ে কি চিন্তাকে রোধ করতে পারো? স্থূল অবস্থাকে বাদ দিয়ে কি চিন্তাকে লক্ষ্য করতে পারো? তা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়, নয় কি? কথাটা বুঝিয়ে বলি: মনে করো যদি তুমি দেহ ছেড়ে প্রাণময় জগৎ ছেড়ে মনোময় জগতে চলে যাও, সেখানকার অবস্থা দেখবে দেহাশ্রিত চিন্তার অবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেহসম্পর্কযুক্ত চিন্তা যেন আলোর মতোই তৎক্ষণাতের জিনিস, বা তার চেয়েও বেশি। কিন্তু দেহসম্পর্ক ছেড়ে যখন চলে গেলে মনের জগতে, তখন সেখানকার স্থানকালের বিচার কেবল মনশ্চেতনার মাপে, দেহ-চেতনার ক্ষেত্রে তা নেই। তোমরা যে বলো সময় বদ্‌লে গেছে, তার এই এক অর্থ হতে পারে। কারণ বিশ্ব-গঠনের মধ্যে ক্রমিক ঊর্ধ্বগামী চেতনাকে চুকিয়ে দেওয়া আছে, যাকে মনস্তাত্ত্বিক তর্কমতে বলতে পারো নব নব প্রকার জগতের বা মাত্রার (dimensions) ক্রমিক পরিচয়লাভ।

যেমন, এই কথা কথিত হয় যে পূর্বে কিছু যুগ যাবৎ এই পার্থিব জগৎ উপরের "অধি-মানস রাজ্যের" শক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো, কিন্তু বর্তমানে সেই শক্তিকে ছাপিয়ে এ জগৎ স্বয়ং অতিমানস শক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে অতএব যতবারই পৃথিবীতে নূতন নূতন শক্তি নেমে আসবে, ততবারই এখানের চেতনারও পরিবর্তন ও সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াগতিরও পরিবর্তন হবে। তোমরা বলছ যে বিশ্বপ্রসারণের ক্রিয়া উত্তরোত্তর শীঘ্রতর হয়ে আসছে; তার অর্থ এই হবে যে জগৎ-চেতনাই মাত্রাতে আরো বেশি ভরে উঠছে বলে একে বাধা হয়ে

তাড়াতাড়ি ঐরূপ প্রসারিত হতে হচ্ছে। এ হলো আধ্যাত্মিক ব্যাপারেরই বাস্তবে প্রতিফলন। আমাদের চেতনাকে আরো বাড়াবার জন্য উত্তরোত্তর পৃথিবীতে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তর হতে শক্তিধারা অধিকতর ক্ষিপ্রগতিতে এসে প্রবেশ করছে, যেন তৎক্ষণাৎ তা ঘটে যাচ্ছে। এই জিনিসেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি এখন আবিষ্কৃত হয়ে বিজ্ঞান প্রমাণ পাচ্ছে যে বিশ্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

আর একথাও সম্ভাবা হতে পারে যে এটা যেন নিশ্বাস নেওয়া ও প্রশ্বাস ছাড়ার মতো একটা স্পন্দনক্রিয়া। আর ঐ যে কেন্দ্রীভূত হওয়া মানে গুটিয়ে নেওয়া তা নাও হতে পারে, একরূপ গতিধারা ছেড়ে অন্যরূপ গতিধারা নেওয়া এমনও হতে পারে।

প্রশ্ন নক্ষত্রের। পরস্পর থেকে দ্রুতবেগে দূরে সরে যাচ্ছে...এর থেকে কি বোঝায়?

উত্তর : সব জিনিসেরই প্রতিচ্ছবি আছে, নয় কি? বিশ্ব ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এটা ধারণায় আনতে পারো, কিন্তু সেই বিশ্ব কিসের দ্বারা বিধৃত? বিশ্বকে ছাড়িয়ে তার বাইরে কী বস্তু থাকতে পারে? আমাদের ক্ষুদ্র মানব-মন তৎক্ষণাৎ এমন এক শূন্যতাকে কল্পনা ক'রে নেবে যার মধ্যে বিশ্ব রয়েছে বিধৃত হয়ে, কিন্তু এ অসঙ্গত কথা। বরং এইভাবে বলতে পারো, "যেন এমনি ভরে। একটা কিছু হবে" শুধু তোমার বক্তব্য বোঝাতে, যদিও বাস্তবিক তা নয়। কোনো একটা ধারণাকে নিখুঁত করতে হলে বাস্তবের ব্যাখ্যা ছেড়ে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাতে যেতে হয়, কিন্তু তাতেও সত্য অনেক দূরে থেকে যায়, কারণ সত্য মনো-গতও নয় স্থানগতও নয়, তা এমন কিছু যাকে ভাষায় বলা দুরূহ। এ অভিজ্ঞতা সর্ববিদিত: যখন তুমি পার্থিব চেতনা থেকে (শুধু পার্থিব কেন, ব্যক্তিচেতনা থেকেও) অন্যরূপ চেতনাতে গিয়ে পড়ো, অর্থাৎ তোমার ব্যক্তিগত অংশচেতনা থেকে মানসিক চেতনাতে গিয়ে উপস্থিত হও এবং তারই অনুভূতিকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করতে চাও, তখন দেখতে পাও যে কোনো শব্দটাতেই সেদিকের অর্থ ব্যক্ত হচ্ছেনা, কারণ আমাদের ভাষার সৃষ্টি হয়েছে কেবল মানব-মনের কাছে মানব-মনের অনুভবকে ব্যক্ত করতে। তারই উপযোগী শব্দ আছে নানারূপ, তার মধ্যে অনেক মাধুর্য ও সূক্ষ্ম রকমের বৈচিত্র্যও আছে, কিন্তু সকল ভাষার অতীত যে অনু-ভূতি তাকে প্রকাশ করবে কোনরূপ ভাষা দিয়ে? এখানেই কঠিন প্রশ্ন। তাই বোঝাবার জন্য তোমাকে বলতে হয়, "যেন এইরকম যেন ঐরকম" তথাপি তাতেও তুমি দেখবে যে সেই অনুভূতিকে এমন বিকৃত করলে যে তার উল্টা অর্থ হয়ে গেল।

প্রশ্ন : এই কারণেই বিজ্ঞান এত আত্মবিরোধিতায় ভরা।

উত্তর হাঁ, এবং অন্য জগতের অনুভূতি সম্পর্কে যে সব আধ্যাত্মিক পুস্তক লিখিত হয়েছে তাও আত্মবিরোধিতায় ভরা। তাতে যদিও বলে যে এটা ঠিক এইরকম, ওটা ঠিক

ঐরকম, যাতে সহজভাবে তোমার মনে ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—কিন্তু আগলে তাতেও তোমার মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মায়না।

বস্তুত কেবল নীরবতার দ্বারাই ঐরূপ অনুভূতির আদানপ্রদান হতে পারে।

অথচ এ কথা বলা হয়েছে (এবং তা সত্যই) যে ঐ সব অনাজগৎ অতিমানসের মতোই বাস্তবভাবে নিজেদের অভিব্যক্ত করবে। তাহলে তখন কি হবে? তার বিষয়ে কিছু বলতে কি নতুন রকম শব্দের উদ্ভাবনা হবে? বস্তুত তখন তাই দরকার।...কিন্তু সেখানেও কঠিন প্রশ্ন, কারণ নতুন শব্দ পাওয়া গেলে তারও আবার সমুচিত ব্যাখ্যার দরকার।

আগেকার দিনে যে দীক্ষা দেবার পদ্ধতি ছিল, তা এই হিসাবে ঠিক ছিল যে সেই নিয়মে কেবল তাদেরকেই জ্ঞানদান করা হতো যারা এমন গ্রহিষ্ণু অবস্থাতে পৌঁছেচে যে অর্থবোধক শব্দের সাহায্য ব্যতীত সরাসরি তাকে গ্রহণ করতে পারে। আমার বোধ হয় যে তখন ঐরূপ ব্যাপারই হবে—অতিমানসের জ্ঞান পেয়েও কেউ তা অন্যকে বোঝাতে পারবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেও প্রস্তুত হয়ে না উঠছে। তার ফলে এই হবে যে, এখন যেমন লোকে প্রায় বলে থাকে তখনও তাই বলবে, "ওঃ, এ তো নিতান্ত সাধারণ জীবনেরই মতো।" কারণ যে জিনিস সাধারণ জীবনের অন্তর্গত নয় তা আমাদের বোধসীমার সম্পূর্ণ বাইরে থেকে যায়, বাক্য দিয়ে তা ব্যক্ত হয়না।

আমাদের এখানকার কথাটাই ভেবে দেখ, যেখানে নানা বিশিষ্ট শক্তি নানারূপ স্পন্দনের ক্রিয়া করছে; সে ক্রিয়া চোখে দেখাও যায়না বা কোনোপ্রকারে ধরাছোঁয়াও যায়না—তার দ্বারা যে পরিবর্তন আসে তার একটা নিজস্ব ধারা থাকে (যেমন সকল প্রকার স্থূল ব্যাপারেও থাকে), সুতরাং যে অবস্থান্তর ঘটে তা হয় তারই নিয়মসঙ্গতি অনুসারে, তার সেই সূক্ষ্ম নিয়ম-সঙ্গতির ক্রিয়া তোমাকে জানতে দেয়না যে এখানে সাধারণ রকমের জীবনপ্রবাহ ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু জিনিস হচ্ছে। যাদের মনে সাধারণ বোধশক্তি ছাড়া অন্য কিছু নেই, যারা সাধারণ জীবনের ঘটনাবলী দেখতেই অভ্যস্ত, তারা বলবে, " ওঃ, এ তো এখানেও সেই স্বাভাবিক গতানুগতিক ব্যাপারই হচ্ছে।" যাদের স্থূলবোধ ব্যতীত অন্য কোনো বোধ নেই, কাজেই ঐরূপ স্পন্দনগুলিকে যারা অনুভব করেনা (কেউ কেউ চের পায় খুব ধোঁয়াটে ভাবে, কিন্তু যারা তাও পারেনা), যাদের মধ্যে আর কোনো জিনিসের সম্বন্ধে সাড়া নেই বা ভিতরে থাকলেও তা জাগেনি, তারা এখানকার জীবনধারা দেখে বলবে, "আমাদের পার্থিব জীবনেও এই রকমই হয়ে থাকে—তোমাদের মধ্যে হয়তো আলাদা নিজস্ব রকম কিছু মনোভাব গড়ে নিয়েছ, কিন্তু এখানকার বাইরেও তেমন নিজস্ব মনোভাব অনেকেই পোষণ করে; তোমরা হয়তো বিশিষ্ট এক রকমের প্রণালীকে অনুসরণ করছ, কিন্তু বিস্তর মানুষ এর বাইরেও আছে যারা এমনি কোনো একটা প্রণালীকে অনুসরণ করছে। মোটের উপর আমিও যেমনভাবে জীবন কাটিয়ে থাকি তোমরাও তেমনি ভাবেই জীবন কাটাও।"...এখন ধরো, যদি কোনো মুহূর্তে অতিমানস বাস্তবে অভিব্যক্ত হতে

থাকে এবং জড়ের উপর চেতন-ক্রিয়া করে, তথাপি যাদের মধ্যে তার স্পন্দন অনুভবের চেতনা নেই তারা তার কিছুই বুঝবেনা। অনেকে বলে, "অতিমানস শক্তি বাস্তবিক যখন কাজ করবে তখন তা চোখেই দেখা যাবে, স্পষ্ট বোঝা যাবে"—কিন্তু ঠিক তাই নয়। অল্প অনুভব-শক্তি নিয়ে যারা এখানে আসে এবং কিছুদিন থেকেও যায়, কিন্তু বাইরের আবহাওয়া থেকে এখানকার আবহাওয়ার পার্থক্যটা বোধ করতে পারেনা, তাদের মতোই তো হবে,—আর তোমাদের মধ্যেই বা কজন তা ঠিকভাবে বোধ করো?...হয়তো হৃদয়ে কিছু অনুভব আসে, মনে কিছু আন্দাজ আসে, তাও হয় অনেকটা অস্পষ্ট ধরনের, নয় কি? কিন্তু আমি বলছি সেই রকম সুনির্দিষ্ট সচেতন অনুভব আসার কথা—যেমন মনে করো জাপান থেকে প্রথম এখানে এসেই আমি বোধ করেছিলাম। সমুদ্রে ছিলাম জাহাজের উপর, কিছুই প্রত্যাশা করিনি (যদিও আমি আভ্যন্তরীণ জীবনেই অবস্থান করতাম, স্থূলতঃ জাহাজের উপরে থেকেও),—কিন্তু যেমনি পণ্ডিচেরির দুই মাইলের মধ্যে এসে পড়েছি, অমনি অকস্মাৎ আবহাওয়ার প্রকৃতি স্থূলভাবেই এতটা বদ্‌লে গেল যে আমি জানতে পারলাম আমি শ্রীঅরবিন্দের জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করছি। একেবারে প্রত্যক্ষ রকমের বাস্তব অনুভূতি, আর আমি জোর করেই বলব যে যথেষ্ট চেতনা যার জেগেছে সেও তাই বোধ করবে।"

এর উল্টা রকমের অনুভূতিও আমার মিলেছে অনেক বছর পরে, যখন প্রথম মোটরে উঠে এখান থেকে বাইরে একটু দূরে গিয়েছিলাম। যেমনি এখানকার লেকটা ছাড়িয়ে গেছি অমনি হঠাৎ টের পেলাম যে আবহাওয়া বদ্‌লে গেল—যেখানে ছিল প্রচুর শক্তি ও আলোর ঐশ্বর্য সেখানে সবই গেল কমে...কমতে কমতে ক্রমশ আর তার কিছুই রইলনা। তখন আমি মনশ্চেতনা বা প্রাণচেতনার মধ্যে ছিলাম না, সম্পূর্ণ দেহচেতনাতেই ছিলাম। দেহচেতনা যাদের যথেষ্ট অনুভবপ্রবণ তারা এটা বাস্তব রকমেই অনুভব করবে। আমি তোমাদের নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি যে যতখানি জায়গাকে আমরা "আশ্রম" বলে থাকি তার মধ্যে যে শক্তি ঘনীভূত রয়েছে, এই শহরের অন্যান্য অংশে ততটা নেই, এবং শহর থেকে বেরিয়ে দেহাতী অঞ্চলে তা আরো কম।

তাই তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, এই ঘনীভূত শক্তি সম্বন্ধে তেমন সুস্পষ্ট অনুভব (অর্থাৎ যাতে চেতনার মধ্যে এক বিশেষ রকম স্পন্দন জাগে) তোমাদের মধ্যে কে কে বোধ করে থাকো?...জানি, অনেকেই তোমরা অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু বোধ করো, এবং এমন কি যারা বাইরের থেকে আসে তারাও অনেকে টের পায়; একটা কিছু তফাৎ তারা বোধ করে এবং সে কথা বলেও থাকে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধরনে ঠিক সুনির্দিষ্ট ওজনে সুনির্দিষ্ট চেতনা কে কে পেয়েছে? আমি বিশেষ কাউকে উদ্দেশ ক'রে এ কথা বলছিনা, তোমরা প্রত্যেকেই নিজের অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখবে। ঐ যে ঘনীভূত শক্তি, তাই হলো অতিমানস শক্তির দূরাগত প্রতিফলন। যখন সেই অতিমানস শক্তি এখানে দৃঢ়রূপে স্থায়ী হবে, তখনই বা ক'জন লোক তা অনুভব করবে?...আর এখানকার সব কিছুই যে বদ্‌লে

যাচ্ছে তাই বা ক'জন বুঝবে? তোমরা কি বুঝলে আমার কথা? আমি যখন বলি যে মনের দ্বারা কোনো বিচার হয়না, তখন এরই ভিত্তিতে সে কথা বলে থাকি—মন কখনো জ্ঞানের যন্ত্র নয়, তার দ্বারা প্রকৃত জানা হয়না। একজন বিজ্ঞানী নিখুঁত বিশ্লেষণ ক'রে বলে দেবে যে কোন স্থানের বাতাসে বিভিন্ন উপাদানগুলি কত কত মাত্রাতে রয়েছে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে এই শক্তির উপাদানগুলি কতটা মাত্রাতে আছে তা কে বলতে পারে? কে বলতে পারে—এখানে এই এই রকমের স্পন্দন এতখানি মাত্রাতে হচ্ছে, অতিমানসের উপাদানের মাত্রা রয়েছে এতখানি?...একথা তোমাদের কাছে উল্লেখ করলাম, এই নিয়ে তোমরা একটু ভেবে দেখবে।

১৯ মার্চ, ১৯৫১

পূর্বোক্ত রচনা থেকে—"মন হলো একপ্রকার ক্রিয়া, তেমনি আরো কতপ্রকার ক্রিয়া আছে, কত রকমের স্তর আছে, যা পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে থাকে ও পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যায়। আবার যাকে আমরা 'মনের ক্রিয়া' বলি তাও এক স্তর থেকে স্তরান্তরে সেঁধিয়ে চলে যায়। এমন মনোময় স্তর আছে যা প্রাণময় জগতের অনেক উর্ধ্বে, সেখানে প্রাণের প্রভাব পৌঁছতেই পারে না, কোনো বিরোধী শক্তি বা সত্তার সেখানে স্থান নেই। তবে তা ছাড়া আরো অনেক নীচেকার স্তর আছে যেখানে ঐ সব প্রাণময় শক্তিরা সংস্পর্শ ঘটাতে ও অনুপ্রবেশ করতে পারে।..."

প্রশ্ন কোনরূপ মনোময় স্তরের কথা আপনি বলছেন?

উত্তর অবশ্য দেহগত মন। উচ্চতর মন নিশ্চয়ই নয়, কারণ সেখানে বিরোধী শক্তির স্থান একেবারেই নেই। যে মন স্থূলের সঙ্গে সম্পর্কিত, আমি তার কথাই বলছি।

প্রশ্ন : মনোময় জগতে কি কোনো সত্তা থাকে?

উত্তর : অনেক থাকে। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা। তাদেরও নিজস্ব রকমের জীবন-ধারা আছে, নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক আছে, যেমন অন্য জগতেও থাকে। কেবল তফাৎ এই যে এখানে যেমন রয়েছে দেহানুভবের ও স্থান-কালের ব্যাপার, সেই প্রাণময় বা মনোময় জগতে এ সব নেই। যেমন, দেহচেতনার ভিতরে থেকেই তুমি তৎক্ষণাৎ মনে মনে ভেবে নিতে পারো যে অন্য কোথাও চলে গেছি, উচ্চতর চেতনার বেলাতে এমন তৎক্ষণাতের বোধটি আসেনা, যেমন বাটিতিবোধ আসে দেহচেতনার বেলাতে।

মনোময় সত্তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বও আছে, এমন কি একটা আকৃতিও আছে, যাকে ইচ্ছা করলে তারা স্থায়ীও রাখতে পারে। সে আকৃতি তাদের চিন্তারই বিকাশরূপ, চিন্তা বদলের সঙ্গে সঙ্গে তা সহজেই বদ্‌লাতে পারে, অথচ তার মধ্যে এমন নিজস্ব ধারাটি বজায় থাকে যাতে ঠিকই চেনা যায়। তুমি তোমার দেহ ছেড়ে সেই মনোময় রাজ্যে প্রবেশ করলে তাদের সাক্ষাৎ পেতে পারো, আলাপ করতে পারো, এমন কি পুনঃসাক্ষাতের ব্যবস্থাও করতে পারো।

প্রশ্ন এরাও কি প্রাণসত্তাদের মতো মানুষদের প্রভাবিত করতে পারে?

উত্তর অনেক মনোময় সত্তা এই পৃথিবীতে নিজেদেরকে সার্থক ক'রে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তা প্রায়ই মানুষের নিজেদের মনের ভিতর দিয়ে গড়তে হয়, মনোময় জগতে ওরা কাজ করে মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে। কিন্তু আসল যারা মনোময় স্তরের সত্তা তারা সাধারণত সৃষ্টা হয়, তারা যা কিছুর গঠন করে তার দ্বারা কাউকে প্রভাবিত করতে নয়—তার দ্বারা নিজেদেরকেই অভিব্যক্ত করতে চায়।

প্রশ্ন "আধ্যাত্মিক" ও "চৈত্যের" মধ্যে প্রভেদ আছে কি? তা কি বিভিন্ন স্তরগত?

উত্তর এই নিয়ে লোকের মনে প্রায়ই গণ্ডগোল বাধে। বোধকরি যোগ বা দর্শন বা অন্যান্য প্রসঙ্গে "আধ্যাত্মিক" শব্দটি খুবই অনির্দিষ্ট ও আলগাভাবে ব্যবহৃত হয়। যা-কিছু পার্থিব নয় তাই হলো আধ্যাত্মিক! পার্থিব জগতের তুলনায় অন্যান্য সব জগৎই আধ্যাত্মিক। যত কিছু চিন্তা বা প্রচেষ্টা বাস্তব জীবনের জন্য নয় তা সবই আধ্যাত্মিক। যা-কিছু মনোভাব মানবীয় ও অহংসম্পর্কিত নয় তাই আধ্যাত্মিক। এটি ঝোলে-ঝালে-অম্বলে সর্বত্রই প্রযুক্ত হতে পারে।

প্রশ্ন : "**Illustrations**" নামক পুস্তিকাতে পড়লাম : "লেখা এবং পড়া, এগুলি উৎকৃষ্ট ধরনের অধ্যায় ক্রিয়া। অধ্যায় জীবনের কেন্দ্র পাবে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে।"

উত্তর : এ হলো খেলো দরের আধ্যাত্মিকতা!

"চৈত্য" ও "আধ্যাত্মিকের" প্রভেদ সম্বন্ধে মা পড়লেন : "...কথার ভিত্তিতে কিছু বুঝতে গেলেই তার সঠিক মর্মগ্রহণে প্রায় গণ্ডগোল বাধে, কিন্তু মনকে নীরব ক'রে দিয়ে যদি সেই উচ্চতর জগতে উঠে যাও যেখান থেকে ভাবধারা নেমে এসে আকার নিচ্ছে, তাহলে প্রকৃত মর্মটি তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করবে। সেই বাকাহীন বিশুদ্ধ মনের স্তরে গেলে

তখন তুমি একেবারেই মুক্ত . নিজের মধ্যে হতে বেরিয়ে তুমি চলে যাও বিশ্বমনের স্তরে, যেখানে ক্ষুদ্র ব্যক্তিমনের জগৎ ডুবে গেছে যেন এক বিরাট সমুদ্রে। সেখানে গেলে অন্যের মনের মধ্যে কি আছে তাও স্পষ্ট দেখতে পাও, যেন তা তোমার নিজেরই মন, কারণ সেখানে এক মন থেকে অন্য মনকে আড়াল করবার কিছু নেই। ঐ রাজ্যে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়াতে তুমি সকলের সব কথাই বুঝবে ; এ ছাড়া অন্যদের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা না হয়ে তুমি তাদের ধরাছোঁয়াই পাবে না...''।

প্রকৃত বোধ মিলতে পারে কেবল নীরবতারই মধ্যে।

অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে দুজন ব্যক্তি একটা বিষয়ে কথা বলতে বলতে দুজনেই হঠাৎ কিছুক্ষণ থেমে গিয়ে চুপ ক'রে রইল ; অতঃপর ওদের মধ্যে কোনো একজন যেমনি কিছু বললে অমনি দেখা গেল যে অপর জনও তখন ঠিক সেই কথাটাই ভাবছিল। এরা সেই নীরবতার ভিতর দিয়ে পরস্পরকে বুঝে নিলে। একই পথের বাঁক ধরাতে তারা একই সিদ্ধান্তে এসে পড়ল, একে অন্যের চিন্তাকে তাই পুরিয়ে দিলে। এমন ব্যাপার প্রায় তাদের মধ্যেই ঘটে যারা বহুদিন একত্রে থেকে এমন এক মনের মিল পৌঁছেচে যে কথার আড়াল থেকেও পরস্পরকে বুঝে নিতে পারে। এমন ব্যক্তিদের আমি জানি যারা সম্পূর্ণ ভিন্নদেশীয় লোক—আর এ কথা নিশ্চয় জানো যে বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী মানুষের চিন্তারীতিও বিভিন্ন প্রকার হয়, এমন কি এক দেশের ভাবধারা অন্যদেশের বিপরীত রকমও হয়ে থাকে—তথাপি ওদের মধ্যে এমন মনের মিল হয়েছে যে কথা না বলেও ওরা পরস্পরকে বুঝে নিচ্ছে।

প্রশ্ন : মাত্র একজন যদি থাকে নীরব, আর অন্যজন তা না থাকে, তাহলে কি তারা পরস্পরের মর্ম বুঝতে পারবে ?

উত্তর পারা সম্ভব। যে নীরব থাকবে সে বুঝে নেবে তাকে যে নীরব নেই !... কিন্তু যখন মনের মিল এসে গেছে, তখন সেটা স্থায়ী না হলেও, যদি তুমি বাহ্য তৎপরতা হতে সরে দাঁড়িয়ে চিন্তায় অনেকটা অগ্রসর হয়ে যাও, আর অপরজন যদি একই চিন্তাকে অনুসরণ করে, তাহলে কোনো কথা বলার চেষ্টা না করেও তখনই পরস্পরের মধ্যে একটা মিল এসে যায়। সাধারণত তখন দুজনেরই মধ্যে একত্রে একটা নীরবতা আসে—যেন দুজনেই সেখানে গড়িয়ে চলে গেল। অবশ্য এমনও হতে পারে যে একজনের মাথার মধ্যে কোলাহল চলছে আর অন্যজন নীরব হয়ে থেমে গেছে, তখন ঐ নীরব ব্যক্তি বুঝতে পারে যে অপরজনের মাথার মধ্যে কি হচ্ছে।

প্রশ্ন : আমরা যখন আপনার এই ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাই তখন অনেকে জানতে চায় যে আপনি কি বলেছেন। আমরা সে স্থলে কি বলব ?

উত্তর : তোমরা এই কথা বলতে পারো, "আমরা বুঝতে চেষ্টা করেও হয়তো ঠিক বুঝিনি, যদি নিজেরা কিছু বলতে যাই তাহলে নিশ্চয় তাঁর বক্তব্যকে উল্টোপাল্টা ক'রে ফেলব।"...এমনি কিছু বললেই তা তোমাদের পক্ষে সহজ ও নিরাপদ হবে।

প্রশ্ন চৈত্য-জগতের বাস্তবতার মধ্যে কি বিশেষত্ব?

উত্তর চৈত্যের জগতের বাস্তবের মধ্যে আছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে থাকে একটা অন্তরঙ্গবোধ, ভগবৎ-প্রভাব লাভের পুরোপরি গ্রহিষ্ণুতা ও তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং তারই মধ্যে সমগ্ররূপে নিমিত্ত হয়ে থাকা—এই হলো সত্তার অন্যান্য সকল অংশ হতে চৈত্যের বিশেষ পার্থক্য। যেমন আমি যখন বলি তোমাদের মন ও প্রাণকে চৈত্য কেন্দ্রের সঙ্গে সংলগ্ন ক'রে রাখার কথা, তখন যে ওগুলিও চৈত্যে পরিণত হোক এমন কথা বলিনা ওগুলি মন ও প্রাণই থাকবে, কিন্তু চৈত্যের একান্ত বাধ্য হয়ে তাকে ঘিরে,—যেমন থাকে সেনাপতিকে ঘিরে তার সৈন্যবাহিনী এবং তার আদেশেই কাজ করতে থাকে, তাই নয় কি? এখানেও ঠিক তাই মন প্রাণ সবই থাকবে চৈত্যকে ঘিরে, তারই আদেশ যথাসাধ্য সর্বথা পালন করতে থাকবে। কিন্তু তবু তার বাস্তবতা তারই থাকবে, চৈত্যে তা রূপান্তরিত হবেনা। তার প্রভাবের গুণে হয়তো তার প্রকৃতি কিছু নিতে পারে, কিন্তু তার বাস্তবতা নয়।

প্রশ্ন আপনি ইতিপূর্বে বলেছেন (জাপান থেকে জাহাজে শ্রীঅরবিন্দের কাছে আসার বর্ণনা প্রসঙ্গে) যে, একটা কোনো স্থানে বা কোনো দেশে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকলে আমাদের দেহচেতনা তাকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু আগের থেকে সেই চেতনার কিছু প্রস্তুতি না থাকলে তার সম্বন্ধে কোনো দৈহিক অনুভূতি আসতে পারে কি? কিংবা আমরা যেমন ঠাণ্ডা গরম, ভয় প্রভৃতিকে অনুভব করি এও তেমনি ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি?

উত্তর যদি আগের থেকে তাই নিয়ে চিন্তা বা ইচ্ছা ক'রে থাকো, তাহলে সে তো অনুভূতিই হলোনা, তার কোনো মূল্য নেই। এই কথাটি বুঝে নাও, আগের থেকে কোনো চিন্তা বা ইচ্ছা করা থাকলে তারপর যা হয়, আধ্যাত্মিক হিসাবে সে অনুভূতি মূল্যহীন।

প্রশ্ন : কিন্তু অন্ততপক্ষে ঐ অনুভূতির পক্ষে "অনকল" একটা অবস্থা কি আপনার ছিলনা?

উত্তর : অনেক সত্তা আছে যারা সর্বদা উচ্চ চেতনাতেই অবস্থান করে, আবার অনেকের পক্ষে চেষ্টা ক'রে সে চেতনার মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র কথা। আমি যে অনুভূতির কথা বললাম তার সম্বন্ধে আমার আগেই কোনো প্রত্যাশাই ছিল না, আর সেখানেই তার মূল্য। এটা অবশ্য আমি জানতাম, শ্রীঅরবিন্দের আবহাওয়ার

সঙ্গে আমার নিত্যকার একটা আধ্যাত্মিক সম্পর্কই ছিল. কিন্তু বাইরের বাতাসের চরিত্রটাও যে অমন বদ্‌লে যাবে এ আমি প্রত্যাশাই করিনি। তাইতেই ঐ অনুভূতির যথার্থ মূল্য যে, তা অপ্রত্যাশিতভাবে অমন আকস্মিকরূপে এসে গেল, ঠিক যেমন কেউ গরম থেকে হঠাৎ শীতের মধ্যে কিংবা নীচের থেকে উপরে উঠে গেলে হয়।...এটা তোমরা লক্ষ্য করেছ কিনা জানিনা যে তোমরা যে বায়ুতে শ্বাস নাও তা সব সময় একরকম থাকেনা, এক দেশের বাতাস অন্য দেশের থেকে পৃথক রকমের হয়, তার স্পন্দনের মধ্যে বিশেষ তফাৎ থাকে। এ সম্বন্ধে সূক্ষ্মবোধ থাকলে তখনই তুমি বলে দাও, "এখানকার বাতাস ফ্রান্সের মতো" কিংবা "এটা জাপানের বাতাসের মতো।" তাকে বলব গন্ধ কিংবা আস্বাদবোধের মতো জিনিস কিন্তু এ হলো সম্পূর্ণ অন্যরূপ অনুভব। দৈহিক অনুভবই বটে, মনের বা প্রাণের নয়; এও বাস্তব অনুভব, কিন্তু আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়াও অন্যরূপ ইন্দ্রিয় আছে। বস্তুত পরিণত দেহসত্তার মধ্যে (দেহেরই কথা বলছি) থাকা উচিত বারো রকম ইন্দ্রিয়। তারই মধ্যে একটির দ্বারা ঐ অনুভূতি নেলে, যার কথা বলেছি। তাকে গন্ধ আস্বাদ বা শ্রবণ কিছুই বলতে পারোনা, কিন্তু তা এমন কিছু যার দ্বারা তফাৎটা স্পষ্ট বুঝতে পারো। সে অনুভব সুনির্দিষ্ট, যেমন কালো এবং সাদার মধ্যে প্রত্যক্ষ পার্থক্যবোধ, তেমনি এও একটা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়বোধ।

তাই সাধারণত যখন কেউ গুহ্যবিদ্যা শিখতে যায়, তখন গুরু প্রথমে ও-সম্বন্ধে কোনো কথাই তাকে বলেনা, কিছুই বোঝাতে চায়না,—তার একমাত্র কারণ এই যে তোমার মন তাই নিয়ে কত কিছু "ভাবতে" শুরু করবে, সে এমন সব "অনুভূতিকে" টেনে আনবে যার কোনো মূল্য নেই—তা নিছক মনেরই গড়া, মন তাই নিয়ে খেলাবে। তার কিছু বাস্তবতা নেই।

অনুভূতির জগতে প্রবেশ করতে খুবই সতর্কতা দরকার। মনকে তাতে মাথা গলাতে দিলেই সে বলবে, "তাইতো, ব্যাপারটা কি হচ্ছে?" কিন্তু যা হচ্ছে, তাকে তার মনে হবে যেন আসল কিছু নয়, নকল গড়া মাত্র।

তাই প্রথম কাজই এই—নীরব হয়ে যাও। শুধু জিহ্বার নীরবতা নয়, মস্তিষ্কের নীরবতা চাই। যদি খাঁটি ভিত্তিমূলক অনুভূতি পেতে চাও, তাহলে নীরব হতে শিখতে হবে, নতুবা নিজের মনে যা গড়বে সবই হবে ভুয়ো। সেইজন্যই মনের সম্পর্কে বলতে হয়, "বাস্‌রে, আমার মনটা যত কিছু গড়ে তুলতে পারার কাজে কি ওস্তাদ।" *

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পতঞ্জলি ভট্টাচার্য

প্রশ্নোত্তর

("চিন্তাবলী ও সূত্রাবলী"—Thoughts & Aphorisms সম্পর্কে—শ্রীমা)

(১০৮)

"সূর্যের গঠনসংস্থিতি বা নক্ষত্রগ্রহের রেখাচিত্র পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে পারা অবশ্যই বড়ো রকমের কৃতিত্ব . কিন্তু যখন এমন যন্ত্র মিলবে যাতে মানুষের আত্মাকে ছবির মতো দেখা যাবে, তখন তুমি হেসে বলবে যে জড়বিজ্ঞানের ঐ বিস্ময়গুলো তো ছেলেখেলার খেলনার মতো।"

এ উক্তি করা হয়েছিল আগেকার "দেখার" প্রসঙ্গের অনুবৃত্তি ক'রে, যারা "দেখতে" চায় তাদের সম্পর্কে। রামকৃষ্ণ বলেছিলেন বিবেকানন্দকে, "তুমি আমাকে যেমন ক'রে দেখছ ভগবানকেও তেমনি করেই দেখতে পারো, আমার কণ্ঠস্বর যেমন শুনছ তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বরও শুনতে পারো।" অনেকে সে কথার মানে ক'রে নিলে যে বুঝি এখানে রক্তমাংসে গড়া রূপেই ভগবানকে দেখা যাবে। কিন্তু আমি বলব, "না, সে কথা নয়। এর মানে তুমি সত্তা চেতনাতে গিয়ে পৌঁছলে তখন ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনবে। তা শুনবে এখনকার স্থূল কানে শোনার চেয়েও স্পষ্টভাবে, তাঁকে দেখবে এই স্থূল চোখে দেখার চেয়েও স্পষ্টভাবে।" হাঁ, ঠিক তাই...কিন্তু যেমনি তুমি আবার স্থূল চোখে দেখতে যাবে, অমনি তা অবাস্তব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : জড়বিজ্ঞানের ঐ সব বিস্ময়ের কথা শুনে আপনিও কি হাসেন?

উত্তর : তা কেন, সেগুলি যথার্থই বিস্ময় বৈকি, তা বিজ্ঞানীদেরই জিনিস। কিন্তু ওরা যে বাহাদুরির আতিশয্য দেখায় তাতেই আমার হাসি পায়। ওরা মনে ভাবে যে সব কিছুই জানা হয়ে গেছে, সব জিনিসের চাবি ওরা পেয়ে গেছে, তাইতে আমি হাসি। ওরা ভাবে যে সমস্ত জেনে নিয়ে ওরা প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব অর্জন করেছে—এটাই নিতান্ত ছেলে-মানুষি। যতদিন পর্যন্ত সৃষ্টিশক্তির ও স্রষ্টার ইচ্ছার সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে না পারছে ততদিন পর্যন্ত ওদের জানতে খানিকটা বাকীই থেকে যাবে।

এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা সহজেই করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে বিজ্ঞানী ব্যাখ্যাও করতে পারে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিয়ে ইচ্ছামত তার ব্যবহারও করতে পারে,

বাস্তবে তার কিছু চমকপ্রদ ফলও সে দেখিয়েছে, কিন্তু এই সামান্য প্রশ্নটি তাকে যদি জিজ্ঞাসা করে। "মৃত্যু কী জিনিস?" এর জবাব সে কিছুই জানেনা। মৃত্যুতে যা যা হয় তার খুঁটিয়ে বর্ণনা করবে নিশ্চয়, যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে তাতে মৃত্যুর আসল কথা কিছুই বলা হলোনা।

একটা জায়গাতে গিয়ে ঠেকতেই হয়, যার পরে যার কোনো জবাব নিলছেনা। কারণ যথার্থভাবে জানতে পারা...জানা মানেই শক্তিলাভ করা।

(নীরব থেকে)

মোটের উপর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সীমা এইখানেই যে অতঃপর কি হবে এটি তারা দেখতে পায়না। অনেক জিনিসই ওরা দেখতে পায়, কিন্তু পার্থিব ঘটনাগুলি কিসের দ্বারা ঘটছে তা ওদের দৃষ্টির বাইরে। কেবল এইটুকু ওদের মানতে হয় যে একটা কিছু অনির্দেশ্য ও অনিশ্চিত আছে যা সম্ভাব্য, যা ওদের হিসাবের বাইরে।

আমি অবশ্য খুব আধুনিক খবর জানা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে দেখিনি, সুতরাং নিশ্চয় ক'রে বলতে পারিনা যে অদৃষ্টপূর্ব জিনিসের সম্বন্ধে ওরা এখন কতটা স্বীকার করছে।

শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত উক্তির মানে এই হয় যে আত্মার খবর যে জেনেছে, সে জ্ঞান তার কাছে এতই আশ্চর্য যে অন্য সব বস্তুগত জ্ঞান তার কাছে তুচ্ছ ও হাসির কথা হয়ে দাঁড়ায়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সেই জ্ঞান তোমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই বাড়িয়ে তার চেয়ে আরো বেশি কিছু জানিয়ে দেবে।

কেবল একটি কথা এই যে (জানিনা বিজ্ঞান অতদূর পর্যন্ত পৌঁছেচে কিনা) ভবিষ্যতে কি হবে তা আগের থেকে জানা যায়নি। ওরা হয়তো বলবে যে ওদের যন্ত্রপাতি ও যা বিকার-রীতি এখনও পর্যন্ত ততটা সম্পূর্ণতা পায়নি। যেমন, ওরা মনে করে যে পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম দেখা দেয় তখন যদি এখনকার মতো যন্ত্রপাতি থাকতো তাহলে তার দ্বারা বলে দিতে পারতো যে পশুদের মধ্যে কোন জিনিস ছিল, যার ফলে তারা পশু থেকে মানুষে উত্তীর্ণ হলো। তবে জানিনা সম্প্রতি ওরা কতটা ক্ষমতার দাবী করে (না হাসলেন)। তেমন ক্ষমতা যদি ওরা পেয়ে থাকে তাহলে এখনকার আবহাওয়ার মধ্যে যে নতুন জিনিস এসে পড়েছে, যা আগে কখনো ছিলনা (না এখানে অতিমানস সত্যের অবতরণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছেন), তার দরুন কতটা পার্থক্য এসেছে তা ওদের ধরা উচিত, কারণ তা বাস্তব রাজ্যেরই অন্তর্গত। তবে শ্রীঅরবিন্দ এমন অর্থে ও-কথা বলেননি; তিনি বলতে চেয়েছেন যে আত্মার ও আভ্যন্তর রাজ্যের ব্যাপার এতই পরমাশ্চর্য যে তার তুলনায় জড়জগতের "বিস্ময়ের" কথা বললে তা হাসির কথাই হবে, এমনি অর্থই ওর করতে হবে।

প্রশ্ন কিন্তু আপনি যে চাবির কথা বললেন, যা ওদের আয়ত্তের মধ্যে নেই, সে কি এই আত্মাই নয়? আত্মিক শক্তি জড়ের উপর ক্রিয়া ক'রে যে পরিবর্তন

ঘটাচ্ছে, তার থেকেই তো ওই সব বিস্ময়েরও সৃষ্টি হচ্ছে। আমারই কি সেই বিস্ময় ঘটানোর শক্তি নেই ?

উত্তর আছে সেই শক্তি এবং সর্বক্ষণ তা কাজও করছে, কিন্তু মানব-চেতনা তার কথা জানতে পারেনা। মস্ত তফাৎ এইখানে যে আত্মা সে কথা জানে। আর সেই আত্মিক চেতনা যার আছে সে জানে যে সর্বদাই তা রয়েছে কিন্তু অন্যেরা তা অস্বীকার করে।

যেমন, আমার এটা লক্ষ্য ক'রে দেখার সুযোগ মিলেছে। আমার কাছে যাবতীয় ঘটনা ও মানব-চরিত্র ও মানব-সত্তা চোখে পড়ে একটা কোনো "নিয়ম" অনুসারে, যা আদৌ আড়ষ্ট নয়, সেই নিয়মই আমাকে সব কিছু দেখিয়ে দেয় যে—এর থেকে ওটা হবে, ওর থেকে সেটা হবে, এই লোকটি যখন এমন তখন এর বেলাতে অমুক জিনিসটা হবে। এটা উত্তরোত্তর আমার কাছে খুব সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তাই দরকার হলে আমি ওর দ্বারা কিছু ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারি। এ স্তরের এরূপ কার্যকারণ সম্পর্ক আমার কাছে বাস্তবক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়েছে—কিন্তু যার সে দৃষ্টি বা সে আত্মিক চেতনা আসেনি, যে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তার বেলাতে অন্য স্থূল নিয়ম কাজ করবে, স্থূল ধরনের কার্যকারণ পরম্পরাই সে দেখবে ওরূপ স্থূলের নিয়ম দিয়ে গভীরের বিশ্লেষণ চলেনা, তার তেমন আভ্যন্তরীণ সামর্থ্যও নেই, সুতরাং সে তরফে গণ্ডগোলও কিছু বাধেনা, যা হবার তাই হচ্ছে বলেই তারা নিশ্চিন্ত হয়।

তাই বলছি যে এমন আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের কথায় তাদের নিঃসন্দেহ বিশ্বাস আসেনা। সেইজন্য আমি যখন দেখতে পাই—"স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভগবৎ-শক্তি এখানে কাজ করছে বলেই তার ফল অমুক অমুক রকমের হচ্ছে, এতো হতেই হবে"—তখন একথা আমি শুধু নিজের মনেই বলি, প্রকাশ করিনা, কারণ অন্য সকলের অনুভবের সঙ্গে তার কোনোই মিল থাকবেনা, তারা ভাববে যে আমি আবোলতাবোল বকছি, অমূলক দাবী করছি। অর্থাৎ তোমার নিজের মধ্যে অনুভূতি যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ অন্যের অনুভূতি তোমাকে তেমন বিশ্বাস করাতে পারেনা।

এখানে ভগবৎ-শক্তির জড়ের উপর কাজ করা নিয়ে কথা নয়—সে তো নিত্যই হচ্ছে—কিন্তু কেবল ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া (যার কোনো মূল্য নেই) মাথার বুদ্ধির আগল যতক্ষণ খুলে না যাচ্ছে (মা নিজের মাথার মাঝখানে আঙুল ঠুকে দেখালেন) ততক্ষণ জিনিসটা খুব কঠিনই রয়ে গেল—অর্থাৎ আমি যা অনুভব করছি না তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

ওদের চোখের সামনেও এমন কি যদি কোনো অলৌকিক ব্যাপারও ঘটে যায়, তাতেও ওরা একটা বাস্তব ব্যাখ্যা জুড়ে দেবে, পার্থিব স্থূল শক্তি ছাড়া যে অন্য কোনো শক্তি এসে তা ঘটাতে পারে এ কথা তারা মানবেই না। স্থূল অর্থটাই ওরা ধরবে, নতুবা বিশ্বাস হবেনা। সে বিশ্বাস তোমার তখনই আসবে যখন আপন অনুভূতিতে ঐ রাজ্যের স্পর্শ পাবে।

সুতরাং ভালো করে বুঝে রাখো যে তোমার জ্ঞানের জাগরণ আসা চাই, তবেই তোমার পক্ষে জানা ও বোঝা সম্ভব হবে। তাই-ই হবে তোমার আপন ভিত্তি ও অবলম্বন।

প্রশ্ন তাহলে "জড়ের রূপান্তর হচ্ছে" এটা আসল কথা নয়, আসল কথা তার সম্বন্ধে অবগতি।

উত্তর হাঁ, এটাই আমার বক্তব্য। রূপান্তর অনেকই হতে পারে, কিন্তু তুমি তা জানবে না।

এখানে পার্থক্য রয়ে গেল অনেকটাই, নয় কি? পৃথিবীতে প্রথম যখন মানুষ এলো, পশুদের তখন সে কথা জানার কোনোই উপায় ছিল না। এখানেও ঠিক সেই কথা মানুষ যতই কেন বুঝতে পারুক, তার এটা বোঝার কোনো উপায় নেই যা কিছু ঘটে যাবে, তার সম্বন্ধে সে জানবে অনেক পরে, যখন চোখ খুলে গিয়ে সে দেখার শক্তি পাবে।

এমন কি বৈজ্ঞানিক উন্নতি যখন তার চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছবে, যখন মনে হবে যে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভেদ আর কিছু রইল না, দুইএরই ক্ষেত্র একত্রে মিলে গেছে, মাঝখানে রয়েছে কেবল প্রায় অদৃশ্য একটা ক্ষীণ রেখার মতো—না, তখনও হবেনা। সে একত্বের জ্ঞানে পৌঁছতে নিজের মধ্যে সেই "অন্যবস্তু"র অনুভূতিটি জেগে ওঠা চাই, নতুবা তা আসবে না।

ওদের এগুলোকে নস্যাৎ করে দেবার মধ্যেও একটা ছিদ্র থেকে যায়, যাকে ওরা দুর্বলতা মাত্র বলে কাটিয়ে দেয়—যদিও তাই একমাত্র শক্তিবীজ—তার ভিতরকার গুপ্ত-রহস্য এই যে মানুষ বলতে এমন কেউই নেই যার মধ্যে ধাতুগত ও মজ্জাগত একটা সূক্ষ্ম-সত্তার ছায়া বা প্রতিফলন বা সম্পর্কগত সূত্র গোছের কিছু নেই, আর সেই জিনিসই তাদের আভ্যন্তরীণ সত্তা, তাদের "আত্মা" আর সেখান থেকেই ঐরূপ ছিদ্রের উৎপত্তি।

(নীরব থেকে)

বস্তুত তোমার মধ্যে যখন অনুভূতি জাগবে—যে অনুভূতি ও যে জ্ঞানের দ্বারা তুমি উচ্চতর শক্তির সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে, কেবল তখনই তুমি বুঝবে যে বাহ্যজ্ঞানের আপেক্ষিকতা কোনখানে; তার আগে পর্যন্ত তুমি অন্যরূপ সত্যকে অস্বীকারই করবে।

এইরূপ কথাই বোধহয় শ্রীঅরবিন্দ বলতে চেয়েছিলেন; বিজ্ঞানী নিজে যখন ঐরূপ চেতনা পাবে তখন সে নিজেই হেসে বলবে, "হাঁ, ওগুলো সব তো ঠিকই বটে, কিন্তু..."

একটা চেতনা থেকে অন্যটাতে যাওয়া যায়না, কৃপার কাজ ব্যতীত সেই বিজ্ঞানীর অন্তরে যদি তেমন পূর্ণ ঐকান্তিকতা থাকে যাতে তাকে দেখতে পাবার ও পূর্ণজ্ঞান পাবার ক্ষমতা এনে দেয়, কোথায় তার ফাঁক পড়ছে সে বিষয়ে তার বোধ এনে দেয়, তখন সে এক থেকে অন্য চেতনাতে গিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তার কোনো বিধিবদ্ধ প্রণালী নেই। নতুন

রাস্তাকে, নতুন বোধকে, নতুন স্পন্দন ও আত্মিক ভাবকে ধরতে হলে তাকে কিছু ছাড়তেই হবে।

তারপর এখানে ব্যক্তিগত প্রশ্নও আছে। এখানে কোনো অমুক সম্প্রদায়ের বা অমুক বিভাগের লোক বলে কথা নয়, কিন্তু বিজ্ঞানী হলেও সে নিজে এটার জন্য প্রস্তুত কিনা ...অর্থাৎ অন্যটার জন্য।

(নীরব থেকে)

এ বিষয়ে তুমি সুনিশ্চিত হতে পারো যতখানি তুমি জানো তা যতই নিখুঁত হোক, অন্য রাস্তা ধরলে তুমি আরো কিছু যা জানবে, তার তুলনাতে তোমার আগেকার জানাটি কিছুই নয়।

(নীরব থেকে)

সম্প্রতি এই ছিল আমার কাজের মূল উদ্দেশ্য : জানতে-না-চাওয়াকে কেমন ক'রে স্পর্শ-পাওয়ার মধ্যে আনতে পারি ! বহুকাল থেকেই এটা আছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক চিঠিতে যে কথা বলেছিলেন সে জিনিস এখনও চলছে ; তিনি বলেছিলেন যে ভারত তার আপন পন্থাতে আধ্যাত্মিক জীবনের দিক দিয়ে যতখানি করেছে, তা ইউরোপের সন্দেহরীতি ও তর্কলব্ধ নিল খুঁজে পাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। এ খুব ঠিক কথা। ওদের ওটা এক রকমের প্রত্যাখ্যান—অমুক ধরনের জ্ঞানানুসন্ধান-প্রণালী আমাদের খাঁটি বাস্তব প্রণালীর মতো নয় অতএব আমি তাকে মানিনা, ঐ ধরনের অনুভূতিকে আমি অস্বীকার করি, ঐ অনুভূতির বাস্তবতা অস্বীকার করি—এরূপ স্থলে কেমন করে এদের মধ্যে বিশ্বাস আনা যায় ?...তবে অবশ্য মহাকালীর পদ্ধতিও আছে, আচ্ছা কষে পেটানো। কিন্তু আমার মতে তাতে ক্ষতিই হয় বেশি, লাভ হয় কম।

এও একটা মস্ত সমস্যা।

বোধ করি সকল রকমের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করবার একমাত্র উপায় হলো প্রেম ; কিন্তু বিরোধী শক্তিরা এ জিনিসটিকে এমনই বিকৃত ক'রে তুলেছে যে অনেক ঐকান্তিক ও খাঁটি সাধকরা ওর দিকে একেবারে দেয়াল এঁটে দিয়ে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পাছে তারাও বিকৃতাঙ্গ হয়ে পড়ে। সেইখানেই মুশকিল। তাতেই এত বেশি সময় নিচ্ছে। যাই হোক...

মে ২৯, ১৯৬৫

কঠিন ডানায় ওড়া

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরবাহু

দমদমায় ফিরিয়া আসার কয়েক মাসের মধ্যে রাজকীয় ভারতীয় বিমানবাহিনীর এক-নম্বর স্কোয়াড্রন দমদম বিমান বন্দর হইয়া বর্মা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল।

তাহাদের নিকট বিলাতী ওয়েষ্টল্যাণ্ড কম্পানীর তৈয়ারী লাইসাণ্ডার বিমান ছিল। এই বিমানগুলি স্থলবাহিনীর পদাতিক সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত হইয়াছিল।

এই বিমানগুলি ইচ্ছানুযায়ী ঘন্টায় কুড়ি মাইল হইতে প্রায় আড়াইশত মাইল পর্যন্ত বেগে উড়ান যাইত। উড়িবার বেগ ঘন্টায় চল্লিশ মাইলের কম হইলেই দুই ডানার সম্মুখভাগে রক্ষিত দুইটি সরু লম্বা, অনেকটা ইংরাজি ইউ অক্ষরের মত সেক্সনের, স্বয়ংক্রিয় অংশ খুলিয়া যাইয়া বিমানকে নিশ্চল পতন হইতে রক্ষা করিত। এই উপায়ে বিমানের সর্ব্বনিম্ন বেগ কুড়ি মাইল পর্যন্ত কমান সম্ভব ছিল। ফ্লট খোলার সময় খট করিয়া শব্দ হইত।

ঘন্টায় চল্লিশ মাইল হইতে বেগ বেশী হইলেই পুনরায় খট করিয়া বেশ জোরে শব্দ করিয়া স্বয়ংক্রিয় ফ্লট ডানার সাথে জুড়িয়া যাইত। এই স্বয়ংক্রিয় ফ্লট বাহির হওয়ার ও বন্ধ হওয়ার সময় জোরে খট করিয়া শব্দ হওয়াতে, বিমান-চালকের পক্ষে বিমানের গতিবেগ কত হইল, বাড়িল না কমিল সে সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হইত। তার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল। কারণ খুব নীচে অর্থাৎ গাছগুলির ঠিক উপর দিয়া ধীরে ধীরে উড়িবার সময় এই বিমানের গতিবেগ কুড়ি মাইলের কম হইলেই পতন অনিবার্য্য। আর স্থলবাহিনীর সহিত সহ-যোগিতা করিতে হইলে, তাহাদের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান করিতে হইলে, অন্য কথায়, চক্ষুর কাজ করিতে হইলে, খুব নীচু দিয়া ধীরে ধীরে বিমান চালনা করিতেই হইবে।

একনম্বর রাজকীয় ভারতীয় স্কোয়াড্রনের কমাণ্ডিং অফিসার ছিলেন স্কোয়াড্রন লীডার মজুমদার, সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ বৈমানিকদের মধ্যে তাঁর আসন অনিবার্য্য। আর এঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন ফ্লাইট সার্জেন্ট হরজিন্দর সিংহ। এখন তিনি এয়ার মার্শাল হর-জিন্দর সিংহ। রাজকীয় ভা: বি: বা: দল দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছিলেন সকালের দিকে। অবতরণের পর বিমানগুলিকে একটা বড় এ বৃত্তাকারে সাজাইয়া রাখা হইল। সহগামী এঞ্জিনীয়ার বিমান মেরামত ও বিমানের কলকব্জা পরীক্ষা নিরীক্ষার

কাজে তৎক্ষণাৎ লাগিয়া গেলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ঐ বৃত্তের মধ্যস্থলে রহিল; যাঁহার যেমন প্রয়োজন, সেই অনুসারে কেন্দ্র হইতে যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ শেষ করিলেন এবং যন্ত্রপাতি পুনরায় ঐ মধ্যস্থলেই রাখিয়া দিলেন। এই প্রকার ব্যবস্থায় কাজের সুবিধা কিছু হয়, কিন্তু যেখানে শত্রু-বিমানের আগমন আশঙ্কা বর্ত্তমান, সেখানে এই ব্যবস্থা একেবারেই অচল। একটা বোমাতেই সবগুলি বিমান বিধ্বস্ত না হইলেও উড়িবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য বর্ম্মায় পৌঁছানোর পর তাঁহারা বিমানগুলি আর কখনও একসাথে রাখিতেন না। সব সময় চেষ্টা করিতেন যেন বিলিকেন্দ্রগুলি বড় বড় গাছের আড়ালে থাকে, যাহাতে শত্রুবিমান আকাশ হইতে দেখিতে না পায়। এই ব্যবস্থায় বিমান মেরামতের কাজে নানা অসুবিধা হওয়া সম্ভব। কিন্তু শত্রু-বিমান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না।

পরের দিন সকালে একনম্বর স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা এই নূতন বিমানে উড়িবার কৌশল দেখাইলেন।

আমাদের ওয়াপিটি বিমানগুলি আক্রমণকারী বোমারু বিমান হিসাবে ব্যবহৃত হইল। ঘন্টায় আশী মাইল বেগে ধাবিত ওয়াপিটি বিমানকে এক একটি লাইসাণ্ডার বিমান একবার পশ্চাৎদিক হইতে ও পরমুহূর্ত্তে সম্মুখ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া নানা কসরৎ দেখাইল। শুধু তাহাই নয়, পশ্চাৎদিক হইতে আড়াইশত মাইল বেগে সম্মুখ দিকে যাইবার সময় দ্বিতীয় ককপিট হইতে চারিটি ব্রাউনিং মেসিন গানের নল ওয়াপিটি বিমানের দিকে ঘুরাইয়া দেখাইয়া বুঝাইয়া দিল যে পাশাপাশি অবস্থাতে উড়িবার সময়ও তাহারাই অধিক শক্তির অধিকারী।

সেদিন একটি লাইসাণ্ডার বিমানের দ্বিতীয় ককপিটে পর্য্যবেক্ষক হিসাবে উড়িয়া দেখিবার সুবিধা আমার মিলিয়াছিল। দেখিয়াছিলাম ঘন্টায় মোটে আশী মাইল বেগ বোমারু বিমানের পক্ষে কি মারাত্মক মন্থর গতি। পশ্চাৎ দিক হইতে আশী মাইলের তিনগুণ বেগে আসিয়া সম্মুখের চারিটি ব্রাউনিং মেসিনগানে বিধ্বস্ত করিয়া সরিয়া পড়া কত সহজ। তাহার পর স্বয়ংক্রিয় ফ্লাট থাকায় এই বিমানের গতিবেগ নিম্নতম গতিবেগ কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত করা সম্ভব হইয়াছে; তাহাতে বিমান অবতরণ করাও সহজ হইয়াছে। এবং সম্মুখ দিকে চারটি ও পশ্চাতের ককপিটে আরও চারটি, মোট আটটি ব্রাউনিং মেসিন গান থাকাতে আত্মবিশ্বাস ও সেই সাথে সাহস কি পরিমাণে যে বাড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইহার কিছুদিন পরেই জাপানীদের হাত হইতে বর্ম্মা রক্ষার জন্য আমাদের স্কোয়াড্রনও নিয়োজিত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের স্কোয়াড্রনে দুই প্রকার বিমান ছিল। ছোটনাক ব্লেনহীম বম্বার ও ওয়াপিটি (আমরা বলিতাম হোয়াট-এ-পিটি)। সংখ্যায় ব্লেনহীম চারখানা ও হোয়াট-এ-পিটিও চারখানা।

ওয়াপিটিগুলি ছোট, পুরাতন ও ঘন্টায় আশী মাইলের অধিক বেগে চলার শক্তি রাখিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইগুলি ছিল পদাতিক অর্থাৎ স্থলবাহিনীর সাথে সহযোগিতা

করার জন্য। কয়েকদিন পূর্বেই একনম্বর রাজকীয় ভারতীয় স্কোয়াড্রনের লাইসাণ্ডার বিমানের সাথে পাল্লা দিয়া ওয়াপিটির কদর ও কৌলীন্য আমাদের নিকট একেবারেই মাটি হইয়া গিয়াছিল, তাহাও বলিয়াছি।

প্রয়োজন হইলে ওয়াপিটিতে বোমাও লওয়া যাইত—দুইটি আড়াইশত পাউণ্ডার বা কয়েকটা ছোটছোট, কিন্তু মোট ওজন পাঁচশত পাউণ্ড পর্য্যন্ত। আবার শত্রুবিমানের সাথে লড়াই করিবার জন্য পিছনের ককপিটে দুইটি ও সম্মুখের দিকে আর দুইটি, মোট চারটি লুইস্ মেসিন গান ছিল। লুইস মেসিন গানগুলি হইতে মিনিটে কয়েকশত গুলি নিক্ষেপ করা যাইত। সম্মুখের গান দুইটি এঞ্জিনের দুইপাশে লাগান থাকিত। বুলেটগুলি বাহির হইত ঘূর্ণায়মান প্রপেলারের মধ্য দিয়া। অনেক সময় মেসিনগানের "টাইমিং"—অর্থাৎ বুলেটগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়া বাহির হওয়ার সময়—যাতে প্রপেলার আঘাত না করিয়া বাহির হয়, তাহার নির্ভুল ব্যবস্থা না থাকিলে, মেসিনগানগুলি চালু করা মাত্র প্রপেলার গোড়া হইতে বুলেটের আঘাতে কাটা যাইত ও উড়িবার শক্তিবিহীন হইয়া বিমান ভূতলে পড়িত। আবার পিছনের ককপিটের দুইটি হইতেও কম বিপদের আশঙ্কা ছিল না। অনেক সময় ডান হইতে বাম দিকে বা বামদিক হইতে ডান দিকে বন্দুক ঘুরাইবার সময় সাবধান না থাকিলে নিজের বিমানেরই রাডার ও টেইল প্লেন নিজের গুলিতেই কাটা পড়িত।

ওয়াপিটির তুলনায় ব্লেনহীম ছিল অনেক উচ্চস্তরের বিমান। উড়িবার বেগ প্রায় তিনগুণ বেশী, আর ফায়ার পাওয়ার অর্থাৎ গুলি নিক্ষেপের ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী। সম্মুখের দিকে প্রত্যেক ডানার সামনে দুইটি করিয়া চারটি ব্রাউনিং মেসিন গান, ও পিছনের ককপিটে একসাথে চারটি ব্রাউনিং মেসিন গান। প্রত্যেক ব্রাউনিং মেসিনে গান এক মিনিটে প্রায় নয়শত গুলি নিক্ষেপ করিত। সেই জন্য পিছনের দিক হইতে কোন শত্রু বিমান সহজে আক্রমণ করিতে আসিত না। কারণ পিছন দিক হইতে ব্লেনহীমকে আক্রমণ করিতে হইলে, মিনিটে তিনহাজার ছয়শত বুলেটের সম্মুখীন হইতে হইত। জাপানীরা ও ইউরোপের যুদ্ধে জার্মানরা সেইজন্য ব্লেনহীমকে পেটের তলা হইতে আক্রমণ করিত। এই আক্রমণও ব্যর্থ করার জন্য পরে আরও একটি গান টারেটের ব্যবস্থা করা হয়,—পেটের তলায়। আমরা বলিতাম ময়লা ফেলার টারেট। গানারকে বিমানের খোলের উপর শুইয়া বিস্ফোরকের গান সাইটে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইত। এই গান টারেটেও চারিটি ব্রাউনিং মেসিন গান একত্রে সন্নিবিষ্ট থাকিত। অর্থাৎ প্রত্যেক বিমানে বারোটি ব্রাউনিং মেসিন গান। সত্যই একত্রে বারোটি ব্রাউনিং মেসিন গান থাকায় ব্লেনহীম বিমানকে শত্রুপক্ষীয় সকলেই খুব সম্মানের চক্ষে দেখিত, সহজে একলা কেহই ঘাঁটাইতে সাহস করিত না; ঘাঁটাইতে হইলে দুই তিনটি বিমান একত্রে আসিয়া বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ করিত।

এখানে গান টারেটের কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন।

আক্রমণকারী জঙ্গী বিমানের গতিবেগ বোমারু বিমানের তুলনায় সব সময় অনেক বেশী দ্রুত। সেইজন্য আক্রমণকারী বিমান বোমারুর পশ্চাৎদিক হইতে অথবা পেটের নীচের দিক হইতে দ্রুতবেগে নিজের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসিয়াই গুলি নিক্ষেপ করে ও দ্রুত বেগেই সরিয়া যায়। আক্রমণকারী বিমান আকাশে কসরৎ করিতে সব সময়েই সক্ষম ও অভ্যস্ত। কিন্তু বোমারুর আকাশে কসরৎ করার সামর্থ্য ত নাইই, উপরন্তু কসরৎ করিতে গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। সেইজন্য পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণকারী বিমানকে নিকটে আসার পূর্ব্বেই যাহাতে ধ্বংস করা যায়, তাহার জন্য চারিটি মেসিনগানের সমাবেশ একত্রে করা থাকিত। সবগুলি গান হইতেই গুলিও একত্রে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু আক্রমণকারী বিমান কোনদিক হইতে আসিবে সেদিকে তাক করিয়া বসিয়া থাকা সম্ভব নয়। কারণ সে তাহার সুবিধার দিক হইতে আক্রমণ করিতে আসিবে, সেদিক বোমারুর তাক করা দিক না হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা একসঙ্গে দুই বা ততোধিক বিমান আক্রমণ করিতে আসিবে।

ওয়াপিটি বিমানে পশ্চাৎদিকের গানারকে লুইস মেসিন গানগুলি নিজের শক্তিতে ডাইনে-বাঁয়ে বা উপর-নীচে ঘুরাইতে হইত। বিমান দ্রুতবেগে না উড়িলে নিজের শক্তিতে গান টারেট ঘুরান সম্ভব নয়। কিন্তু বিমানের গতি দ্রুত হইলে যে দারুণ শক্তির চাপ উৎপন্ন হয়, গানার খুব শক্তিমান না হইলে সেই চাপ বরদাস্ত করিতে পারে না। ব্লেনহীম বোমারু বিমানে এই টারেট ঔদক-শক্তি চালিত ছিল। বোতাম টিপিয়া ধরিলেই ঔদকশক্তির চাপে টারেট ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট দিকে ও উচ্চতায় খুব দ্রুত ঘুরিয়া যাইত। সেইজন্য একাধিক দিক হইতে আক্রান্ত হইলেও ব্লেনহীম বিমানের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইত না।

এ ছাড়া বোমাবহন-শক্তিও ব্লেনহীমের অনেক বেশী ছিল। বোমাগুলি পেটের তলার খোলের মধ্যে ঝুলান থাকিত। তাদের নিক্ষেপ করার সময় পেটের নীচের দরজা খুলিতে হইত এবং বোমাগুলি পড়িয়া যাওয়া মাত্র পেটের তলার দরজা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইত।

সিঙ্গাপুর হইতে মালয় দেশ হইয়া বর্ম্মায় আসার যে একটি মাত্র স্থলপথ, সেই পথ আগলাইয়া রাখিবার জন্য আমাদের ফ্যাইটের হোয়াট-এ-পিটি বিমানের উপর ভার পড়িল। এখন সেকথা মনে পড়িলে হাসি পায়, কারণ যে জাপানী জিরো বিমানের তীব্র আঘাতে ব্রিটিশসিংহের প্রিন্স অব ওয়েলস্ ও রিপালস্-এর মত রণতরী পর্য্যন্ত সলিল-সমাধি লাভ করিল তাহাদের বাধা দিবার জন্য হোয়াট-এ-পিটির মত বিমান নিয়োজিত হইল, তাহাও সর্ব্বসাকুল্যে সংখ্যায় চারখানা। ইহাতে বিমান না হউক, বৈমানিকদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস যে কত উচ্চ তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

আমাদের তিন নম্বর ফ্যাইটের বৈমানিক ও এঞ্জিনীয়ারদের একটা অংশ কিন্তু খুব কৃতিত্বের সহিত দমদম বিমান বন্দর হইতে চাটগ্রাম, কক্সবাজার, অকিয়াব, টাঙ্গু ও মিঙ্গলাডন বিমান-বন্দর হইয়া একেবারে মৌলমেন সহরে চারদিনে পৌঁছিল।

মৌলমেনে বিমান লুকাইয়া রাখার খুব সুবন্দোবস্ত পাওয়া গিয়াছিল। ছোট কয়েকটা টিলা পর্য্যায়ের পাহাড়ের গা কাটিয়া গুহার মত করা ছিল; সামনে লোহার তৈয়ারী দরজা দিয়া ঢাকা। সেই গুহার মত হাঙ্গারের মধ্যে একবার বিমান রাখিয়া দরজা বন্ধ করিলে বাহিরের দুনিয়া হইতে সেটি সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া যাইত। এই হাঙ্গারের মধ্যে বিমানগুলি রাখিয়া আমাদের ফ্লাইটের দল নিশ্চিন্ত হইল। কেননা মৌলমেন বিমান-বন্দরে পৌঁছাইবার বহু পূর্ব্বেই গুপ্তসংবাদ বিভাগ হইতে খবর আসিয়াছিল যে মৌলমেন ও অন্যান্য ব্রহ্মদেশের বিমান-বন্দরে ও সহরগুলিতে জাপানীদের চর অনেক রহিয়াছে এবং বিমানগুলি তাহাদের কুনজর হইতে রক্ষা করা একান্তই প্রয়োজন। আমাদের দলও একথা ষোলো আনাই জানিত যে, এই হোয়াট-এ-পিটি বিমানগুলিকে আমরা যতই তাচ্ছিল্য করি না কেন, একবার যদি এগুলির একটাও নষ্ট হয়, তাহা হইলে তার পরিবর্ত্তে অন্য কোন বিমান আমাদের ফ্লাইটের জন্য পাওয়া সম্ভব হইবে না। কারণ তখন আমাদের দেশে বিমানের খুবই অভাব ছিল; নূতন বিমান ত' ছিলই না, পুরাতন ওয়াপিটির মত বিমানও বাড়ন্ত ছিল।

আমাদের দল পৌঁছাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মৌলমেন সহরে কাহারও মুখে হাসি ছিল না, বরং উদ্বেগ ও আশঙ্কায় সকলেই ম্রিয়মাণ ছিল। আমাদের বাহিনী পৌঁছাইতেই সহরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে আর ভয়ের কোন কারণ নাই; কেননা রয়াল ভারতীয় বিমান বহর জাপানীদের হাত হইতে মৌলমেন সহর রক্ষা করিবার জন্য পৌঁছাইয়া গেছে। সহরে সব অফিস এবং স্কুল সেদিন ছুটি হইল ও দলে দলে লোক ভারতীয় বিমান বহর দেখিতে বিমান-বন্দরে আসিয়া বিমান না দেখিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা মৌলমেন পৌঁছাইলেন তাঁহারা বেশ আরামেই কয়েক সপ্তাহ কাটাইলেন। সহরের অবস্থাপন্ন গৃহে গৃহে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। কোন গৃহেই দুইজন থাকিবার প্রয়োজন ছিল না। কাজেই বৈমানিকদিগকে একনিষ্ঠভাবে পরিচর্য্যা করিবার সুবর্ণ সুযোগ কয়েকজন ভাগ্যবান মৌলমেনবাসীর মিলিল। এইরূপ অবস্থায় বৈমানিক কেন, কাহারও মোটেই কোন অসুবিধা না হওয়াই স্বাভাবিক। আহার্য্য পানীয় ও পরিচর্য্যা এইগুলি মৌলমেনবাসীরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৈমানিকদিগকে সরবরাহ করিতে থাকিলেন ও প্রতিদানে বৈমানিকরা নিজেদের বাহুবলের গল্প বলিয়া, বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিম সীমান্তবাসীদের উপর হামলা করার গল্প বলিয়া, কৃতার্থ মৌলমেনবাসীদের পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ করিলেন।

জাপানী বৈমানিকদের বাহুবল, মনোবল ও বিমানবলের পরিচয় আমাদের বৈমানিকদের গোচর হইতে বিলম্ব হয় নাই। বিশেষ করিয়া যখন একই দিনে প্রিন্স অব ওয়েলস ও রিপালস্ দুইখানি বিরাট ও বহুশক্তিশালী যুদ্ধ-জাহাজের জাপানী বিমান ও বৈমানিকদের তীব্র আঘাতে সলিল-সমাধি হইল। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জাপানীদের বৈমানিক ও বিমান সম্বন্ধে সকলেরই একটু অবজ্ঞার ভাব ছিল। কারণ সহজেই অনুমেয়। জাপানে তৈয়ারী

সমস্ত জিনিষই সস্তা, খেলো ; তাহারা যে কোন শক্ত কাজেরই অনুপযুক্ত এই ধারণা তখনকার দিনে কাহারই বা না ছিল! এমন কি এখন পর্য্যন্ত অনেকের ধারণা রহিয়াছে যে জাপানী জিরো বিমানের এঞ্জিনের যে ক্রাঙ্কসাফ্‌ট্ ব্যবহার হইত ; তাহা জলে সিদ্ধ বাঁশের তৈয়ারী। ক্রাঙ্কসাফ্‌টএর মত প্রধান অংশই যাহারা বাঁশের দ্বারা তৈয়ারী করে, তাহাদের বিমান আর কত ভাল হইবে? এই ধারণা অল্পবেশী সকলেই পোষণ করিতেন।

আমাদের বৈমানিকরা কিন্তু হাসিমুখেই জাপানী জিরো বিমানের সম্মুখীন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রত্যহই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাঁহারা ওয়াপিটি বিমান লইয়া উড়িয়া চারিদিকে টহল দিয়া আসিতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উড়ন্ত অবস্থায় জাপানী বিমানের সাথে তাঁহাদের কখনও সংঘর্ষ কেন সাক্ষাৎও হয় নাই। সম্ভবত: সেইজন্যই তাঁহারা সকলেই অক্ষত শরীরেই এদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। একটা কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে উড়ন্ত অবস্থায় হোয়াট-এ-পিটি বিমান জাপানী জিরো বিমানের নিকট বসা-হাঁস তুল্য ছিল। বসা-হাঁসকে গুলি করা যত সহজ তাহা হইতে আরও সহজ হওয়ার কথা এই হোয়াট-এ-পিটী বিমানগুলি মারিয়া ভূপাতিত করা।

একদিন সকালে আমাদের বিমানগুলি পর্য্যবেক্ষণে যাওয়ার জন্য যখন প্রস্তুত করা হইতেছিল, সেইসময় বিমান আক্রমণের সংকেত-বাঁশী বাজিয়া উঠিল। অল্পক্ষণেই গোঁওও গোঁওও আওয়াজের সাথে দুইটি জাপানী বিমানকে আমাদের বিমান-বন্দরের দিকে আসিতে দেখা গেল। তাদের আবির্ভাব এত অকস্মাৎ ছিল যে, আমাদের বিমানগুলি লুকাইয়া ফেলার অবকাশ পাওয়া গেল না। বৈমানিকরাই শুধু স্লিট ট্রেঞ্চে ঢুকিয়া নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়াস পাইলেন। জাপানী বিমান দুইটি নম্বর গতিতে বিমানবন্দরের উপর দিয়া কয়েকবার যাতায়াতের পর ওয়াপিটি বিমানগুলি দেখিতে পাইল। দেখামাত্র চিল যেমন করিয়া ছোঁ মারে, তেমনভাবে আসিয়া আমাদের ওয়াপিটি বিমানগুলির উপর গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। কয়েকবার এইরূপ গুলিবর্ষণের পর তাহারা আমাদের বিমানগুলি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

স্লিট ট্রেঞ্চ হইতে বাহির হইয়া আমাদের বৈমানিকরা প্রথমেই ওয়াপিটি বিমানগুলি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলেন। বিমানগুলি দেখিয়া সকলেই কিছু হর্ষ ও কিছু বিষাদে অভিভূত হইলেন। বিষাদের কারণ সহজেই অনুমেয়। জাপানী বিমানের গুলিবর্ষণে দুইটি বিমান একেবারেই অকেজো অর্থাৎ উড়িবার জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া গিয়াছে। অন্য দুইটির একটি সম্পূর্ণ অক্ষত ও অন্যটির পেট্রল ট্যাঙ্ক গুলিবিদ্ধ হইয়াছিল। ভাল করিয়া পরীক্ষার পর সাব্যস্ত হইল পেট্রল ট্যাঙ্ক সামান্য মেরামত করিলেই চলিবে। পেট্রল ট্যাঙ্কের উপর দিকে দুই-শূন্য-দুই অর্থাৎ এক ইঞ্চির পাঁচভাগের একভাগ

চওড়া গুলি কেবল একটাই ফুটা করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অন্য কোন অংশের ক্ষতি হয় নাই। তখনকার মত সেই ফুটা চুইং গাম দিয়া বন্ধ করা হইল। কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত চুইং গাম মেরামতই যথেষ্ট ছিল।

এই পেট্রল ট্যাঙ্ক গুলিবিদ্ধ ওয়াপিটির নম্বর ছিল ৫৪। এই ঘটনার পর হইতে সবাই বলিত ৫৪ নম্বর নূতন প্রাণ পাইয়াছে। একেবারে শেষ ফ্লাইট ছাড়া এই বিমান আর একবার আকাশ হইতে পড়িয়াছে কিন্তু সে-বারও সামান্য মেরামতের পর পুনরায় উড়িবার উপযুক্ত করা গিয়াছে।

ওয়াপিটি ফ্লাইটকে এর পর আর বেশীদিন মৌলমেন থাকিতে হয় নাই। সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ার সাথে সাথেই ওয়াপিটি বিমান দুইখানিকে ভারতে অর্থাৎ দমদম বিমান-বন্দরে ফিরাইয়া আনা হইল।

ওয়াপিটি বিমানের মৌলমেন যাত্রার সময়ই চারখানা ব্লেনহীম বিমান আকিয়াব হইয়া বাসীন বিমান-বন্দরে পৌঁছান হইল। বাসীন বিমানবন্দর বর্ম্মার দক্ষিণ পশ্চিম কোণায়, বঙ্গোপসাগরের উপরেই বলা যায়। ব্লেনহীম ফ্লাইটে অফিসার কমাণ্ডিং ফ্লাঃ লেঃ চৌধুরী নিজে ফ্লাঃ অফিসার হুইন ও ফ্লাঃ অঃ ভগুদেও ছাড়া আরও কয়েকজন বৈমানিক ছিলেন। ব্লেনহীম বিমানগুলি প্রত্যহ দুইখানা করিয়া একসাথে তিন চারবার উড়িয়া গিয়া টহল দিয়া আসিত—কখনও সমুদ্রের উপরে জাপানী নৌবহরের সন্ধানে, বিশেষতঃ জাপানী সাবমেরিনের সন্ধানে; কখনও শ্যামদেশের সীমান্তে, কখনও বা মালয় দেশের আশেপাশে। একদিন দুইখানা ব্লেনহীম বিমানের সাথে পাঁচ ছয়-খানা জাপানী নৌ-বিমানের সাক্ষাৎ হয়। ব্লেনহীমগুলি জাপানী বিমানগুলির দিকে তাড়া করিয়া গেলে তাহারা সমুদ্রের দিকে পলাইয়া গিয়া সংঘর্ষ এড়ায়। অন্য দিন তিন চারখানা জাপানী বিমানের সহিত দুইখানা ব্লেনহীমের সংঘর্ষ হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাপানীরা রণে ভঙ্গ দেয়।

এদিকে প্রত্যেকটি ব্লেনহীম বিমান দিনে দশ বার ঘন্টা উড়িতেছিল। দুই তিন দিনেই পঁচিশ ঘন্টা আর দশ দিনেই শত ঘন্টা উড়া হইতেছিল। পঁচিশ ঘন্টা উড়িলেই বিমানের কলকব্জা ও এঞ্জিন ইত্যাদির পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়। আর শত ঘন্টা উড়িবার পর খুব সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করার প্রয়োজন। প্রথম দিকে ব্লেনহীম বিমানে বাসীন যাইয়া কয়েকদিন পরে, শতঘন্টা পূর্তির পরে পরীক্ষা করার জন্য একটা ব্লেনহীম লইয়া দমদম বিমান-বন্দরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। বাসীনে শতঘন্টা পরীক্ষা করিবার যন্ত্রপাতি কিছুই ছিল না এবং দমদম হইতে লইয়া যাওয়াও সম্ভব ছিল না। শতঘন্টা পরীক্ষার পরদিন প্রত্যুষে পুনরায় বাসীন অভিমুখে যাওয়া হইল। এইভাবে কয়েকবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে দমদম বিমান বন্দরে পৌঁছাইয়া, সারারাত্রি ধরিয়া কাজ করিয়া শতঘন্টা ওড়ার পর পরীক্ষা করিতে হইত ও ভোরে পুনরায় বাসীন অভিমুখে যাত্রা করিতে হইত। প্রতিরাত্রে

কয়েকদিন কাজ করিয়া ও দিনের বেলায় বাসীন বা দমদম অভিমুখে উড়িয়া শীঘ্রই বোঝা গেল, উৎসাহ যতই প্রবল হউক না কেন, শেষরাত্রের দিকে চক্ষু আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়— বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শতঘন্টা ওড়া পেণ্ডের পরীক্ষা এক রাত্রে শেষ হয় না। পরীক্ষার কার্য্যেও শৈথিল্য প্রকাশ পাওয়ার উপক্রম হইল। তখন স্থির হইল কয়েকজন এঞ্জিনীয়ার বৈমানিক লইয়া দমদমায় অপেক্ষা করিব। সারাদিন ঘুমাইয়া সন্ধ্যার হাজারে আসিব ও ব্লেনহীম বিমান পৌঁছাইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার কার্য্য চালাইয়া একরাত্রেই এই দুরূহ পরীক্ষা শেষ করার চেষ্টা করিব। প্রত্যূষে টেষ্ট ফ্লাইটের পর দ্বিতীয় বৈমানিক দল সদ্য পরীক্ষাকৃত বিমান লইয়া বাসীন যাইবে। শেষ পর্য্যন্ত চারখানা ব্লেনহীম বিমানের মধ্যে একটাই উড়িবার উপযুক্ত রহিল। একটা এঞ্জিন বিগড়াইয়া বাসীনেই রহিয়া গেল ও অন্য একটি বিমানের কয়েকটি অংশ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে, উপযুক্ত নূতন অংশের অভাবে দমদম বিমান-বন্দরেই পড়িয়া রহিল। অন্য আর একটি বাসীন হইতে আকিয়াব পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসিয়াছিল—কিন্তু এঞ্জিনের কোন অংশ বিগড়াইয়া সেখানেই রহিয়া যায়। কোন অংশ বিগড়াইল তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করার অবসর আর মিলে নাই। বাসীন বিমানবন্দর হইতে চহল দেওয়ার কাজ ঐ একখানা ব্লেনহীম বিমানেই হইতে থাকে।

এদিকে চারজন বৈমানিক দুইখানা ওয়াপিটি বিমান লইয়া একদিন দমদম বিমান-বন্দরে পৌঁছাইল। ৫৪ নম্বর এই দুই বিমানের একটি। ফুটা পেট্রল ট্যাঙ্ক লইয়াই এই দূর পাল্লার পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। পেট্রল ট্যাঙ্কের ফুটা তখনও চুইংগাম দিয়াই বন্ধ করা ছিল। দুইদিন কাজ করিয়া ৫৪ নম্বরের পেট্রল ট্যাঙ্ক বদলান হইল। সেই সঙ্গে এঞ্জিন পরীক্ষা করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া বিমানের চেহারাও নূতনের মত করা হইল।

The value of our actions lies not so much in their apparent nature and outward result as in their help towards the growth of the Divine within us.

—Sri Aurobindo

Bholanath Paper House (Pvt.) Ltd.

32-A, BRABOURNE ROAD

CALCUTTA—1

Phone: 22-1532-33 **Gram-BIDYASEVA**

Very often it so happens that the things a man does not really need are just the things that cause him most harm.

—The Mother

BENGAL IMMUNITY

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

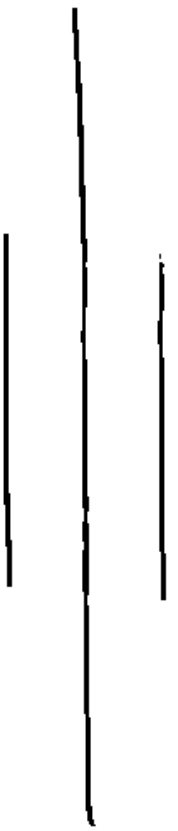

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,

HOWRAH.

Phone : 66-2434

It's Spencer's

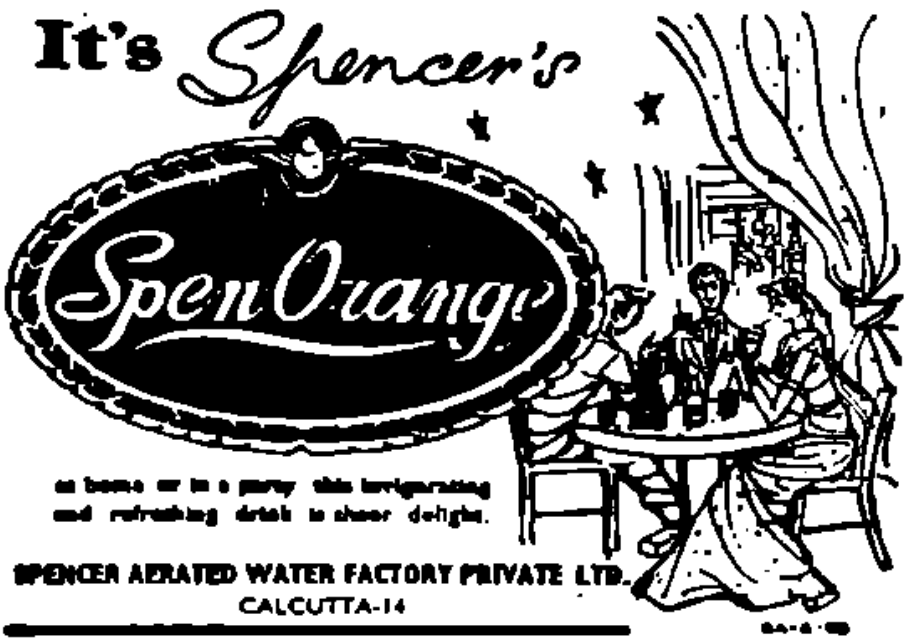

at home or in a party this invigorating and refreshing drink is sheer delight.

SPENCER AERATED WATER FACTORY PRIVATE LTD.
CALCUTTA-14

Troubled by insects ? ?

If so, please do not hesitate to make use of our up-to-date scientific and efficient servicing arrangements by specially trained staff for completely disinfecting your premises with :

" GAMMEXANE " FORMULATIONS

Eastern Insecticide & General Merchandise Pr. Ltd.

(Servicing Agent of Messrs I.C.I. (India) Private Ltd.)

4, Lyons Range
CALCUTTA-1

"We do not belong to the past dawns,
but to the noons of the future."

ZENITH RUBBER WORKS

INDIA'S FOREMOST MANUFACTURERS
OF
HIGH GRADE RUBBER SOLES & HEELS

Office & Factory :—

15, South Tangra Road,
CALCUTTA-15

Telegrams: **'Vessel' Cal**
Codes { Scotts 10th. Ed.,
A. B. C. 5th. Ed.,
Bentley's

Telephones { Office
Dock Office:
Residence: { 55-6461
55-3724
55- 503

SARAT CHATTERJEE & Co., (Private) Ltd.

STEVEDORES, SHIP CHANDLERS & CONTRACTORS
3, Mangoe Lane, CALCUTTA-1.

Regular Services:

AMERICAN EXPORT LINES INC.
ELLERMAN & BUCKNALL STEAMSHIP CO.,
THE EAST ASIATIC CO., LTD.
INDIA STEAMSHIP COMPANY LTD.

Under Distinguished Patronage of:

LIONEL EDWARDS LTD.
GLADSTONE LYALL & CO.,
POLISH OCEAN LINES
UNITED LINER AGENCIES (P) LTD.

Branch: VIZAGAPATAM

Telegrams: VESSEL

For Quality

Printing and Card Board Box Making

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

With Compliments of : —

INTER PROVINCIAL TRANSPORT Co.,
57, Radhabazar Street,
CALCUTTA—1.

(GARAGE : 41/9, Russa Road, CALCUTTA–33).

GARAGE PHONE :
46-1512.

OFFICE PHONE:
22-4972.

Eliminate egoism in all its form; eliminate it from every movement of your consciousness.

—Sri Aurobindo

RODUK & COMPANY

5, CLIVE GHAT STREET

CALCUTTA-1

PHONE: 22-2646 TELE: 'Kenabecha'

KULJIAN'S COMPLETE METALLURGICAL SERVICES

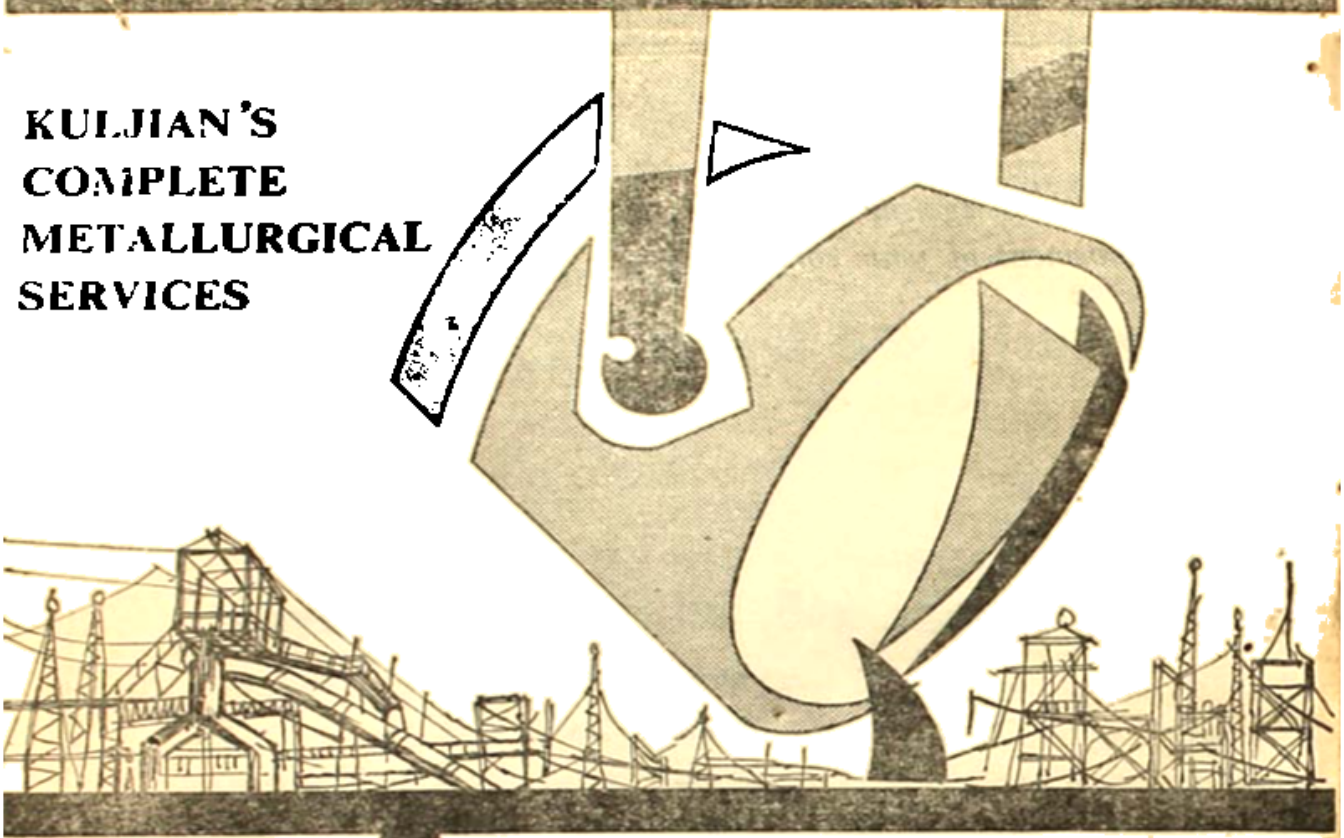

Kuljian-India offers comprehensive consulting engineering in the specialised art of steel-making and steel-shaping. Kuljian's metallurgical services cover the complete spectrum of metals-industry activities — feasibility study and project reports; heavy industrial design, engineering and construction-management; mining and transportation, pelletization and sintering; smelting and refining; finishing and shaping of metals; personnel training; heat-up and initial plant operation. ■ Kuljian consultancy is backed by world-wide experience. If you have an iron or a steel project, entrust it to Kuljian.

INTEGRATED STEEL PLANT ★ BLAST FURNACE IRON PLANT ★ ALLOY STEEL PLANT ★ EXTRACTIVE METALLURGY ★ NON-FERROUS METALLURGICAL PLANT ★ FOUNDRIES AND MACHINE SHOPS

AN INDO-AMERICAN JOINT ENTERPRISE

The Kuljian Corporation (India) Private Ltd.

CONSULTING ENGINEERS

24-B, PARK STREET, CALCUTTA-16